সূচীপত্র।

বান্ধব

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

৪র্থ খণ্ড।] ১২৮৫। [১ম সংখ্যা।

বান্ধব।

... চারি বৎসর হইল বঙ্গীয় পাঠকবর্গের সহিত বান্ধবের পরিচয় ও প্রণয়। পাঠকবর্গ বান্ধবের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী কি না, তাহা আমরা ঠিক জানিতে না পারিলেও, আমরা বিশিষ্টরূপে অবগত আছি যে, বান্ধব সর্ব্বান্তঃকরণে পাঠকবর্গের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। সুতরাং ঐ শ্রুতিমধুর প্রণয় শব্দটি ব্যবহারে আমাদিগের ভয় কি লজ্জা নাই।

এই চারি বৎসরে বান্ধব কাহাকে কোন বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে সমর্থ না হইয়া থাকিলেও, স্বয়ং অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে। এই চারি বৎসরে আমরা শিখিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষা ইদানীং অতিদরিদ্রা, অতিদীনহীনা দুর্ব্বলা হইলেও ইহার ভবিষ্যৎ নিতান্ত তিমিরাবৃত নহে। যে ভাষায় যমুনা-লহরী নৃত্য করে, মোহনলালের গর্জ্জন, মোহনলালের বিলাপ তরল বহ্নির মত উদ্গীরিত হয়, বৃত্রাসুরের বিকট সিংহনাদের মধ্যেও অমৃতরস-নিস্যন্দিনী মধুময়ী কথা শ্রুতিকুহরে প্রবেশপথ পায়,—যে ভাষায় প্রতাপের দেবদুর্লভ পবিত্র চরিত্র অঙ্কিত হইতে পারে, এবং ভাষার প্রাণরূপিণী উদ্দীপনা অবলীলায় প্রবাহিত হয়, সে ভাষার ভরসা আছে। আমরা এই সঙ্গে ইহাও শিখিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষার যেমন ভরসা আছে, বাঙ্গালিরও তেমন ভরসা আছে। যে দেশে প্রমোদ-নিদ্রা-মগ্ন ধনীর নিকট আদর নাই, পদস্থের নিকট সম্মান নাই,—দক্ষিণে

বামে কোন দিকেই অবলম্ব নাই, সম্মুখে ও পশ্চাৎ কোন দিকেই তিষ্ঠিবার স্থান নাই,—যে দেশে প্লাঠ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত না হইলে প্রবাল মুক্তার ন্যায় অমূল্য রত্নও বিকায় না, উপবিষ্টের অনুরোধ কি ঈঙ্গীত না হইলে ভারতের তীর্থরাজস্বরূপ রাজস্থানের ইতিবৃত্ত-পাঠে, ঐতিহাসিক কি বিজ্ঞান রহস্যের রসাস্বাদনে, হেমচন্দ্রের অলোক-সাধারণ তেজোরাশির অনুধ্যানে কিংবা হাস্যকুসুমময় কল্পতরুর ছায়াসেবনেও লোকের প্রবৃত্তি জন্মেনা;—যে দেশে কাঁচ আর কাঞ্চন সমান পদার্থ, ভ্রমর-গুঞ্জন আর ভেকধ্বনিতে সমান তৃপ্তি,—যে দেশে এক শ্রেণির লোক অর্থের দুর্ব্বহভরে উৎপীড়িত হইয়া পঙ্কে পতিত, আর এক শ্রেণির লোক হা অন্ন বলিয়া অহোরাত্র ব্যতিব্যস্ত,—যে দেশে মূর্খের নাম রসিক, অন্ধের নাম সর্ব্বজ্ঞ ভট্টাচার্য্য, মাতৃভাষায় মূর্খতার নাম পাণ্ডিত্য, পরমুখ-প্রেক্ষিতার নাম পৌরুষ; যখন সেই দেশেও একটি নিরাশ্রয়া এবং সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীতা ভাষা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, এবং সামান্য একটি সলিল-রেখার ন্যায় প্রথমতঃ প্রবাহিত হইয়া এইক্ষণ তরঙ্গসংকুল মেঘনাদ-নদের ন্যায় ভয়ঙ্কর নিনাদে গর্জ্জন করিতেছে, তখন বুঝিয়াছি যে দুঃখিনী বঙ্গভূমির প্রতি অমৃতময়ী সারস্বতী শক্তির অকৃপা নাই। আমরা আমাদিগের এই শিক্ষালব্ধ উৎসাহের উপর দৃঢ়নির্ভরে কিয়ৎকালের বিশ্রামের পর, পুনরপি প্রীতির ভিখারী হইয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমাদিগের অবসাদজন্য নিদ্রা যে মৃত্যুর প্রতিকৃতি নহে, এবং বান্ধব যে প্রাণান্তে কখনও প্রতিশ্রুত এবং পরিগৃহীত ব্রতধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইবে না, তাঁহারা এইটুকু বিশ্বাস করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। আর যে সকল সুশিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তি এত কাল বান্ধবকে হস্তাবলম্ব দিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বের মত ইহার প্রতি সদয় রহিলেই আমরা অক্লান্তপদে চলিতে পারিব।

সাহিত্য ও জাতীয় বিকাশ।

প্রথম প্রস্তাব।

সাহিত্য জাতীয় হৃদয়ের আদর্শ,—জাতীয় হৃদয়ের ইতিহাস। যে জাতির হৃদয় যে সময়ে যে ভাবে পরিপূর্ণ কি পরিপ্লুত থাকে, সেই জাতির সেই সময়ের সাহিত্যও সেইভাবে সম্পূর্ণরূপে বিলসিত রহে। মনুষ্যের মন যখন শোকে আকুল ক্রোধে উদ্দীপ্ত, অথবা দুঃখে কি দুশ্চিন্তায় অবসন্ন রহে, তাহার মুখচ্ছবি তখন তমসাচ্ছন্ন এবং কণ্ঠধ্বনি বিকৃত হয়,—এবং যখন তাহার হৃদয় আনন্দ ভরে নৃত্য করে

চিত্ত নূতন সুখের সুধাময় স্পর্শে প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তাহার চক্ষু তখন সেই আনন্দ ও সেই সুখে হাসিতে থাকে, তাহার কণ্ঠস্বর বসন্ত-মদ-মত্ত কোকিল-কণ্ঠের মাধুরীতে মিশিয়া যায়। মনুষ্যসম্বন্ধে প্রকৃতির এই নিয়ম অনুল্লঙ্ঘনীয়, এবং জাতীয় সাহিত্যও সর্ব্বপ্রকারে এই নিয়মের অধীন। উহাতে কখনও ক্রোধের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, কখনও অবরুদ্ধ ক্রোধের ততোধিক ভয়ঙ্কর স্তম্ভিত ভাব। কখনও প্রেমের উচ্ছ্বাস, কখনও [illegible] ও পরিতাপের হৃদয়বিদারী করুণা-নিস্বন, কখনও বীর-গর্ব্ব ও বাহুবল-দর্পের সিংহনাদ, কখনও স্বার্থপরতা ও বণিগ্‌বৃত্তির সংকোচ ও সাবধানতা। কখনও বিলাসের লালসা ও আবেশ, কখনও ভয়ের বিকৃত ভঙ্গি এবং ভক্তির বীভৎস বিকার। ফলতঃ, সাহিত্যকে ইতিহাস না বলিয়া জাতীয় হৃদয়ের চিত্রপট বলাই অধিকতর সঙ্গত। কারণ, ইতিহাসে যাহা না থাকে, অথবা ইতিহাসে যাহা থাকা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, ভাষার সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধমূলক নিয়মানুসারে, সাহিত্যে তাহা আলিখিত হয়,—এবং সাহিত্য, পরিমার্জ্জিত দর্পণের ন্যায়, জাতীয় পরিবর্ত্তনের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বর্ণভেদও আমাদিগের সম্মুখে আনিয়া প্রদর্শন করে। ইতিহাস প্রায়শঃই বাহিরের কথা লইয়া ব্যাপৃত রহে;—সাহিত্যে অন্তরের অন্তরতম কথাও পরিস্ফুট না হইয়া যায় না, এবং জাতিবিশেষের উদয় ও বিলয় সম্পর্কিত যে সকল প্রশ্নের উত্তর করা নিতান্ত কঠিন, সাহিত্য তাহার সদুত্তর দেয়।

ভারতবাসী আর্য্যদিগের শৈশব সময়ের সাহিত্য বেদ। বেদে শিশুর সারল্য, বেদে শিশিরসিক্ত প্রভাতপদ্মের পবিত্র শোভা এবং পবিত্র মাধুর্য্য। বেদ যাঁহাদিগের হৃদয়ের ভাষা ছিল, তাঁহারা মনু কি যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায়, সমাজের অভ্যন্তরীণ ভেদ এবং পরিণামচিন্তা লইয়া বুদ্ধি বিলোড়ন করিতেন না,—কণাদ কি কপিলের ন্যায় তত্ত্বশাস্ত্রের বীজসূত্র লইয়া পদার্থতত্ত্বের অনুসন্ধানে নিমজ্জিত রহিতেন না, এবং কালিদাসপ্রমুখ কবিসম্প্রদায়ের ন্যায় কামিনীর বিভ্রম-বিলাস ও লাবণ্যলীলা লইয়াও প্রমত্ত থাকিতেন না। তাঁহারা, প্রাতঃসূর্য্যের উদয়োন্মুখী প্রতিভা দেখিয়া, যাঁহাকে কেহ জানে না, যাঁহাকে কেহ জানিবে না, সেই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তির আনন্দময় অনুভবে, কাননস্থিত বিহঙ্গনিবহের মত, কলকল নাদে প্রকৃতির প্রভাতবন্দনা গান করিতেন;—জলভারপূর্ণ শ্যামল মেঘমালার নবীন-সৌন্দর্য্য-দর্শনে পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেন,—বায়ুর বেগ প্রশমনের জন্য স্তোত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন;—এবং তাঁহাদিগের ক্ষেত্রে যেন শস্য হয়, গাভী যেন দুগ্ধবতী রহে, তরুরাজি যেন ফলে ও ফুলে সুশোভিত হইয়া চক্ষু বিনোদন করে, এই জন্য তাঁহারা দেবতার আরাধনা করিতেন।

তখন রাজা কি রাজকীয় অত্যাচার ছিল না। সাহিত্যে কিরূপে রাজনীতির আবিলতা থাকিবে? নূতন-গ্রথিত সমাজসংস্থাপনে সর্ব্বপ্রকার অপূর্ণতা থাকিলেও, কোন রূপ অস্বাস্থ্য ছিল না। সাহিত্যে কিরূপে সমাজভঙ্গের ভয় এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিকার থাকিবে? আর মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের কৃত্রিম ভক্তি এবং কৃত্রিম আসক্তিরও কোন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং তদানীন্তন সাহিত্যেও কিরূপে কৃত্রিম ভক্তি কিংবা কৃত্রিম আসক্তির কপট স্তুতি স্থান পাইবে?

আজি সমগ্র ইয়ুরোপ এবং আমেরিকা যাঁহাকে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং জগদাত্মা বলিয়া পূজা করিতেছে, এবং যাঁহার হৃদয়-কন্দর-নিঃসৃত নির্ম্মল নীতিসুধা আজি প্রায় সমস্ত পৃথিবীতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই নাজরীণ যোগী মহাত্মা খ্রীষ্ট, একটি সুকুমারমতি সহাস্য শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া নিয়া, সম্মুখস্থিত শিষ্যবর্গকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে,—"যাহাদিগের চিত্ত শিশুর মত সরল নহে, স্বর্গরাজ্যে তাহাদিগের অধিকার নাই।" আমরাও বলি, যাহারা সেই বেদভাষী আর্য্যশিশুর ন্যায়, আধ আধ কথায় ঈশ্বরকে ডাকিতে পারে না, এবং প্রকৃতির রূপরাশিতে মোহিত হইয়া প্রকৃতির প্রাণদেবতার ক্রোড়ে শিশুর মত ঝাঁপ দিয়া পড়িতে সমর্থ হয় না, তাহাদিগের জন্যও ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ-পথ নাই। ধর্ম্মবিষয়ে সেই পুরাতন বৈদিক সাহিত্য এবং এখনকার সুমার্জ্জিত ধর্ম্মশাস্ত্রীয় সাহিত্যে কি প্রভেদ! এখনকার ধর্ম্মবিষয়ক সাহিত্যের একার্দ্ধ আত্মতত্ত্ব এবং অপরার্দ্ধও হায়! অন্য এক প্রকারের আত্মতত্ত্ব। ইহার কোথাও স্বাস্থ্যের লক্ষণ, প্রফুল্লতার সমীরসঞ্চার এবং প্রকৃত আনন্দের সংস্পর্শ নাই। ইহাতে ধর্ম্মের সাধনা, ক্লেশকর ঔষধ-সেবন; এবং ধর্ম্মোপদেশ যার পর নাই কটুকষায়-ঔষধ-বিতরণ। ইহার প্রার্থনায় প্রচ্ছন্ন শ্লেষ, কিংবা বাদবিতণ্ডা; এবং ইহার সর্ব্বত্রই অনুতাপ অথবা অভিসম্পাত, অন্তর্দ্দাহ অথবা পরের প্রতি দ্বেষ। পড়িলে বোধ হয় যে, 'ধার্ম্মিক' মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য এক সৃষ্টিছাড়া জীব। সে কাহারও সুখে সুখী নহে, কাহারও দুঃখেও সে দুঃখী নহে। তাহার সহিত কাহারও কোন বিষয়ে সহানুভূতি নাই। তাহার মুখমণ্ডলে চিরন্তনী অমাবস্যা; অবোধ বালক বালিকাও ভয়ে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস পায় না। সে সকল বিষয়েই সতত সঙ্কুচিত। সে সঙ্কোচে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে না, এবং সঙ্কোচে কাহারও সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেও ইচ্ছুক হয় না। তাহার হৃদয় এক অচিন্তনীয় ব্যাধির অধিকরণ। সেখানে আমোদ নাই, উৎসাহ নাই এবং হর্ষের তরল তরঙ্গ নাই। কবিতার কলকণ্ঠ সেখানে পরাজিত হয়, এবং সৌন্দর্য্যের পবিত্র প্রতিমাও পাপের প্রতিকৃতি বলিয়া সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়।

বৈদিক সাহিত্য সর্ব্বাংশেই ইহার বিপরীত। উহার সর্ব্বত্রই নবোদ্গত হৃদয়ের আমোদ, আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস ও উৎসব। উহার ধ্যানধারণা গম্ভীর ও মধুর; প্রার্থনা স্বভাবসুন্দর, সরল ও অমায়িক; উপদেশ অভিসম্পাত-শূন্য এবং সাধনা শ্বাসপ্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক ও সুখপ্রদ। ধর্ম্মশাস্ত্রে এইক্ষণ যে বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, বৈদিক সাহিত্যের কুত্রাপি তাহা পরিলক্ষিত হয় না। তখন ধর্ম্মও লোকের গলগ্রহ স্বরূপ ছিল না, এবং যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারাও মূর্ত্তিমান্ রোগ এবং জনসমাজের গলগ্রহ ছিলেন না।

বেদের পর রামায়ণ আর মহাভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমরা কণিকসূত্রের অর্থবিবৃতিতে প্রীতি আর রাজনীতিতে যে পার্থক্য দেখাইয়াছি, রামায়ণ ও মহাভারতেও সেই পার্থক্য। রামায়ণের সময়ে ভারতীয় সভ্যতার প্রেমোচ্ছ্বাস-পরিপ্লাবিত নূতন যৌবন, মহাভারতের সময়ে ভারতীয় সভ্যতার ক্ষতিলাভগণনা-তৎপর প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য। রামায়ণে হৃদয়ের আবেশ, হৃদয়ের আবেগ, এবং রামায়ণের প্রধান-পুরুষ রাম। মহাভারতে বুদ্ধির ক্ষুর-ধার, বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য এবং মহাভারতের প্রধান-পুরুষ কূট-যুদ্ধ-প্রসিদ্ধ বাসুদেব, অথবা বাসুদেবের করধৃত পুত্তল রাজা যুধিষ্ঠির। আর প্রকৃতিরই বা কি আশ্চর্য্য সহানুভূতি! রামায়ণের কবি, বাল্মীকি; এবং মহাভারতের কবি, ব্যাস। ইতিহাসের দুইটি বিভিন্ন সময়ের ছবি রামায়ণে ও মহাভারতে যেরূপ বিভেদসহকারে চিত্রিত হইয়াছে, শুদ্ধ তাহা তুলনা করিলেই সাহিত্য এবং জাতীয় হৃদয়ের সাময়িক অবস্থাঘটিত পরস্পর সম্বন্ধ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারে।

রামায়ণ এবং মহাভারত এই উভয় কাব্যেই ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার রাজ্য লইয়া বিরোধ। রামায়ণের বিরোধ রাম ও ভরতে, মহাভারতের বিরোধ কৌরব ও পাণ্ডবে। কিন্তু বিরোধের বিচিত্র পার্থক্য একবার চিন্তা কর। রামায়ণের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা এই বলিয়া বিবাদ করিতেছেন যে,—"এই রাজ্য, এই রাজপদ, এই অতুল রাজসম্মান আমার নহে, ইহা তোমার"। মহাভারতের ভ্রাতা স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলিতেছেন যে,—"যতটুকু ভূমি সূচির সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগে সংলগ্ন রহিতে পারে, তাহাও বিনা যুদ্ধে প্রদান করিব না"। রামচন্দ্র ভ্রাতাকে বিরোধে পরাভব করিয়া তাঁহার হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্য তুলিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং হৃদয়ের আনন্দভরে ভার্য্যাসহ বনবাসী হইলেন। মহাভারতের ভ্রাতা বিরোধে জয়লাভ করিয়া, ভ্রাতার উরুতে গদাঘাত, মস্তকে পদাঘাত এবং অন্তরে ততোধিক ক্লেশকর নিদারুণ বাক্যের আঘাত করিলেন, এবং ভ্রাতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া যজ্ঞ ও দানাদি সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সত্য বটে, ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মের পুত্র,

ধর্ম্মের অবতার এবং সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সত্য বটে, তিনি যুধিষ্ঠিরকে নিয়ত বেদ পাঠ এবং বিপ্রসেবায় নিযুক্ত রাখিয়া, এবং তাঁহাকে অসিধারব্রতে বিজয়ী দেখাইয়া সাধারণের মনে তাঁহার প্রতি এক অসাধারণ ভক্তি জন্মাইয়াছেন। ইহাও সত্য যে যুধিষ্ঠির অকারণ পরদ্রোহ, অকারণ পরপীড়ন, এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও দম্ভমাৎসর্য্য প্রভৃতি বহুবিধ দোষহইতে নির্ম্মুক্ত রহিয়া জগতে ধার্ম্মিক নাম পাইবার জন্য বহুল পরিমাণে যোগ্য হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে,রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির এক প্রকৃতির ধার্ম্মিক নহেন, এবং এই উভয় সময়ের ধর্ম্মগত আদর্শও এক ছিল না। ইহাঁদিগের এক জনের ধর্ম্মে কুসুমের সৌরভ, বসন্তের কমনীয় কান্তি, সত্যের স্বচ্ছশোভা, এবং প্রথম বয়সের প্রমত্ত প্রবাহ;—আর এক জনের ধর্ম্মে শীতের সঙ্কোচ, স্বার্থের দুশ্চিন্তা, কৌশল, কাপট্য, কলির প্রারম্ভকালীন প্রদর্শন-প্রিয়তা, এবং বিবিধ কারুকার্য্যের বিচিত্রঘটা। একজনের ধর্ম্মে শক্তি এবং স্বভাবের অপ্রতিহত বিকাশ,—আর একজনের ধর্ম্মে অকালবার্দ্ধক্যের অরুচি এবং অনিচ্ছাকৃত গতি।

ধন্য বাল্মীকি! ধন্য ভারতবর্ষ! আর আজি হতভাগ্য হইলেও ধন্য আমরা যে, যে দেশ রামচন্দ্রের পদরেণু স্পর্শ করিয়াছে, আমরা সেই দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এবং যে গঙ্গা ও গোদাবরী আর্য্যাবর্ত্তের সেই সময়ের সেই আদর্শ-পুরুষ, সেই জাতীয় প্রতিনিধির পাদপ্রান্তে প্রবাহিত হইয়াছে, আমরা আজি সেই পুরাতন গঙ্গা ও গোদাবরীর তরঙ্গমালা দর্শন করিয়া পুরাতন আর্য্য জাতির কীর্ত্তি ও মহিমার তরঙ্গ ধ্যান করিতে পারিতেছি। প্রকৃত মহত্ত্বের ছায়া-পথে কিংবা স্মরণ-পথে অবস্থানও সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে বাল্মীকির সমান,কিংবা কোন কোন বিষয়ে বাল্মীকি হইতেও শ্রেষ্ঠতর কবি জন্মগ্রহণ না করিয়াছেন,এমন নহে। গ্রীকদিগের হোমার, রোমাণদিগের বর্জ্জিল, ফরাশিদিগের কর্ণেল এবং বৃটিশদিগের মিল্‌টন, ইহাঁরা সকলেই মানব জাতির গৌরব-স্থল এবং কবি-সমাজের গুরু বলিয়া পরিচিত। যদি কল্পনার বৈচিত্র্য এবং সৃষ্টি-নৈপুণ্য লইয়া বিচার কর, তাহা হইলে বৃদ্ধ বাল্মীকিকে সেক্ষপীরের সহিত তুলনা-স্থলে আনয়ন করা যায় কিনা, তাহাও সন্দেহের কথা। বাল্মীকির হৃদয়ের স্রোত নিরন্তর একখাতে প্রবাহিত হইয়াছে; সেক্ষপীরের দিব্য-শক্তি স্বর্গও নরক, শৈল-শৃঙ্গ ও গভীর তমসাচ্ছন্ন গিরিগুহা, কৈশর ও কেসিয়স, ক্লিওপেট্রা ও দেশদিমোনাপ্রভৃতি অসংখ্য পদার্থ যুগপৎ দর্শন এবং যুগপৎ চিত্র করিয়া জগতের বিস্ময় জন্মাইয়াছে। কিন্তু যেরূপ ভারতের আর্য্যজাতি ভিন্ন আর

কোন জাতির প্রকৃতিতেই রাম চরিত্র বিকশিত হয় নাই, সেইরূপ কি হোমার কি বর্জ্জিল, কি কর্ণেল, কি মিল্টন অথবা কি শেক্ষপীর, বাল্মীকি ভিন্ন কোন দেশের কোন কবিই রাম চরিত্র সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন নাই।

রামচন্দ্র প্রাচীন আর্য্যজাতির প্রাণ,—দয়ার অমৃত প্রস্রবণ, অথচ পৌরুষদর্পের সজীব প্রতিকৃতি। প্রণয়ে তিনি চণ্ডালকেও আলিঙ্গন করিতে পারেন, প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লঙ্কেশ্বরকেও তিনি তৃণ বলিয়া গণনা করেন না। স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসনেও তাঁহার যে সুখ, তপোবনের পর্ণকুটীরেও তাঁহার সেই শান্তি। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী তপস্বীরাও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে উৎসুক রহেন; এবং দাক্ষিণাত্যের অসভ্য,আরণ্য মনুষ্যেরাও তাঁহার কথার মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া আপনা হইতে তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করে। তাঁহার আঘাতে বজ্রের কঠিন দেহ বিদীর্ণ, এবং ক্রোধে বহ্নি-শিখাও ভীত হয়; আবার রাবণের মত ভার্য্যাপহারী ও সর্ব্বনাশকারী শত্রুও যখন কাতরকণ্ঠে তাঁহার শরণ লয়, তিনি তখন করুণরসে দ্রবীভূত হইয়া ধারায় অশ্রুপাত করেন। তাঁহার চিত্ত কৈকেয়ীর প্রতিও ক্রূরভাব পোষণ করিতে পারে না, অথচ কৌশল্যার ক্রন্দন এবং ভরতের অনুনয় বাক্যেও বিগলিত কিংবা সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না। যখন রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য বাহুপ্রসারণে উদ্যত, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ পুঞ্জীকৃত পুষ্পরাশির ন্যায় তাঁহার সম্মুখে সমাকীর্ণ, পৃথিবীর সমস্ত রাজমুকুট তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত, তাঁহার প্রশান্ত চিত্তে তখনও অধৈর্য্য কি উদ্বেলতা নাই,—এবং যখন জটাচীর তাঁহার রাজভূষা, দুর্ভাগ্য তাঁহার ক্রীড়াসহচর এবং বৃক্ষ লতা মাত্র তাঁহার পরিচারক, তখনও তাঁহার দৃক্‌পাত কি দুঃখ-বোধ নাই। অহো কি মনুষ্যত্ব! কি অলৌকিক মাহাত্ম্য! ভারতীয় কল্পনা সরসীর স্বর্ণকমল,—কি সুন্দর,—কি কঠিন! সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে প্রতিভাত প্রদীপ্ত ভাস্কর! কি উজ্জ্বল! কি মনোহর!

ব্যাসও অসামান্য কবি, এবং সর্ব্বাংশে আর্য্যনামের উপযুক্ত,—পাণ্ডিত্যে অনুপম, মনস্বীতায় অদ্বিতীয় এবং সৃষ্টি বৈচিত্র্যে ও সৃষ্টি-কৌশলে শেক্ষপীরের সমান। তদীয় ভীষ্ম হিমাদ্রির অভ্রভেদী শৃঙ্গের ন্যায় ভারত-সাহিত্য-রূপ মহাক্ষেত্রের এক প্রান্তে ভ্রূভঙ্গিশূন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যতকাল ইচ্ছা নিরীক্ষণ কর, সেই পাষাণময়ী মূর্ত্তিতে কখনও প্রতিজ্ঞা পালনে ভঙ্গ কিংবা পৌরুষ-ধর্ম্মে অবহেলার লক্ষণ দেখিতে পাইবে না। তাঁহার দ্রোণকর্ণাদি বীরবৃন্দ অদ্যাপি শরীরবদ্ধ বীররসের ন্যায় সকলের মানসনেত্রের সম্মুখীন হইতেছেন। যতকাল ইচ্ছা দেখিতে থাক, হৃদয় কখনও অবসন্ন হইবে না। তাঁহার অভিমন্যু অদ্যাপি রু-

পের ছটা বিকীরণ করিয়া, এবং রূপের সঙ্গে রৌদ্রতেজে বিভূষিত হইয়া, বিস্ময়-বিমুগ্ধ দ্রষ্টৃবর্গের সন্নিধানে বজ্রহস্ত চন্দ্রমার ন্যায় মৃদু মধুর সলীলহাস্যে নৃত্য করিতেছেন,—যতকাল ইচ্ছা চাহিয়া থাক, চক্ষু কখনও ফিরিয়া আসিতে চাহিবে না। কিন্তু কবিকুল চূড়ামণি শেক্ষপীর ত্রিলোকের উপাদেয় সামগ্রী একত্র সংগ্রহ করিয়াও যে কারণে রাম সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, ব্যাসেব বহু যত্নের ধন যুধিষ্ঠির-ও সেই কারণেই রামচন্দ্র নহেন।

যুধিষ্ঠিব চিরবৃদ্ধ। তাঁহার প্রকৃতিতে কখনও আবেগ কি আবর্ত্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার গতি জলৌকার মত; তিনি পরস্থান না দেখিয়া কখনও পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করেন না। তিনি সময় পাইলে বিরাটকেও শ্লেষ করিতে পারেন, কিন্তু অসময়ে দুঃশাসনকেও কিছু বলিতে চাহেন না। তাঁহার সত্যপরায়ণতা বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে ‘হত ইতি গজ,’ অথচ আত্মদৈন্য-জ্ঞাপন এবং অনুতাপ-পরায়ণতায় তিনি ভগবদ্ভক্ত সাধু। তাঁহাব সাহস ও বীরত্ব প্রায়ই বীর সান্নিধ্যেও বিপদ্বিপত্তির সম্মুখে অবসন্ন হইয়া পড়ে; অথচ সাহস ও বীরত্বের অভাব প্রদর্শন করিয়া অন্যকে তিরস্কার করিতে তাঁহার চিত্ত কাতর হয় না, এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি সুকুমার শিশুকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করিতেও তাঁহার মনে গ্লানি জন্মে না। অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় তাঁহারও ক্রোধ আছে। কিন্তু তাঁহার ক্রোধ মেঘের ন্যায় গর্জ্জেনা, অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠে না, এবং অশনির ন্যায় কাহারও মস্তকে সহসা আপতিত হয় না। উহা বিষের ন্যায় ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়, ধীরে ধীরে কার্য্য করিতে রহে, এবং যাহার প্রতি ক্রোধ, ধীরে ধীরে তাহার সর্ব্বনাশ করে। দুর্য্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ ছিল। কিন্তু যখন যুধিষ্ঠিব দুর্য্যোধনের অত্যাচারে বারণাবতের অভিমুখে পলায়ন করেন, সে ক্রোধ তখন পরিস্ফুট হয় নাই। যখন দুর্য্যোধনের ইঙ্গিতে কুরুসভায় দ্রৌপদীর নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা হয়, সে ক্রোধ তখনও প্রকাশিত হয় নাই। বহুলোক তখন অশ্রুপাত করিযাছিল, বহুলোক তখন আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, কেবল যুধিষ্ঠিরই প্রস্তরবৎ নিঃশব্দ ও নিশ্চল। কিন্তু বহুদিনান্তে, বহু বর্ষান্তে, যুধিষ্ঠিরের পরিণাম-চিন্তাপরায়ণা, ধীরপদবিক্ষেপিণী, স্থিরা নীতি যখন ফলোন্মুখী হইয়া আসিল, যখন কুরুকুলের সমস্ত সম্পদ্ বিনষ্ট এবং ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্ত সহায় একে একে সমর শয্যায় শয়ান হইল, সংক্ষেপতঃ শত্রুবল যখন সমূলে উৎপাটিত এবং ভাবী বিপদের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া গেল, তিনি তখন কূপ-জল-মগ্ন দুর্য্যোধনের প্রতি ক্রোধ করিলেন এবং ক্রোধোদ্দীপ্ত বাক্যে তাঁহার মর্ম্মভেদ করিয়া হৃদয়ের চিরপোষিত বৈর-বহ্নিতে আহুতি দিলেন। আর প্রেম? যুধিষ্ঠিরের মত রাজনীতিনিপুণ,

রাজ্য-চিন্তা-নিমজ্জিত,রাজ-পদ-লোলুপ,পরিপক্ক ব্যক্তিও কি কখনও প্রেমের স্বর্গীয় সুধার ভিখারী হয়, এবং প্রেম কাহাকে বলে তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে?

প্রভুত্ববাসনা এবং প্রেম নিত্যবিরোধি। প্রেমের অঙ্কুরে পরার্থলালসা, পল্লবোদ্গমে পরাধীনতা এবং পুষ্পিত সৌরভে পরকীয় উপাসনা। প্রভুত্ববাসনার অঙ্কুরে ও পল্লবে, ফুলে ও ফলে সর্ব্বত্রই পরাভিভবচেষ্টা, পরমর্দ্দন, পরনিগ্রহ। প্রেমিক অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও অন্তরে প্রমত্তযুবা, পর্ব্বতের মত বলীয়ান্ হইলেও প্রীতির বসন্তোচ্ছ্বাসে বাতচলিত বল্লরী এবং মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ হইলেও প্রাণের অভ্যন্তরে জ্যোৎস্নার ন্যায় শীতল ও আনন্দভরে ঢল ঢল। প্রভুত্বপ্রিয় কঠোর, নির্ম্মম, স্বার্থমাত্র-পরায়ণ, এবং যৌবনেও জরাজীর্ণ। ব্যাসের মহাভারতে এবং ব্যাসের সমসাময়িক ভারতে প্রভুত্ব-বাসনার সর্ব্ববিধ প্রতিমূর্ত্তিই প্রত্যক্ষ করিতে পাইবে, রাজনীতির অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত দেখিবে, শত্রুসংহার এবং কার্য্যোদ্ধারের জন্য যে সকল উপদেশ দিতে বর্ত্তমান কালের বিষমার্ক প্রভৃতি রাজপুরুষেরাও ভীত অথবা কুণ্ঠিত হন, ব্যাসাসনের সন্নিহিত হইলে তাহা হইতেও ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়জনক উপদেশ শুনিয়া স্তম্ভিত ও কণ্টকিত হইবে; — তথায় কোন সময়ে কণিকের সহিত আলাপ করিবে, কোন সময়ে ভারত-বিগ্রহের বীজমন্ত্র মহামতি বাসুদেবের কূটলীলা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় রহিবে; কখনও কর্ণ শকুনির মন্ত্রণা শুনিয়া হৃৎকম্পে চমকিয়া উঠিবে, এবং কখনও বা সপ্তরথীর অবৈধ যুদ্ধ অথবা পাণ্ডবশিবিরে অশ্বত্থামার নৈশ আক্রমণ দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে থাকিবে। কিন্তু আদি হইতে অন্ত সমগ্র মহাভারতে কোথাও প্রেমের কুসুমশোভা দেখিতে পাইবে না। প্রভুত্ব ও পদবৈভবলুব্ধ ভারতবর্ষ তখন প্রীতিকে নীরস নির্মাল্য পুষ্প জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়াছিল, ভারতের তদানীন্তন সাহিত্যেও সুতরাং উহা উপেক্ষিত হইয়াছে।

প্রেমের বিকাশ রামায়ণে অন্যরূপ। যদি কেহ সংসারের দুঃখ-দাহে দগ্ধ হইয়া এবং মনুষ্য চরিত্রে অহরহ বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাইয়া শান্তির জন্য লালায়িত হন, তিনি বাল্মীকির কল্পকাননে প্রবেশ করুন। যদি কেহ পৃথিবীর কুটিল ব্যবহারে ক্লিষ্ট এবং প্রিয় পরিজনের ছলনা ও বঞ্চনায় অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিষয়ে নিরাশ হন, তিনি লোক-পাবনী রামায়ণী গঙ্গায় অবগাহন করুন। ফলতঃ, বাৎসল্য, ভক্তি এবং দাম্পত্যপ্রীতি প্রভৃতি প্রেমের যত প্রকারের মুর্ত্তি অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্য-কল্পনায় প্রতিভাত হইয়াছে, রামায়ণে তাহা স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণে লিখিত রহিয়াছে, এবং জগতের সমস্ত সাহিত্য মধ্যে একমাত্র রামায়ণেই তাহা পূর্ণতা পাইয়াছে।

রামায়ণে অপত্য বাৎসল্য দশরথের, অলৌকিক ও অপূর্ব্ব। রাজা দশরথ বহু-বিবাহ প্রভৃতি বহুদোষে লিপ্ত এবং স্ত্রৈণতার জন্য নিন্দনীয় হইয়াও পুত্রের প্রতি ভক্তি এবং পুত্র-বৎসলতার জন্য মনুষ্য-জগতে চিরস্মরণীয় ও ভক্তিভাজন হইয়াছেন। যেমন সূর্য্য বিরহে সংসার অন্ধকারে রহে, তিনিও রাম বিরহে সেইরূপ অন্ধকারে রহিতেন। রামকে তিনি শুধু ভাল বাসিতেন না, রামচন্দ্রেই তিনি প্রকৃত জীবিত থাকিতেন। যখন রাম বিশ্বামিত্রের সহিত মিথিলায় গেলেন, তিনি সেই ক্ষণিক বিরহে জীবন্মৃত রহিলেন; এবং যখন রাম কৈকেয়ীর সত্য-পাশে বদ্ধ হইয়া বনবাসী হইলেন, তখন তিনি, যেন কোন অলক্ষিত নিয়মের শাসনে, জীবলীলা সংবরণ করিলেন। এই চিত্র দর্শনীয়। যে জগতে শোকের পরই সুখস্পৃহা, এবং সুখস্পৃহার সঙ্গেসঙ্গেই বিস্মৃতি ও বিষয়-তৃষ্ণা,—যে জগতে এক-চক্ষু অশ্রুধারা বর্ষণ করে, আর এক চক্ষু ভোগ্য বস্তুর প্রতি প্রধাবিত হয়, এক হস্ত কপালে আঘাত করে, আর এক হস্ত লাভালাভের অঙ্কপাতে ব্যাপৃত হয়, অধিক আর কি, যে জগতে জনক-জননীকৃত অপত্যনিগ্রহ এবং অপত্যের প্রতি বঞ্চনারও সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত নিয়ত সম্মুখে পড়ে, সেই জগতে দশরথের এই কবিজনস্পৃহনীয় আলেখ্য খানি নয়ন ভরিয়া পান করিলেও হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়না।

রামায়ণে যাঁহার নাম ভরত, মহাভারতে তাঁহার নাম দুর্য্যোধন; এবং রামায়ণে যাঁহার নাম লক্ষ্মণ, মহাভারতে তাঁহার নাম অর্জ্জুন। ভরত আর দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃ-প্রেম-গত পার্থক্য সামান্যতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। যে নিতান্ত অন্ধ সেও ইহা বুঝিতে পারিবে যে, ভরত সর্ব্বাংশে রাম-সদৃশ না হইলেও প্রায় দ্বিতীয় এক রাম; এবং রামচন্দ্রের মত ভারতীয় সাহিত্যের আর এক বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভ;—শৌর্য্য ও সাহসে অপ্রমেয়, অথচ প্রীতিতে নবনীত-সম, ত্যাগে অকুণ্ঠিত। এই মহাপুরুষ পিতৃসত্যপ্রামাণ্যে সাগরাম্বরা ভারত ভূমির সাম্রাজ্য পদ পাইয়াও ভ্রাতৃস্নেহের নিকট তাহা তৃণ হইতে হীনজ্ঞান করিয়াছেন, এবং যৌবনে যোগী সাজিয়া, মাথায় জটা বাঁধিয়া, ভ্রাতার অন্বেষণে বনে বনে ভিখারীর মত বেড়াইয়াছেন। মহাভারতে ইহাঁর সাদৃশ্য কোথায়? যেখানে ভরত ভ্রাতাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও অতৃপ্ত, মহাভারতে প্রতিরোধী বীর ভ্রাতার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াও সেখানে অপরিতৃপ্ত। কিন্তু ভরতের ভ্রাতৃভাব যদি পূজনীয়, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভাব যেমন পূজনীয়, তেমনই প্রীতিজনক। আমাদিগের বিবেচনায় মনুষ্য-লোকে ইহার তুলনাস্থল নাই। এসিয়া, আফ্রিকা, ইয়ুরোপ ও আমেরিকা পৃথিবীর এই চারি প্রদেশে শুদ্ধ ভারত ক্ষেত্রে এবং বাল্মীকির সময়েই ইহা সংসারে প্রদর্শিত ও সাহিত্যে অঙ্কিত হইয়াছে। অন্য কোথাও

ইহার ছায়াপাত হয় নাই। সুতরাং হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি যে, এইরূপ অ-লোক-সামান্য ভ্রাতৃভাবের মর্ম্মার্থ পাঠ এবং মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হইবে, এমন আমরা প্রত্যাশা করিনা।

প্রীতির প্রাণ আত্মোৎসর্গ। লক্ষ্মণ সেই আত্মোৎসর্গের সজীব প্রতিমূর্ত্তি। লক্ষ্মণ স্ত্রী জানিতেন না, পুত্র জানিতেন না, বিষয় বৈভব, মান অপমান, এবং সংসারের সুখ দুঃখ কিছুই জানিতেন না। তিনি জানিতেন একমাত্র ভ্রাতা;—ভ্রাতাই তাঁহার জীবনের ধ্রুব নক্ষত্র ছিলেন। যখন সত্যের অনুরোধে রাম ও লক্ষ্মণ এই দুই ভ্রাতার বিচ্ছেদ হইল, তাঁহারা উভয়েই তখন সরযুর জলে প্রাণত্যাগ করিলেন। দুই দেহে একপ্রাণ; সেই প্রাণ-রজ্জুর যখন গ্রন্থি চ্ছেদ হইল, দুইটি দেহই তখন ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। বীরত্বে লক্ষ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী কে? বুদ্ধির প্রখরতা, প্রকৃতির মহত্ত্ব এবং চরিত্রগৌরবে লক্ষ্মণ কাহার নিকট হীনপ্রভ? কিন্তু ভ্রাতৃ-প্রেম তাঁহার সমস্ত আত্মাকে এমন গ্রাস করিয়া রাখিয়া ছিল যে, তাঁহার আর পৃথগস্তিত্ব ছিল না। তিনি পৃথগস্তিত্ব ভাল বাসিতেন না। তিনি ভক্তিতে আনত এবং প্রীতিতে তগদত হইয়া একবারে ভ্রাতৃজীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত যতকাল জীবিত ছিলেন, ততকাল ঐ এক ভাবেই অটল রহিয়াছিলেন।

মহাভারতে এই ভ্রাতৃভাবের অনুকরণ চেষ্টা আছে, কিন্তু অনুকৃতি নাই। কালের পরিবর্ত্তে তখন লোকের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং তখন সকলেই আপনার মান, আপনার গৌরব, আপনার প্রভুত্ব ও পদমর্য্যাদা অক্ষত রাখিয়া ভালবাসিত এবং ভ্রাতৃপ্রেমেও বহুল পরিমাণে রাজনীতির প্রয়োগ করিত। ইহার সহস্র প্রমাণের মধ্যে প্রধান এক প্রমাণ গাণ্ডীবের নিন্দায় যুধিষ্ঠিরের নিগ্রহ। কর্ণভয়ভীত যুধিষ্ঠির কর্ণকে যুদ্ধে অজিত জানিয়া, যেই গাণ্ডীবের নিন্দা করিলেন, গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন অমনি অশেষ প্রকারে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলেন। যুধিষ্ঠির যে তাঁহাকে শিশুকাল হইতে সন্তানের ন্যায় লালন পালন করিয়াছেন, ইহা তখন তাঁহার মনে রহিল না। তখন শুধু আত্মগৌরবই তাঁহার মনে রহিল, এবং স্বার্থ-বুদ্ধিই তাঁহার চিত্তকে পরিপ্লুত করিল। পুরাতন সমস্ত কথা হৃদয় হইতে প্রক্ষালিত হইয়া গেল। ব্যাস লিখিয়া গিয়াছেন যে, অর্জ্জুন ক্ষণকাল পরেই ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত প্রায়শ্চিত্তও সর্ব্বথা সেই স্বার্থ-চিন্তার কুটিল কালের উপযুক্ত। ভ্রাতৃলঙ্ঘন পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?—না, আত্মপ্রশংসা

সায়নবাদ।

প্রথম প্রস্তাব।

সায়নবাদ কি? বোধহয় তাহা অনেকেরই অজ্ঞাত আছে; এজন্য বলিয়া দিতেছি, "সায়নবাদ" জ্যোতিষের একটি অঙ্গ। প্রাচীন জ্যোতিষের মধ্যে গ্রহরাজ সূর্য্যের দ্বিবিধ সঞ্চারের কথা লিখিত আছে। সায়ন ও নিরয়ন। এই প্রস্তাবে আমরা পুরাতন জ্যোতিষের সঙ্গে ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় নবীন জ্যোতিষিক সিদ্ধান্তের প্রভেদ দেখাইব বলিয়া প্রস্তাবটির মস্তকে "সায়নবাদ" মুকুট প্রদান করিলাম।

জ্যোতিঃশাস্ত্র অতি গহন, তন্মধ্যে সস্বচ্ছন্দ-বিচরণ অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। নূতন জ্যোতিষের প্রচারাবধি পুরাতন জ্যোতিষের প্রতি নব্য সম্প্রদায় হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, বৃদ্ধেরা অতি অজ্ঞ ছিল। কিন্তু প্রভেদের কারণ কি? ভ্রমক্রমেও একবার চিন্তা করেন না; চিন্তা করা আবশ্যকও মনে করেন না। পরন্তু দেশীয় জ্যোতিষের পুনরুন্নতির নিমিত্ত যে চিন্তাকরা আবশ্যক, তাহা সকলেরই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষের পূর্ব্বাবস্থা ও মূলতত্ত্ব—মধ্যাবস্থা ও তাহার মূলতত্ত্ব,—বর্ত্তমান অবস্থা ও ইহার মূলতত্ত্ব;—চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যদি আর কিছুকাল এই সকল বিষয়ের চিন্তা না করেন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই এদেশের মহা অনিষ্ট ঘটিবে। তাঁহারা ভ্রমবিলসিত গণনার কুহকে পড়িয়া গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুকালের বিপর্য্যয় করিয়া ফেলিবেন, আর বলিবেন "হায়! কলিকালের কি প্রভাব। শীতের সময় শীত নাই, গ্রীষ্মের সময় গ্রীষ্ম নাই, বর্ষার সময় বর্ষা নাই। অকালে বর্ষা, অকালে গ্রীষ্ম! হবেইত। না হওয়াই দোষ। হইলে শাস্ত্র সত্য হয়, ইত্যাদি—" অতএব পুরাতন জ্যোতিষের সঙ্গে নূতন জ্যোতিষের যে প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা এবং তাহার মূলানুসন্ধান করা অতীব কর্ত্তব্য।

প্রভেদ আছে, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু কোন্ কোন্ অংশে কি কি প্রকারের প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা হয়ত সকলে জ্ঞাত নহেন। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে একটি তালিকা প্রদান করিতেছি। এতদ্দ্বারা জানিতে পারিবেন যে, প্রাচীন সিদ্ধান্তের সহিত নবীন সিদ্ধান্তের কত প্রভেদ।

তালিকা।

প্রাচীন সিদ্ধান্ত।	নবীন সিদ্ধান্ত।
১। পৃথিবী স্থির, সূর্য্যাদি গ্রহমণ্ডল তাঁহাকে বেষ্টন করিতেছে।	১। সূর্য্য স্থির; পৃথিবী স্বকেন্দ্রক ভ্রমণ দ্বারা তাঁহাকে পরিক্রমণ করিতেছে।
২। পৃথিবীর ব্যাস ১৬০০ যোজন।	২। পৃথিবীর ব্যাস ৮৭০ যোজন।
৩। চন্দ্র বিম্ব ব্যাস ৪৮০ যোজন।	৩। চন্দ্রবিম্ব ব্যাস ২৩৮ যোজন।
৪। সূর্য্য বিম্ব ব্যাস ৬৪০০ যোজন।	৪। সূর্য্য বিম্ব ব্যাস ৯৭০০০ যোজন।
৫। চন্দ্র, ভূকেন্দ্র হইতে ৫১৫৬৬ পরিমিত যোজনান্তরে আছেন।	৫। চন্দ্র ভূকেন্দ্র হইতে ২৬১৩৪ যোজনান্তরে আছেন।
৬। সূর্য্য ভূকেন্দ্র হইতে ৬৮৯৭৭ যোজনান্তরে আছেন।	৬। সূর্য্য ভূকেন্দ্র হইতে ১০৪৪২.৫৪ যোজনান্তরে আছেন।

৭। মঙ্গলাদি গ্রহগণের বিম্বমান।

গ্রহ	কলা	বিকলা	গ্রহ	কলা	বিকলা
মঙ্গল	৪	৪৫	মঙ্গল	৬	২৯
বুধ	৬	১৫	বুধ	৬	৪৯
বৃহস্পতি	৭	২০	বৃহস্পতি	৩৬	৭৪
শুক্র	৯	০	শুক্র	১৬	১
শনি	৫	২০	শনি	১৬	২

প্রাচীন সিদ্ধান্ত।	নবীন সিদ্ধান্ত।
৮। ভূকেন্দ্র হইতে সূর্য্য যত দূরে, নক্ষত্র সকল তাহার ৬০ গুণ দূরে, এবং তাহারা সূর্য্যতেজে প্রকাশ পায়।	৮। ভূকেন্দ্র হইতে অসীম অন্তরে, এবং ইহাও নির্ণীত হইয়াছে যে, উহারা ভূকেন্দ্র হইতে সমান অন্তরে নহে ও আপন তেজেই প্রকাশ হয়।
৯। সকল গ্রহেরই যোজনাত্মক গতি তুল্য এবং তাহাদের কক্ষাবৃত্ত স্বরূপ।	৯। গ্রহদিগের যোজনাত্মক গতি বিষম অর্থাৎ সকলের সমান নহে এবং তাহাদের পথ বৃত্তাকার।
১০। এক নিরয়ন সৌর বৎসরে ৩৬৫ দিন, ১৫ ঘটিকা, ৩০ পল।	১০। এক নিরয়ন সৌরবর্ষে ৩৬৫।১৫।২২ পল
১১। চন্দ্রের চক্রভোগ কাল ২৭ দিন, ৭ হোরা ৪৩।১৯।৩।১২। সূর্য্যের পরম ক্রান্তি ২৪ অংশ।	১১। চন্দ্রের চক্রভোগ কাল ২৭ দিন, ৭ হোরা ১৩।১১।৫৪।১২। সূর্য্যের পরম ক্রান্তি ২৭ অংশ, ২৭ কলা।
ইত্যাদি।	ইত্যাদি। *

* ইংরেজী মান বাঙ্গলায় হিসাব করিয়া দেওয়া হইল।

নবীন সিদ্ধান্তের সহিত প্রাচীন সিদ্ধান্তের এত প্রভেদ। নিদর্শনের জন্য অল্প সংখ্যক বিষয় প্রদর্শিত হইল। পরন্তু এইরূপ বিষয়ের তারতম্য বা প্রভেদ আছে। প্রভেদ ঘটনার কারণ নানাবিধ। কতক অজ্ঞতা নিবন্ধন ভ্রম, কতক বা রূপক কল্পনা, কতক বা গাণিতিক পরিভাষার বিপর্য্যয়ঘটনা এবং কতক কালপরিবর্ত্তনের ধর্ম্ম। হয়ত পূর্ব্বকালে কথিত প্রকারই ছিল, পরিবর্ত্তিত বর্ত্তমান কালে নব্য সিদ্ধান্তের অনুরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা কেবল বেধ-মূলক। বেধই জ্যোতির্ব্বিদ্যার জীবন। যদি এখনও চেষ্টা করা যায়, কোন নিপুণ ব্যক্তি যদি এক্ষণ হইতে নানাবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে বেধ নির্ণয় করিয়া প্রাচীন জ্যোতিষের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলেও অন্ততঃ অনেকাংশের বৈগুণ্য সমাধান হইতে পারে। "বেধ-করণ" ক্রিয়ার চর্চ্চা বহুকাল যাবৎ ভারত হইতে উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতেই এত ক্ষতি। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে যখন এদেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার সঞ্চার হয়, তখন যে বেধক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে কিনা প্রথমকার বেধক্রিয়া কতকটা আনুমানিক, এজন্য সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম না হইতেও পারে।

প্রাগুক্ত প্রভেদ সমূহের মধ্যে কতকগুলি কেবল কাল-পরিবর্ত্তনের মাহাত্ম্যেই ঘটিয়াছে, বলা যাইতে পারে। বশিষ্ট সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতির্গ্রন্থে লিখিত আছে,

"ইত্থং মাণ্ডব্য! সংক্ষেপাদুক্তং শাস্ত্রং ময়োদিতম্।
বিস্তরেো রবিচন্দ্রাদ্যৈর্ভবিষ্যতি যুগে যুগে॥"

হে মাণ্ডব্য! এবম্ভূত জ্যোতির্ব্বিদ্যাটি আমি তোমায় সংক্ষেপে বলিলাম। পরন্তু চন্দ্রসূর্য্যাদির দ্বারা যুগে যুগে ইহার ব্যতিক্রম ঘটনা হইয়া থাকে।

অতএব কত কাল-কালান্ত অতীত হইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার বেধ সংস্কার হয় নাই এরূপ হইলে গণনার ব্যতিক্রম না হইবে কেন? সূর্য্যের পরমক্রান্তি, তাহার চক্রভোগ কাল, ইত্যাদি পদার্থও ঠিক না হইবারই কথা। মধ্যে মধ্যে যদি বেধক্রিয়ার দ্বারা নির্ণয় করিয়া পুরাতন গ্রন্থের সংশোধন ও নব নব গ্রন্থের রচনা করা হইত, তাহা হইলে কখনই এত তারতম্য ঘটিত না। ভারতবর্ষে যখন জ্যোতির্ব্বিদ্যার সমূহ উন্নতি, তখন তাঁহারা যে উপদেশটি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, পরভাবী গণক মহাশয়েরা যদি তাহা পালন করিতেন, তাহা হইলে কদাচ বিন্দুবিসর্গেরও ত্রুটি হইত না। সেই উপদেশটি এই,—

"যস্মিন্ পক্ষে যত্র কালে যেন দৃগ্গণিতৈক্যকম্।
দৃশ্যতে যেন পক্ষেণ কুর্য্যাৎ তিথ্যাদি নির্ণয়ম্॥"

(এটি শ্রুতি নামে প্রসিদ্ধ।)

যে পক্ষে যে সময়ে যদ্দ্বারা দৃষ্টি ও

গণিতের ঐক্য সাধিত হয়, সেই পক্ষে সেই সময় অনুসারে তিথি আদির নির্ণয় করিবেক।

পরভাবী আচার্য্যেরা যদি পূর্ব্ব ঋষিদিগের এই উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের গ্রন্থ নির্মাণ কালে তৎসাময়িক জ্যোতিঃপদার্থের বেধক্রিয়া, অনুমান ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা একত্র বা ঐক্য করিয়া তত্তৎগ্রন্থ নির্ম্মাণ করাই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু অনেকে তাহা করেন নাই, কেবল কতকগুলি বাক্য সংগ্রহ করিয়া ব্যভিচার দ্বারা গ্রন্থ গুলিকে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

যে সময়টিতে দিবামান ও রাত্রিমান তুল্য হয়, তাহাকে বিষুবপাত বলে। সূর্য্যের বিষুব রেখা স্পর্শই এই দিবারাত্রের তুল্যতা ঘটনার কারণ। বিষুব-সঞ্চার অনুসারেই "মহাবিষুব সংক্রান্তি" ও "জলবিষুব সংক্রান্তি" নাম হইয়াছে। অতি পুরাতন কালের কোন এক সময়ে বসন্ত ঋতুর প্রথমার্দ্ধ সমাপ্তি কালে সূর্য্যের বিষুব সঞ্চার হইয়াছিল। দিবামান ও রাত্রিমান তুল্য হইয়াছিল। তদনুসারে তাহার "মহাবিষুব সংক্রান্তি" নাম হয়। কিন্তু এখন তাঁহার অনেক পূর্ব্বে অর্থাৎ চৈত্রমাসের ১০ই তারিখে দিবারাত্রি সমান হইতেছে, তথাপি আমরা সেই বৈশাখ মাসের মহাবিষুব সংক্রান্তিই ধরিয়া আছি। যদিও লগ্নাদি নির্ণয় কালে তাহার শোধন করিয়া লওয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ অয়নাংশ করিয়া তাহার সাম্য সম্পাদন করা হয়, তথাপি তাহাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ রীতি বলা যাইতে পারে না। এতদপেক্ষাও শোধনের কোন বিশেষ নিয়ম করা উচিত।

অনেকে বলিতে পারেন, যে গ্রহগতি ও ক্রান্তি প্রভৃতি যেন লড়িয়া গিয়াছে, শোধন করিয়া লইলেই হইল; কিন্তু এমন কতক গুলি বিষয় আছে, যাহা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা বা ভ্রমের ফল ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। যথা—"পৃথিবী স্থির, সূর্য্যই তৎকেন্দ্রক পরিক্রম করেন, নক্ষত্র সকল স্বয়ং তেজস্বী নহে, সূর্য্যের তেজেই প্রকাশ পায়।" ইত্যাদি।

সত্য বটে, নবীন সিদ্ধান্তটি অনেকাংশে যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু এই সত্য তৎকালীন কাহারও হৃদয়ে উদিত হয় নাই, এরূপ নির্দ্ধারণ করা যায় না। দ্বি সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। পরন্তু আমাদিগের বিবেচনা হয়, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিদিগের মনেও এই সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। কারণ এ সমস্ত কথা এরূপ গভীর ভাবে উল্লিখিত আছে যে, তাহা চলৎপৃথ্বীপক্ষে লইয়া গেলেও যাওয়া যায়। তবে যে তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া পৃথিবী স্থির বলিয়াছিলেন, তাহার অভিপ্রায় বোধহয় এই এবং ইহা সাধু অভিপ্রায় বলিয়াই বোধহয়। যথা,—

পৃথিবী সচলা, ইহা ব্যক্ত না করিলেও ক্ষতি নাই। বরং পৃথিবীর চলবত্তা বর্ণন করাতে ক্ষতি আছে। একটাকে ঘুরাইতে

হইবে, নচেৎ গণনাসিদ্ধি হয় না। সূর্য্য কি পৃথিবী একের ঘূর্ণন কল্পনা করিলেই যখন সমস্ত গণনাসিদ্ধি হয়, তখন অনুমানগম্য পৃথিবী ঘূর্ণন অপেক্ষা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সূর্য্য ঘূর্ণনের বর্ণনা করাই ভাল। ইহাতে গণনার কোন ইতি কর্ত্তব্যতার ক্ষতি নাই, অথচ সাধারণ লোকের সহজ বোধ্য। ইত্যাদি।

ঋষিদিগের অভিপ্রায় যে এইরূপ ছিল, মহাভারতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

"ইমাং মহীং শৈলবনোপপন্নাং
সসাগরগ্রামবিহারযুক্তাম্।
ত্বং শেষ। * * * চলিতাং যথাবৎ,
সংগৃহ্য তিষ্ঠস্ব যথাচলা স্যাৎ।"

আদিপর্ব্বের আস্তীক পর্ব্বীয় এই শ্লোকটির ভঙ্গী দেখিয়া অনুমান হয় যে, ব্যাসের সময়ের ঋষিরা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ, পৃথিবীর চলবত্ত্বা বুঝিতে পারিয়াও লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই। এই সময়েই পৃথিবীর "অচলা" নাম এবং পৃথিবী স্থির, সূর্য্যাদি গ্রহগণ ভ্রমণশীল, এই প্রকার মতের প্রাবল্য হয়। বহুকালের পর আবার আর্য্যভট্ট বিশুপ্ত মতের পুনঃ প্রচার করেন।

অনেকে বলিতে পারেন, ব্রহ্মা যে শেষ নাগকে সচল পৃথিবী নিশ্চল করিবার জন্য আদেশ করেন, সে নিশ্চলতা অন্যবিধ। পূর্ব্বে বোধ হয় সর্ব্বদাই ভূকম্প হইত, পৃথিবী তাহাতে অস্থির হইতেন। সেই চাঞ্চল্য নিবারণের জন্যই ব্রহ্মা, শেষ নাগকে আদেশ করেন। অদ্যাপি এদেশে ঐরূপ জন প্রবাদ প্রচলিত আছে। এবং এক্ষণ পর্য্যন্তও এদেশীয় অজ্ঞলোকেরা ভূকম্পের সময় বলিয়া থাকে যে, "বাসুকী মাথা বদল করিতেছেন।" অতএব পৃথিবীর প্রকৃত চলবত্ত্বা জ্ঞান ঋষিদিগের ছিল বিনা সন্দেহ।

যদিও এই আপত্তির প্রকৃত উত্তর করিতে না পারি, তথাপি ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, এ সম্বন্ধে ঋষিদিগের একেবারেই কিছু জ্ঞান ছিল না এমত নহে। অন্ততঃ চলবত্ত্বা জ্ঞানটি সংশয়ের আকারে ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। কেন না প্রদর্শিত শ্লোকের উত্তরে এবং অন্যান্য স্থলে দেখা গিয়াছে, "চলিত" শব্দের পূর্ব্বে "নিয়ত" "সদা" প্রভৃতি এক একটি বিশেষণ আছে। কোথাও "আবর্ত্তন" শব্দ আছে। সুতরাং "নিয়ত-চলন" এইরূপ শব্দ দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঘূর্ণনরূপ চলন লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা ঐ সকল কথা লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক এ সকল বিষয়ের বহু আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবীই ঘুরুন, আর গ্রহেরাই ঘুরুন, একটি ঘুরিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। কোনটি সত্য তাহা না দেখিলেও হানি নাই। কিন্তু অন্যান্য গণনার অংশগুলি অসত্য হইলেই এদেশের ভয়ানক ক্ষতি।

"গ্রহলাঘব" নামে একখানা জ্যোতিগ্রন্থ আছে, ইহা অনধিক ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে গণেশ দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক রচিত।

গণেশ দৈবজ্ঞ যখন এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তখন তিনি বেধক্রিয়ার সহিত প্রত্যক্ষ দর্শনের ঐক্য রাখিয়াই করিয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত পুস্তকখানি অদ্যাপি নির্দ্দোষ আছে।

রাজা জয়সিংহ বারাণসীতে একটি বেধালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি পুরাতন জ্যোতিগ্রন্থ গুলির সংস্কার করিবার অভিপ্রায় করিয়াই পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। বারাণসীস্থ বেধালয় বা মন্দিরের বর্ণনা দ্বারা পাঠকবর্গের চিত্তরঞ্জনের অভিলাষ রহিল।

শ্রীকালীবর বেদান্ত বাগীশ।

ভারতবর্ষীয় ভাষা।

বৈজ্ঞানিকগণ ভারতবর্ষের যাবতীয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাকে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। ভারতে ভূমণ্ডলের প্রত্যেক প্রকৃতি অল্প বা অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তদ্বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা আমাদের বিষয় ও উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। ভারতবর্ষে প্রায় বিংশতি কোটি মানব বাস করে। এই মানবসমূহ অন্যূন ষষ্টি সংখ্যক স্বতন্ত্র জাতিতে বিভক্ত। ইহাদেব সামাজিক ব্যবহারাদি পরস্পর অনৈক্য। ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি মানব বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র ভাষায় কথোপকথন করে। সেই ভাষা সমস্তের উৎপত্তি নির্ণয় করাই উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আর্য্যেরা ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন। আর্য্যদিগের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে নিতান্ত অসভ্যজাতি সমূহ বাস করিত। আর্য্যেরা ভারতভূমে প্রবেশ করিয়া ইহার অসভ্য অধিবাসিনিচয়কে বিদূরিত করেন। তাঁহাদের উৎপাতে উৎপীড়িত হইয়া প্রাচীন অধিবাসিগণ অধিকাংশ দাক্ষিণারণ্য নামক জনহীন অরণ্য মধ্যে, অবশিষ্টেরা দুর্গম হিমাচল আশ্রয়ে প্রস্থান করে। এই অসভ্যজাতিদিগের ভাষা তাহাদের স্বভাবানুগত ছিল। আর্য্যেরা পবিত্র-সলিলা গঙ্গা ও যমুনা নদীদ্বয়ের অন্তর্ভূমে আবাস সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভুবনবিখ্যাত সংস্কৃত ভাষা আর্য্যদিগের সহিত ভারতভূমে প্রবেশ করে। দেব-ভাষা সংস্কৃতমধ্যে বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা এতই প্রাচীন যে, ইহার প্রণেতা কে, তাহা অধুনা নির্ণয় করা অসাধ্য। ইহার প্রাচীনত্ব হেতুই হউক, বা ইহার পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্তই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, হিন্দুগণ বেদকে অপৌরুষেয় ব-

লিয়া থাকেন। যথা ;—

জৈমিনী—১।১।৩২ সূত্রের অষ্টমাধিকরণ।

"পৌরুষেয়ং নবা বেদ-
বাক্যং স্যাৎ পৌরুষেয়ত।
কাঠকাদি সমাখ্যানাৎ
বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবৎ ॥
সামাখ্যাধ্যাপকত্বেন
বাক্যত্বস্তু পরাহতম্।
তৎ কর্ত্রনুপলম্ভেন
স্যাত্ততোঽপৌরুষেয়তা ॥"

বেদের ভাষা প্রচলিত সংস্কৃতের সহিত সমান নহে। এই জন্য প্রচলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ অভ্যাস করিলে বেদশাস্ত্রে প্রবেশ করা যায় না। সংস্কৃতের পরেই বা সমকালে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হয় *। সংস্কৃত যেরূপ সুসম্পন্ন, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও কঠিন ভাষা, তাহাতে সতত কথোপকথনে সংস্কৃত ব্যবহার করা সহজ নহে। বোধ হয় এই জন্যই কথোপথন কার্য্য সুনির্ব্বাহিত করিবার নিমিত্ত অন্য ভাষার প্রয়োজন হইয়া উঠে। প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়া সেই প্রয়োজন সংকুলান করে।

সংস্কৃত ভাষা হইতে যে প্রাকৃতের উৎপত্তি, এ সম্বন্ধে বিস্তর অকাট্য প্রমাণ আছে। বররুচি সংস্কৃত ভাষার অতি প্রা-

* কোন কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, প্রাকৃত ভাষাই আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন ভাষা। আমরা এস্থলে তাঁহাদিগের যুক্তিনিচয় প্রকটন করিতেছি।

তাঁহারা বলেন সংস্কৃতের ন্যায় কঠিন ভাষা, কদাচ কথোপকথনের উপযোগী নহে। ইহা কস্মিন্ কালে কথিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। কথিত ভাষা স্বতন্ত্র ছিল। সেই ভাষার নাম প্রাকৃত। সেই প্রাকৃত ভাষাকে 'সংস্কৃত' অর্থাৎ বিশুদ্ধ করিয়া কাব্য দর্শনাদি লিখিবার নিমিত্ত যে ভাষা সৃষ্ট হয় তাহার নাম সংস্কৃত। তাঁহারা প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষাদ্বয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের প্রসূতী ও প্রসূতা সম্বন্ধ অনুমান করেন। আমরা পাঠকবৃন্দের গোচরার্থ কয়েকটি প্রাকৃত ও তাহার সংস্কৃত শব্দ নিম্নে লিখিতেছি।

প্রাকৃত	সংস্কৃত
গদ	গত
হত্ত	হস্ত
পচ্চিম	পশ্চিম
লোনম্	লবণম্
ত্থান	স্থান
গাম	গ্রাম
হলদ্দা	হরিদ্রা
মাদরম্	মাতরম্
অগ্গিম্	অগ্নিম্
বাহ্মন	ব্রাহ্মণ
চঠুত্থি	চতুর্থী
চঠুদ্দশী	চতুর্দ্দশী
ছট্টী	ষষ্ঠি
ছণ	ক্ষণ
একত্থ	একস্থ

চীন বৈয়াকরণ। তিনি প্রাকৃতকে সংস্কৃত-সম্ভূতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্থান-ভেদে ও ব্যবহার-ভেদে প্রাকৃতের বিস্তর রূপান্তর হয়। "প্রাকৃত-প্রকাশে" প্রাকৃতের চারি ভাগ উক্ত হইয়াছে। যথা ;—(১) মহারাষ্ট্রীয়, (২) পৈশাচী, (৩) মাগধী, (৪) শৌরসেনী। এই ভাষানিচয় মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা প্রধান প্রাকৃত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাকৃতের দ্বিতীয় রূপান্তর পৈশাচী ভাষা, শৌরসেনী ভাষা হইতে সমুদ্ভূত। বররুচি প্রণীত

মত্থক	মস্তক
পবিদা	প্রপিতা
অত্তি	অস্তি
	ইত্যাদি

এই তালিকাদৃষ্টে আমাদের বিবেচনায় প্রাকৃত সংস্কৃত-মূলক বলাই যুক্তি-যুক্ত। তাঁহারা আরও কহেন, 'প্রকৃতিস্তু চাপরে জনাঃ' এরূপ বিবেচনা না করিয়া "প্রকৃতি" অর্থাৎ স্বভাব "প্রাকৃত" অর্থাৎ চিরাগত বিবেচনা করিলে, প্রাকৃতের প্রাচীনত্ব সমর্থিত হয়। ইত্যাদি রূপ কতকগুলি যুক্তি অবলম্বন করিয়া কোন কোন পণ্ডিত প্রাকৃতকে সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আমরা এ কথার কোন সামঞ্জস্য করিতে পারি না। আমাদের মতে এ সকল যুক্তি অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং পণ্ডিত মণ্ডলীকে ইহার মীমাংসা করিবার ভার দিতেছি।

"প্রাকৃত-প্রকাশ" গ্রন্থের মনোরমাখ্যাত টীকাকার লিখিয়াছেন যে,—

"পিশাচানাম্ ভাষা পৈশাচী। অস্যা পৈশাচ্যাঃ প্রকৃতিঃ শৌরসেনী।"

পিশাচদিগের ভাষা পৈশাচী। এই পৈশাচীর প্রকৃতি শৌরসেনী।

বররুচির কথা প্রমাণে মাগধী ভাষাও পৈশাচীর ন্যায় শৌরসেনীর প্রকার-ভেদ এবং শৌরসেনী ভাষা সংস্কৃত হইতে সমুৎপন্ন। বররুচি এই সকল প্রাকৃত মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়কে প্রধান প্রাকৃত এবং তাহাও সংস্কৃত-মূলক বলিয়াছেন। এতাবতা প্রমাণ হইতেছে যে, মহারাষ্ট্রীয় বা প্রধান প্রাকৃত ও শৌরসেনী এই ভাষাদ্বয় সাক্ষাৎ সংস্কৃত মূলক। মাগধী ভাষাকে সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা শৌরসেনী-মূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভাষা-তত্ত্ব-বিৎ লাসেন বলেন, মাগধী ভাষা আলোচনা করিলে উপলব্ধ হয় যে, ইহাও মহারাষ্ট্রীয় এবং শৌরসেনীর ন্যায় সংস্কৃত-মূলক। লাসেন বলেন পৈশাচী ভাষাও সংস্কৃত সঞ্জাত। তিনি সংস্কৃত বৈয়াকরণগণকে এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। ফলতঃ এ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর লাসেনের যুক্তি সমধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃতের পতন সময়ে বা সমকালে উক্ত ভাষা চতুষ্টয় জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদের সকলই এক মূল-ভাষা সংস্কৃত হইতে সম্ভূত, ইহা মনে করা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। এই চারি ভাষা কথোপকথনের সুবিধা

সাধনার্থ সৃষ্ট হয়। ইহারা যে এককালে বিলক্ষণ চলিত ভাষা হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়, মাগধী ও শৌরসেনী এই ভাষাত্রয়ের নাম প্রমাণ করিতেছে যে, উহারা উক্ত নামধেয় প্রদেশত্রয়ে প্রচলিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের আবিষ্কর্তা শাক্যসিংহের মাতৃভাষা মাগধী। এ নিমিত্ত মাগধীভাষা বৌদ্ধধর্মের উন্নতিসহ বিশেষ উন্নত হইয়া উঠে। মাগধী ভাষায় বৌদ্ধদিগের ধর্মগ্রন্থ বিরচিত হয়। যখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতময় প্রচলিত হইয়াছিল, মাগধী ভাষাও তৎকালে বহুবিস্তৃত হইয়াছিল। সিংহলে গিয়া মাগধী ভাষা পালি নাম গ্রহণ করে। শৌরসেনী ভাষাও মাগধীর ন্যায় জৈনদিগের ধর্ম্মভাষা।

"প্রাকৃত কল্পতরু" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত চারি ভাষা এবং অর্দ্ধমাগধী ও দাক্ষিণাত্য ভাষা, এই ছয় ভাষার সাধারণ নাম ভাষা। এই ভাষা সমস্তের অপর শ্রেণীর নাম বি-ভাষা। যথা,—

শকারী বা চণ্ডালিকা
সাবরী
আভীরী
দ্রাবিড়ী
উৎকলী।

এই কয় ভাষাও নাটকাদিতে প্রযুক্ত হইয়াছে। এ নিমিত্ত ইহাদিগকে অপভ্রংশ নাম দেওয়া হয় নাই। বিভাষার পরাগত শ্রেণীর নাম অপভ্রংশ। বাঙ্গালা, গুজরাটী প্রভৃতি যে সকল চলিত ভাষা নাটকাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই তাহাদের নাম অপভ্রংশ।

পণ্ডিতবর বীম্‌স্ সাহেব নিম্নলিখিত চলিত ভাষাগুলির মূল উল্লিখিতবৎ স্থির করিয়াছেন। যথা,—

১। হিন্দি
২। বাঙ্গালা
৩। পঞ্জাবী
৪। সিন্ধি
৫। মহারাষ্ট্রী
৬। গুজরাটী
৭। নেপালী
৮। উড়িয়া
৯। আসামী।
১০। কাশ্মীরী

এই একাদশ ভাষার সকল গুলিই অধুনা ভারতবর্ষের স্থান বিশেষে চলিত আছে। উক্ত ভাষা সমস্তের ব্যবহারভেদে ও স্থানভেদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রূপান্তর হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী বীম্‌স্ সাহেব গুরুতর পরিশ্রম সহকারে তৎসমস্ত নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি হিন্দি ভাষার নিম্নলিখিত কয় শ্রেণী স্থির করিয়াছেন। যথা,—

মৈথিলী—(পুর্ণিয়া ও ত্রিহুতের ভাষা)
মগধ—(দক্ষিণ বিহারের ভাষা)
ভোজপুরি—(সাহাবাদ, সারণ, চাম্পারণ, গোরক্ষপুর, প্রাচ্য অযোধ্যা এবং বারাণসীর ভাষা)

কোশলী—(অযোধ্যা এবং বোহিল খণ্ডের ভাষা।)

ব্রজভাষা—(উত্তর দোয়াব, আগ্রা এবং দিল্লীর ভাষা।)

কনোজী—(দক্ষিণ দোয়াবের ভাষা।)

রাজপুত ভাষা—(রাজপুতানার ভাষা।)

বুঁদেলখণ্ড-ভাষা—(চম্বল হইতে শোন নদী পর্য্যন্ত প্রদেশের ভাষা।)

বীম্‌স-সাহেব বাঙ্গালা ভাষার কোনও প্রকারভেদ লেখেন নাই। তিনি উড়িয়া ও আসামী ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ দুই ভাষাকে বাঙ্গালার রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। এ সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি আছে তাহা বিবৃত করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিতে হয়।

পঞ্জাবীর অনেক প্রশাখা। পঞ্জাবের প্রত্যেক প্রদেশের ভাষায় অল্প বা অধিক পরিমাণে বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়।

সিন্ধীয় ভাষার নিম্ন-লিখিত প্রভেদ আছে।

সিরাই—(উত্তর সিন্ধের ভাষা।)।

বিচোলি—(দক্ষিণ সিন্ধের ভাষা।)।

লারি—(নিম্ন সিন্ধের ভাষা)

উছ্—(মুলতানের ভাষা)

কচ্ছি—(কচ্ছের ভাষা।)

মহারাষ্ট্রীয় ভাষার নিম্নলিখিত চারি প্রকার বিভিন্নতা আছে।

কনূকানি—(রত্নগিরি এবং সমুদ্র সন্নিহিত স্থানের ভাষা।)

দাক্ষিণা—

গোমন্তকী বা কুদালি—(সাবন্ত বাড়ীর নিকটের ভাষা।)

খান্দেশী—

গুজরাটের তিন স্বতন্ত্র প্রদেশে ত্রিবিধ ভাষা কথিত হয়। ঐ তিন ভাষাই মুল গুজরাটীর প্রশাখা মাত্র। যে তিন স্থানে ভাষার স্বতন্ত্রতা আছে,তাহাদের নাম ;—

সুরত এবং বরোচ

অমেদাবাদ

কাটিওয়ার

বিশুদ্ধ নেপালীকে পার্ব্বত্য বা পাহাড়ী বলে। তাহার যে কয় শাখা আছে, মুলের সহিত তাহাদের প্রভেদ সামান্য। নিম্ন-লিখিত স্থান সমূহের ভাষার সামান্য বিভিন্নতা আছে।

পাল্পা

কমায়ুন

গাড়ওয়াল

থাক

মহাত্মা বীম্‌স্ পূর্ব্ব-লিখিত ভাষাগুলিকে সংস্কৃত-মুলক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষ প্রচলিত অপর যে সমস্ত ভাষা আছে, তৎসমুদয়কে তিনি জেন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্য-মুলক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বীম্‌স্ সাহেব যে যে রূপান্তরে উক্ত জেন্দ-মুলক ভাষা সমস্ত ভারতবর্ষে চলিত আছে বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। ভোটিয়া বা ভোটান্তা (ভোট-রাজ্যে)
২। লেপ্‌চা (সিকিম রাজ্যে)
৩। লিম্বু } (সোন, কোশী ও অরুণ নদী-মধ্যস্থ স্থানে)
৪। কিরন্তি }
৫। মুর্ম্মি (পূর্ব্ব নেপাল)
৬। গরঙ্গ (ঐ)
৭। নেওয়ার (মধ্য নেপাল)
৮। মগর (ঐ)
৯। ব্রাহ্ম (ঐ)
১০। চিপঙ্গ } (অযোধ্যা। বায়ু—পূর্ব্ব নেপালেও চলিত)
১১। কুসুণ্ড }
১২। বায়ু }
১৩। সনওয়ার (পশ্চিম নেপাল)
১৪। সর্প (ঐ)
১৫। কনওয়ারি বা মিলচান
১৬। তিবারস্কদ } (কুমাও-নের উত্তরে)
১৭। হুন্দেশী }
১৮। দারাহি বা দোর্হি
১৯। মেওয়ার }
২০। পাহাড়ী }
২১। কাশওয়ার } (মধ্য নেপাল)
২২। পাক্ষ }
২৩। তক্ষ }
২৪। ধীমল (নেপাল ও ভোটের কিয়দংশ)
২৫। মেচী (ঐ)
২৬। বেরো (কাছাড়)
২৭। গারো (গারোপাহাড়)
২৮। অক }
২৯। আবর }
৩০। মিসমি } (আসাম সান্নিধ্যে)
৩১। মিরি }
৩২। দফ্‌লা }
৩৩। খসিয়া (আসামের দক্ষিণ)
৩৪। মিকির (ঐ)
৩৫। নাগা }
ক। রেঙ্গমা } ঐ (নাগার প্রশাখা)
খ। অঙ্গামি }
গ। লোটা }
৩৬। সিঙ্গফো (ঐ)
৩৭। কুকি (চট্টগ্রামের উত্তর)
৩৮। মনিপুরি ভাষা।
৩৯। কোরেঙ্গ ভাষা
৪০। কারেণ ভাষা
৪১। সাঁওতাল
৪২। কোল (চয়বাসা)
৪৩। ভূমিজ্জা (পুরুলিয়া)
৪৪। মণ্ডালি (ছোট নাগপুর)
৪৫। কোলেছান
৪৬। খন্দ (সম্বলপুর)
৪৭। গন্দ
৪৮। উরায়ন (সরগুজা)
৪৯। তেলুগু
৫০। তামিল
৫১। কর্ণাটক
৫২। মলয়ালম্
৫৩। তুলুচু
৫৪। কুর্ণ
৫৫। তুদু
৫৬। বুদগড় }
৫৭। ইরুলার } নীলগিরিপাহাড়
৫৮। কোহতর }
৫৯। সিংহলীয়

বীম্‌স্ সাহেব-প্রদত্ত ভেদমূলক ভা-

যাসমূহের তালিকা উল্লিখিত হইল। "শব্দভাষা চন্দ্রিকা" প্রণেতা লক্ষ্মীধর, পৈশাচী ভাষার যে সমস্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা মহাত্মা বীমস্ কর্ত্তৃক নিরূপিত জেন্দমূলক ভাষা সমূহের স্থানের সহিত প্রায় মিলিতেছে। লক্ষ্মীধর যে সকল স্থানের কথা বলিয়াছেন, অধুনা সে সকল স্থানের নাম ও সীমা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা নিম্ন লক্ষ্মীধরোক্ত পৈশাচী ভাষার স্থান সকলের নাম উল্লেখ করিতেছি।

পাণ্ড্য
কেকয়
বাহ্লীক
সহ্য
নেপাল
কুন্তল
সুদেশ
ভোট
গান্ধার
হৈব
কনোজানা

পাঠকগণ প্রাচীন ভূগোল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে, লক্ষ্মীধর কথিত পৈশাচী ভাষার এই প্রাচীন স্থান সমূহ ও বীম্স সাহেব কর্ত্তৃক নির্ণীত জেন্দ-মূলক ভাষা সমস্তের স্থান অধিকাংশই এক। সুতরাং এই দুই তালিকা পর্য্যালোচনা করিয়া উপলব্ধ হইতেছে যে, বীম্স্ সাহেব যে সকল ভাষাকে জেন্দ-মূলক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণে তাহা পৈশাচী নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা পৈশাচিক ভাষাকে জেন্দমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না। কারণ সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন যে, পৈশাচী ভাষা সংস্কৃতমূলক। তাঁহারা পৈশাচীকে প্রাকৃতের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রাকৃত যে সংস্কৃতমূলক তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। যথা ;—হেমচন্দ্র —

"প্রাকৃতঃ সংস্কৃতাৎ, তত্র ভবম্ ততঃ আগতম্ বা প্রাকৃতম্।"

"প্রাকৃত সংস্কৃতমূলক, প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বা আগত।"

এ সম্বন্ধে অন্য প্রমাণ সংকলনের প্রয়োজন নাই।

ভাষা-তত্ত্ব-বিৎ লাসেন সাহেব বলিয়াছেন যে, পৈশাচী সংস্কৃত হইতে সাক্ষাৎ সমুদ্ভূত। কিন্তু আমরা যতদূর দেখিতেছি তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বীম্স্ সাহেবের জেন্দমূলক ভাষা ও সংস্কৃতমূলক পৈশাচী ভাষা এক; সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, বীম্স্ মহোদয় পৈশাচী ভাষাকেই জেন্দমূলক বলিয়াছেন; কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোড়ন করিয়া ইহা নিঃশংসয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পৈশাচী সংস্কৃত-মূলক। তবে বীম্স্ সাহেব এ কথা কেন বলিতেছেন ? স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে ইহার কারণ অনুমান করা

যাইতে পারে। পৈশাচী ভাষা যখন প্রথমে সংস্কৃত হইতে জন্ম গ্রহণ করে, তখন তাহার প্রকৃতি অবিকল সংস্কৃতের ন্যায় ছিল, তখন শুনিলে তাহা যে সংস্কৃতমূলক একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইত। কিন্তু কালচক্রে সকলেরই পরিবর্তন হয়। কালচক্রে পৈশাচী-ভাষাও পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল। যে যে স্থানে পৈশাচী ভাষা প্রচলিত হয়, তাহার অধিকাংশ ভারতের সীমাস্থ প্রদেশ। সেই সীমা অতিক্রম করিলেই যে যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, তথায় জেন্দমূলক ভাষা প্রচলিত। অসম্ভব নয় যে, ভারতের সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশস্থ ব্যক্তিগণ উক্ত বৈদেশিক ব্যক্তিগণের সহিত বহুবিধ সম্বন্ধে বদ্ধ হয়। ক্রমে ঐ জেন্দমূলক ভাষা পৈশাচী ভাষার সহিত বিমিশ্রিত হইতে থাকে। এবং কালক্রমে পৈশাচীভাষা এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে যে, এক্ষণে তাহাকে দেখিলে সংস্কৃতমূলক বলিয়া বোধ না হইয়া জেন্দমূলক বলিয়াই অনুমান হয়। দেখা যাইতেছে যে, মুসলমানদিগের সহিত যখন বঙ্গদেশের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তখন মুসলমানীয় ভাষা এত অধিক পরিমাণে বঙ্গভাষার সহিত বিমিশ্রিত হইয়াছিল যে, বঙ্গভাষাকে প্রায় এক স্বতন্ত্র ভাষার স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। সেইরূপে সংস্কৃতমূলক পৈশাচীর সহিত, জেন্দমূলক অপর ভাষা মিশিয়া যে তাহাকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিবে তাহাতে বিচিত্র কি!

এ সম্বন্ধে আরও এক কারণ অনুমিত হইতে পারে। সামাজিক ব্যবহার বিষয়ে পৈশাচিকগণ, হিন্দুগণের নিকট হইতে কদাপি সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদিগের আনুগত্যও জন্মে নাই। তাহাদের শাস্ত্রভ্রষ্ট আচার ব্যবহার হিন্দুচক্ষে নিতান্ত দূষণীয় হইলেও ভারতের সীমা বহির্ভূত প্রদেশস্থ ম্লেচ্ছগণ কর্তৃক প্রতিপোষিত হইয়াছিল। এমন কি, পিশাচদিগের কোন কোন ব্যবহার, তাহাদিগের নিকট বিশেষ সমাদরে পরিগৃহীত হয়। এই সকল কারণ বশতঃ তাহাদের সহিত পিশাচদিগের যথেষ্ঠ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ঈদৃশ স্থলে একের ভাষা অপরের সহিত বিশিষ্টরূপে বিমিশ্রিত হওয়া নিতান্তই সম্ভবপর।

এতাবতা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে যে, দেবভাষা সংস্কৃতই ভারতবর্ষের যাবতীয় মৃত বা জীবিত ভাষার মূল-প্রস্রবণ। ভাষা ও ধর্ম্মের ঐক্য মানবসমাজের একতা সংস্থাপনের সর্ব্বপ্রধান কারণ। অধুনা ভারতবর্ষীয় নানাবিধ ভাষা ও আর্য্য হিন্দুধর্ম্মের বহুবিধ প্রকার ভেদ নিবন্ধন আমরা ভারতবাসিগণের এতাদৃশ মানসিক বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া থাকি। অধিক কি, ভাষাগত অতি সামান্য প্রভেদ বশতঃ পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গবাসিগণের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কথাটি বড় ভাল নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা দারুণ লজ্জা ও ঘৃণার কথা। বঙ্গদেশ মধ্যে ভাষার ও প্র-

ভেদ নাই বলিলেই হয়, একটুক্ ধৈর্য্য ও উদারতা সহকারে বিবেচনা করিলে বোধ হইবে, যখন ভারতের সমস্ত ভাষাই এক সাধারণ মূল হইতে সমুৎপন্ন, তখন ভারতবর্ষীয় কোন জাতিই অপর জাতি হইতে ভাষার বিভিন্নতা হেতু জাত্যান্তররূপে পরিচিত হইতে পারেন না। প্রত্যুত কি আগরওয়ালা (মেড়ুয়াবাদী) কি মহাষ্ট্রীর (বর্গী) কেহই স্বতন্ত্র জাতি নহেন। যদি আমরা তাহা মনে করি, তাহা হইলে আমাদিগের লঘুচিত্ততারই পরিচয় প্রদান করা হয়। আর তাদৃশ সংস্কারের প্রাবল্য হেতুই অন্য অপর সমস্ত জাতির সহিত আমাদিগের এত পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ভবিষ্যতে উহা আরও বিস্তৃত হইয়া আমাদের যাবতীয় আশা ভরসা একেবারে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবে এবং কালে ভারতের এমন বিষম ব্যাধি উপস্থিত হইবে যে, কোন সুচিকিৎসকই তখন উহার প্রকৃত ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া জীবনদানে সমর্থ হইবেন না।

শ্রীদা:—

জীবন প্রভাত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জীবন উষা।

" দেও করতালি, জয় জয় বলি,
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ।
ঐ যে প্রাচীতে, হাসিতে হাসিতে
উদয় অরুণ উষার সহ॥"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ্রীষ্টের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই গজনীর অধিপতি মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, ও সেই শতাব্দী শেষ না হইতেই আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সেই বিপুল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমানেরা কএক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকিলেন, বিন্ধ্যাচল ও নর্মদাস্বরূপ বিশাল প্রাচীর ও পরিখা পার হইবার সহসা কোন উদ্যম করেন নাই। অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীর যুবরাজ আলাউদ্দীন খিলজী অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী সেনা সহিত নর্ম্মদা নদী পার হইলেন ও খন্দেশ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সহসা হিন্দু-রাজধানী দেবগড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবগড়ের রাজা সন্ধির প্রস্তাব করিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজপুত্র বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংগ্রামে হিন্দুসেনা পরাস্ত হইল এবং হিন্দুরাজা বহু অর্থ ও ইলিশপুর প্রদেশ দান করিয়া সন্ধি ক্রয় করিলেন; পরে আলাউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট্ হইলে, তাঁহার সেনা-

পতি মালীক কাফুর তিন বার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন ও নর্ম্মদা তীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করেন। তথাপি আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কেবল দেবগড় ভিন্ন আর সমুদায় প্রদেশ পুনরায় হিন্দুদিগের হস্তগত হইল।

চতুর্দ্দশ খ্রীঃ শতাব্দীতে যখন টোগ্লক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার পুত্র যুনাস পুনরায় দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া সমুদায় তৈলঙ্গ প্রদেশ অধিকার করেন (১৩২১ খ্রীঃ), পরে মহম্মদ টোগ্লক নাম ধারণ করিয়া স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট্ হইয়া রাজধানী দিল্লী হইতে দেবগড়ে আনিবার প্রয়াস পান। দেবগড়ের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া দৌলতাবাদ রাখিলেন এবং সমস্ত দিল্লীবাসিদিগকে তথায় যাইবার আদেশ দিলেন। পীড়া ও নানা স্থানে বিদ্রোহ নিবন্ধন যখন এই প্রয়াস নিষ্ফল হইল, তখনও সম্রাট্ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিলেন না। সুতরাং দক্ষিণের হিন্দু ও মুসলমান সকলে বিরক্ত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। তৈলঙ্গ প্রদেশ জয়ের পর সেই স্থানের কতকগুলি হিন্দুনিবাসী বিজয়নগরে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন (খ্রীঃ ১৩৩৫); এবং জফীর খাঁ নামক একজন মুসলমান তৈলঙ্গের রাজার সহায়তায় দিল্লীর সেনাপতি উম্মাদউলমুলককে তুমুল সংগ্রামে পরাভূত করিয়া দৌলতাবাদে একটি স্বতন্ত্র মুসলমানরাজ্য স্থাপন করিলেন (খ্রীঃ ১৩৪৭)। কালক্রমে বিজয়নগর ও দৌলতাবাদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দুইটি প্রধান রাজ্য হইয়া উঠিল এবং প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাট্গণ দাক্ষিণাত্য হস্তগত করিবার আর কোনও চেষ্টা করেন নাই।

কিন্তু এই বিপদ্ হইতে নিস্তার পাইলেও দক্ষিণে হিন্দু-সাম্রাজ্য বিপৎশূন্য ছিল না। হিন্দুগণ গৃহের মধ্যে দৌলতাবাদস্বরূপ মুসলমান রাজ্যকে স্থান দিয়াছিলেন। সে সময়ে হিন্দুদিগের জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও অবনতিশীল, বিজয়ী মুসলমানদিগের জাতীয়জীবন উন্নতিশীল ও প্রবল, সুতরাং একে অন্যের ধ্বংস সাধন করিল। কথিত আছে দৌলতাবাদের প্রথম রাজা জফীর খাঁ পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলেন, ব্রাহ্মণ বালকের বুদ্ধিবল দেখিয়া তাহাকে স্বাধীন করিয়া দেন। পরে যখন জফীর খাঁ রাজা হইলেন, তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণকে আপন কোষাধ্যক্ষ করেন ও সেই কারণে জফীরের বংশ বাহ্মিনী (ব্রাহ্মণীয়) বংশ বলিয়া খ্যাত। কালক্রমে দৌলতাবাদ রাজ্য বর্দ্ধিতায়তন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইল, এবং একটির স্থানে বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদনগর নামক তিনটি মুসলমান-রাজ্য হইয়া উঠিল। ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে বাহ্মিনী বংশ ও দৌলতাবাদ

রাজ্য লোপপ্রাপ্ত হইল, এবং মুসলমান রাজগণ একত্র হইয়া ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে টেলিকোটা বা রক্ষিত গণ্ডীর যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্য পরাস্ত করিয়া সেই হিন্দু-রাজ্যের লোপ সাধন করিলেন। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-স্বাধীনতা এক প্রকার বিলুপ্ত হইল ও বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদনগর নামক তিনটি মুসলমান-রাজ্য প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের হিন্দুরাজগণও ক্রমে বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট্ আকবর পুনরায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য দিল্লীর অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন, ও তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমস্ত খন্দেশ ও আহম্মদনগর রাজ্যের অধিকাংশ দিল্লী সৈন্যের হস্তগত হয়। তাঁহার পৌত্র শাহজিহান ১৬৩৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে সমগ্র আহম্মদনগর রাজ্য অধিকৃত করেন, সুতরাং আখ্যায়িকা বিবৃতকালে দাক্ষিণাত্যে কেবল বিজয়পুর ও গলখন্দ এই দুইটি পরাক্রান্ত স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ছিল।

এই সমস্ত রাজবিপ্লবের মধ্যে দেশীয় লোকদিগের অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমাদিগের জানা আবশ্যক। মুসলমান রাজ্যের অধীনে অর্থাৎ প্রথমে দৌলতাবাদের, পরে আহম্মদনগর, বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনে হিন্দুদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। বস্তুতঃ মুসলমানদিগের দেশশাসন-কার্য্য অনেকটা মহারাষ্ট্রীয় বুদ্ধিবলেই পরিচালিত হইত। প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি সরকারে, ও প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল, এবং সেই সমস্ত সরকার ও পরগণায় কখন কখন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু অধিক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় কার্য্যকারিগণই কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। মহারাষ্ট্র-দেশ পর্ব্বত-সঙ্কুল, ও সেই সমস্ত পর্ব্বতচূড়ায় অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মিত ছিল। মুসলমান সুলতানগণ সেই সকল পর্ব্বত-দুর্গও মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত রাখিতে সঙ্কুচিত হইতেন না, কিল্লাদারগণ কখন কখন রাজকোষ হইতে বেতন পাইতেন, কখন বা চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমির জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাহারই আয় হইতে দুর্গরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় করিতেন। এই সমস্ত কিল্লাদার ও দেশমুখ ভিন্ন মুসলমান সুলতানদিগের অধীনে অনেক হিন্দু মনসবদার ছিলেন। তাঁহারা শত কি দ্বিশত কি পঞ্চশত কি সহস্র কি তদধিক অশ্বারোহীর সেনাপতি, সুলতানের আদেশমতে সেই সেই পরিমাণ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ সময়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন, এবং সৈন্যের বেতন ও আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য এক একটি জায়গীর ভোগ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সেনা শীঘ্রগতিতে ও ত্বরিত যুদ্ধে অদ্বিতীয়, এবং নিজ নিজ সুলতানদিগকে যুদ্ধসময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন; সময়ে সময়ে তাঁহারা আপনামধ্যেও

ঘোরতর বিবাদে লিপ্ত হইতেন। বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে চন্দ্ররাও মোরে দ্বাদশ সহস্র পদাতিকের সেনাপতি ছিলেন এবং সুলতানের আদেশেনীরা ও বার্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। সুলতান পরিতুষ্ট হইয়া সেই দেশ চন্দ্ররাওকে অল্পমাত্র কর ধার্য্য করিয়া জায়গীরস্বরূপ দান করেন ও চন্দ্ররাওয়ের সন্ততিগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজা খেতাবে সেই প্রদেশ স্বচ্ছন্দে সুশাসন করেন। এইরূপ রাওনায়েক নিম্বালকর বংশ পুরুষানুক্রমে ফুল্তন দেশের দেশমুখ হইয়া সেই দেশ শাসন করেন। এইরূপে ঘাটিগী বংশ মল্লওরী প্রদেশে, মনস বংশ মুখ্বর প্রদেশে, যবপুরীয় বংশ কাপসী ও মুধোল দেশে, ডুফে বংশ ঝট্‌প্রদেশে ও শবন্ত বংশ ওযাবিপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়া পুরুষানুক্রমে বিজয়পুরের সুলতানের কার্য্য সাধন করিতে থাকেন, ও সময়ে সময়ে বা আপনাদিগের মধ্যেই তুমুল সংগ্রাম করিতেন। জ্ঞাতি বিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই. পর্ব্বত-সঙ্কুল বঙ্কণ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালেই স্থানীয় বড় বড় বংশে আত্মবিরোধ দৃষ্ট হইত, ও পর্ব্বতকন্দরে ও উর্ব্বরা উপত্যকায়, সর্ব্বদাই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইত। বহু শোণিতপাত হইলেও সেগুলি কুলক্ষণ নহে, সেগুলি সুলক্ষণ, পরিচালনা দ্বারা আমাদের শরীর যেরূপ সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, সর্ব্বদা কার্য্য ও উপদ্রব ও বিপর্য্যয় দ্বারা জাতীয় বল ও জাতীয় জীবন সেইরূপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয় জীবন-উষার প্রথম রক্তিমচ্ছটা শিবজীর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বেই ভারত-আকাশ রঞ্জিত করিয়াছিল।

আহম্মদনগরের সুল্‌তানের অধীনে যাদবরাও ও ভন্‌শ্লে নামক দুইটি পরাক্রান্ত বংশ ছিল। সিন্ধুক্ষীরের যাদবরাওয়ের ন্যায় পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রবংশ সমস্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশে আর কোথাও ছিল না, এবং অনেকে বিবেচনা করেন দেবগড়ের প্রাচীন হিন্দুরাজ বংশ হইতেই এই পরাক্রান্ত বংশ উদ্ভূত। ষোড়শ খ্রীঃ শতাব্দীতে লক্ষজী যাদবরাও আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনস্থ একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন; তিনি দশ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি ছিলেন ও প্রশস্ত জায়গীর ভোগ করিতেন। ভন্‌শ্লেবংশ যাদবরাওয়ের ন্যায় উন্নত না হইলেও একটি প্রধান ক্ষমতাশালী বংশ ছিল তাহার সন্দেহ নাই। এই স্থানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, যাদবরাওয়ের বংশ হইতে শিবজীর মাতা ও ভন্‌শ্লে বংশ হইতে তাঁহার পিতা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

উপন্যাসের প্রারম্ভে দেশের ইতিহাস ও লোকের অবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। বোধ হয় পাঠক ইহাতে বিরক্ত হইবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথজী হাবিলদার।

কাঞ্চন জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ।
শ্রবণ তাহার দিব্য পঙ্কজ নয়ন॥
শ্রবণে কুণ্ডলযুগ্ম দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচে আবরিল কলেবর॥
দুইদিকে দুই তূণ বামে ধরে ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু॥

কাশীরাম দাস।

কঙ্কণপ্রদেশে বর্ষাকালে প্রকৃতি অপরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে; ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে বসন্তকালেই এক দিন সায়ংসময়ে সেই ঘোর ঘটা ও ভীষণ সৌন্দর্য্য যেন দশ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সূর্য্য তখনও অস্ত যায় নাই অথচ সমস্ত আকাশ দীর্ঘবিলম্বী অতি-কৃষ্ণ মেঘরাশিতে আচ্ছন্ন ও চারিদিকে পর্ব্বতশ্রেণী ও অনন্ত অরণ্য দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্ব্বতে, উপত্যকায়, অরণ্যমধ্যে, প্রান্তরে, আকাশ বা মেদিনীতে শব্দমাত্র নাই, যেন জগৎ অচিরে প্রচণ্ড বাত্যা আসিবে জানিয়া ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। নিকটস্থ পর্ব্বতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথগুলি ঈষৎ দেখা যাইতেছে, দূরস্থ বিশাল পাদপাবৃত পর্ব্বতগুলি কেবল গাঢ়তর কৃষ্ণবর্ণ স্বরূপ দেখা যাইতেছে, আর বহু নীচে উপত্যকা একেবারে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্ব্বত-প্রবাহী জলপ্রপাতগুলি কোথাও রৌপ্যগুচ্ছের ন্যায় দেখা যাইতেছে, কোথাও অন্ধকারে লীন হইয়া কেবল শব্দমাত্রে আপন পরিচয় দিতেছে।

সেই পর্ব্বতপথের উপর দিয়া একমাত্র অশ্বারোহী বেগে অশ্বচালন করিয়া যাইতেছিলেন। অশ্বের সমস্ত শরীর ফেণপূর্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত, ও অশ্বারোহীর বেশ ধূলা ও কর্দ্দমময়, দেখিলেই বোধহয় তিনি অনেক দূর হইতে আসিতেছেন। তাঁহার হস্তে বর্শা, কোষে অসি, বামহস্তে বল্গা ও বাম বাহুতে ঢাল, শরীর উজ্জ্বল লৌহবর্ম্মাচ্ছাদিত। পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ মহারাষ্ট্রদেশীয়। অশ্বারোহীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ হইবে, সচরাচর মহারাষ্ট্রীয়দিগের অপেক্ষা তাঁহার অবয়ব উন্নত ও বর্ণ গৌর, কিন্তু পরিশ্রমে বা রৌদ্রোত্তাপে এই বয়সেই তাঁহার মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলবর্ণ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ হইয়াছে ও শরীর সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। যুবকের ললাট উন্নত, চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিঃপরিপূর্ণ, মুখমণ্ডল ঔদার্য্যব্যঞ্জক ও অতিশয় তেজঃপূর্ণ। যুবক অশ্বকে অল্প বিশ্রাম দিবার জন্য লম্ফদিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, বল্গা বৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করিলেন, বর্শা বৃক্ষশাখায় হেলাইয়া রাখিলেন, ও হস্তদ্বারা ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করিয়া ও নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ উন্নত প্রশস্ত ললাট হইতে পশ্চাৎদিকে সরাইয়া ক্ষণেক আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আকাশের আকৃতি অতি ভয়ানক, অচিরাৎ তুমুল বাত্যা আসিবে তাহার সংশয় নাই। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অনন্ত পর্ব্বত ও পাদপশ্রেণী হইতে গভীর শব্দ উত্থিত হইতেছে, আর দুই একটি স্তিমিত মেঘগর্জ্জন শুনা যাইতেছে। যুবকের শুষ্ক ওষ্ঠে দুই এক বিন্দু বৃষ্টিজলও পতিত হইল। এ যাইবার সময় নহে, আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও অপেক্ষা করা উচিত। যুবকের চিন্তা করিবার সময় ছিল না; তিনি যে কার্য্যে আসিয়াছিলেন তাহাতে বিলম্ব সহে না, তিনি যে প্রভুর কার্য্য করিতেছেন তিনি কোন আপত্তি শুনেন না, যুবকেরও বিলম্ব বা আপত্তি করার অভ্যাস নাই। পুনরায় বর্শা হস্তে লইয়া লম্ফদিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন। তাঁহার অসি অশ্বপৃষ্ঠে ঝন্ ঝন করিয়া উঠিল; আর এক মুহূর্ত্ত আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, পরে পুনবায় তীব্রবেগে অশ্বচালন করিয়া সেই নিঃশব্দ পর্ব্বত-প্রদেশের সুপ্ত প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়া চলিলেন।

অল্পক্ষণমধ্যেই ভয়ানক বাত্যা আরম্ভ হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুল্লতা চমকিত হইল, ও মেঘের গর্জ্জনে সেই অনন্ত পর্ব্বত-প্রদেশ যেন শত বার শব্দিত হইল। অচিরাৎ কোটীরাক্ষস-বল বিদ্রূপ করিয়া ভীষণ গর্জ্জনে পবন প্রবাহিত হইল, ও যেন সেই অনন্ত পর্ব্বতকেও সমূলে আলোড়িত করিতে লাগিল। এক কালে শত পর্ব্বতের অসংখ্য পাদপশ্রেণী হইতে কর্ণভেদী শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, জলপ্রপাত ও পর্ব্বত-তরঙ্গিণীর জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ঘন ঘন বিদ্যুতালোকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই ঘোর বিপ্লব দৃষ্ট হইতে লাগিল; এবং মধ্যে মধ্যে দূরপ্রতিঘাতী বজ্র শব্দে জগৎ কম্পিত ও স্তব্ধ হইতে লাগিল। ত্বরায় মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িয়া পর্ব্বত অরণ্য ও উপত্যকা প্লাবিত করিল এবং জলপ্রপাত ও তরঙ্গিণী সমুদয়কে স্ফীতকায় ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল।

অশ্বারোহী কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ না হইয়া বেগে চলিতে লাগিলেন; সময়ে সময়ে বোধ হইল যেন অশ্ব ও অশ্বারোহী বায়ুবেগে পর্ব্বত হইতে সজোরে নীচে নিক্ষিপ্ত হইবেন; সময়ে সময়ে অন্ধকারে লম্ফ দিয়া জলস্রোত পার হইবার সময়ে উভয়েই সেই কঠিন প্রস্তরের উপর পতিত হইলেন, এবং এক স্থানে বায়ুপীড়িত বৃক্ষশাখার সজোর আঘাতে অশ্বারোহীর উষ্ণীষ ছিন্ন ভিন্ন হইল ও তাঁহার ললাট হইতে দুই এক বিন্দু রুধির পড়িতে লাগিল। তথাপি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে অপেক্ষা করা দুঃসাধ্য, সুতরাং যুবক মুহূর্ত্ত মাত্রও চিন্তা না করিয়া যত দূর সাধ্য সতর্কভাবে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিন চারি দণ্ড মুষলধারায় বৃষ্টি হওয়াতে আকাশ পরিষ্কার

হইতে লাগিল, ও অচিরাৎ বৃষ্টি থামিয়া গেল, এবং অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের আলোকে সেই পর্ব্বতরাশি ও নবস্নাত বৃক্ষ সমূহের চমৎকার শোভা দৃষ্ট হইল। যুবক দুর্গে উপস্থিত হইয়া একবার অশ্ব থামাইলেন ও সিক্ত কেশগুচ্ছ পুনরায় সুন্দর প্রশস্ত ললাট হইতে অপসৃত করিয়া নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে শোভা অনির্ব্বচনীয়! পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী, যত দূর দেখা যায় দুই তিন সহস্র হস্ত উন্নত শিখরগুলি ক্রমান্বয়ে দেখা যাইতেছে ও সেই পর্ব্বতশ্রেণীর পার্শ্বে, মস্তকে, চারিদিকে, নবস্নাত নিবিড় হরিদ্বর্ণ অনন্ত পাদপশ্রেণী সূর্য্যালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাত শত গুণ স্ফীতকায় হইয়া বর্দ্ধিত গৌরবে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নৃত্য করিতেছে,ও সূর্য্যের সুবর্ণ রশ্মিতে বড় সুন্দর ক্রীড়া করিতেছে। প্রতি পর্ব্বত ও শিখরের উপর সূর্য্যরশ্মি নানারূপ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, স্থানে স্থানে জলপ্রপাতের উপর রামধনু খেলা করিতেছে; আকাশে প্রকাণ্ড ধনু নানাবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে ও বহুদূরে বায়ুদ্বারা মেঘ তাড়িত হইয়া বৃষ্টিরূপে গলিত হইতেছে তাহাও দেখা যাইতেছে।

যুবক ক্ষণমাত্র এই শোভায় মুগ্ধ রহিলেন; পরে সূর্য্যের দিকে অবলোকন করিয়া শীঘ্র দুর্গের উপর উঠিতে লাগিলেন। অচিরে আপন পরিচয় দিয়া দুর্গপ্রবেশ করিলেন; দ্বারের ভিতর যাইলেন ও পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন সূর্য্য অস্ত হইতেছে। অমনি ঝন্ঝনা শব্দে দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইল।

দ্বাররক্ষকগণ দ্বার বন্ধ করিয়া যুবকের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

"অধিক সকালে পঁহুছেন নাই: আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে অদ্য রাত্রি প্রাচীরের বাহিরে অতিবাহিত করিতে হইত।"

যুবক সহাস্যে উত্তর করিলেন "সেই এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই; ভবানীর প্রসাদে প্রভুর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা রাখিব, অদ্যই কিল্লাদারের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইতে পারিব।"

দ্বাররক্ষক। "কিল্লাদারও আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

"তবে চলিলাম" বলিয়া যুবক রাজগৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন।

অনুমতি পাইয়া যুবক কিল্লাদারের প্রাসাদে যাইলেন এবং সম্যক্ অভিবাদন করিয়া ও নিজ কটিদেশ হইতে বন্ধন খুলিয়া, কতকগুলি লিপি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। কিল্লাদার মাউলীজাতীয় একজন শিবজীর বিশ্বস্ত যোদ্ধা; তিনি লিপিগুলি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দূতের দিকে না চাহিয়াই মনোনিবেশ পূর্ব্বক সেইগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন।

দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধারম্ভ। যুদ্ধের আধুনিক অবস্থা, কিরূপে কিল্লাদার শিবজীর বিশেষরূপে সহায়তা করিতে

পারেন ও কোন্ বিষয়ে শিবজীর কি কি আদেশ, লিপি পাঠে সমস্ত অবগত হইলেন। অনেকক্ষণ সেই লিপি পাঠ করিয়া কিল্লাদার অবশেষে পত্রবাহকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকের বালকোচিত সরল ও উদার মুখমণ্ডল, ও আনেত্রবিলম্বী গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ কেশ, অথচ সুদৃঢ় উন্নত অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট দেখিয়া কিল্লাদার একটু চকিত হইলেন, লিপিটী ফিরে দেখিলেন আবার বালক বা যুবার দিকে মর্ম্মভেদি তীক্ষ্ণ নয়নদ্বয় উঠাইলেন। অবশেষে বলিলেন " হাবিলদার। তোমার নাম রঘুনাথজী ? তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ ? "

রঘুনাথজী বিনীতভাবে শির নমাইয়া প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

কিল্লাদার। " তুমি আকৃতি ও বয়সে বালকমাত্র। " (ঈষৎ ক্রোধে রঘুনাথজীর নয়ন ঈষৎ উজ্জ্বল হইল, দেখিয়া কিল্লাদার ধীরে ধীরে বলিলেন) " কিন্তু বিবেচনা করি কার্য্যকালে পরাঙ্মুখ নহ। "

রঘুনাথজী ঈষৎ ক্রোধকম্পিতস্বরে অথচ নম্রভাবে বলিলেন " যত্ন ও চেষ্টা মাত্র মনুষ্যসাধ্য, বোধ হয় তাহাতে প্রভু আমার ত্রুটি দেখেন নাই, সিদ্ধি ভবানীর ইচ্ছাধীন। "

কিল্লাদার। " তুমি সিংহগড় হইতে তোরণ দুর্গে এত শীঘ্র আসিলে কিরূপে? "

স্থিরস্বরে যুবক উত্তর করিলেন " প্রভুর নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। "

কিল্লাদার এই উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন " জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, তোমার আকৃতিতেই কার্য্যসাধনে তোমার যেরূপ যত্ন তাহার পরিচয় দিতেছে। " রঘুনাথজীর সমস্ত বস্ত্র ও শরীর এখনও সিক্ত ও ললাটের ঈষৎ ক্ষত দেখা যাইতেছিল।

পরে কিল্লাদার সিংহগড়ের ও পুনার সমস্ত অবস্থা এবং মহারাষ্ট্রীয়, মোগল ও রাজপুতসেনার অবস্থা ও সংখ্যা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথজী যতদূর পারিলেন উত্তর দিলেন।

কিল্লাদার বলিলেন " তবে কল্য প্রাতে আমার নিকট আসিও, আমার পত্রাদি প্রস্তুত থাকিবে, আর শিবজীকে আমার নাম করিয়া জানাইও যে তিনি যে তরুণ হাবিলদারকে এই বিষম কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে হাবিলদার কার্য্যের অনুপযুক্ত নহে। " এই প্রশংসা বাক্যে রঘুনাথ মস্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

রঘুনাথজী বিদায় পাইয়া চলিয়া গেলেন। রঘুনাথকে এরূপ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য এই যে, কিল্লাদার শিবজীকে অতিশয় গূঢ় রাজকীয় সংবাদ ও কতকগুলি গূঢ় মন্ত্রণা পাঠাইবার মানস করিতেছিলেন। সে গুলি সমস্ত লিপিদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, লিপি শত্রুহস্তে পড়িতে পারে। রঘুনাথজীকে সে গুলি বাচনিক বলা যাইতে পারে কি না, অর্থবলে বা

কোন উপায়ে শত্রুর বশবর্ত্তী হইয়া গূঢ় মন্ত্রণা শত্রুর নিকট প্রকাশ করা রঘুনাথের পক্ষে সম্ভব কি,না, কিল্লাদার তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন, পরীক্ষা শেষ হইল। রঘুনাথ নয়নপথের বহির্ভূত হইলে পর কিল্লাদার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "শিবজী এ বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত, উপযুক্ত কার্য্যে যথার্থই উপযুক্ত লোক পাঠাইয়াছেন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সরযুবালা।

"—সজনি! ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে, তড়িতলতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥
আধ আঁচল খসি, আধ বদনে হাসি,
আধই নয়ন তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আচর ভরি,
তব ধরি দগধে অনঙ্গ ॥
একে তনু গোরা, কনয় কটোরা,
অতনু কাঁচল উপাম।
হরি হরি কহ মন, জনু বুঝি ঐছন,
ফাস পসারল কাম ॥
দশন মুকুতা পাঁতি, অধর মিলায়ত,
মৃদু মৃদু কহ তাহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অতবে সে দুঃখ রহ,
হেরি হেরি না পূরাল আশা ॥

বিদ্যাপতি।

রঘুনাথ কিল্লাদারের নিকট বিদায় পাইয়া ভবানীবেদীর মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এই দুর্গজয়ের অল্পদিন পরই শিবজী ভবানীর একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ও অম্বর দেশীয় অতি উচ্চ কুলোদ্ভব এক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া দেবসেবায় নিযোজিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে এই দেবীর পূজা না দিয়া কোনও কার্য্যে লিপ্ত হইতেন না। দেবীকে পূজা দেওয়া ও পুরোহিতের নিকট যুদ্ধের ফলাফল জানাই রঘুনাথকে পাঠাইবার অন্যতম উদ্দেশ্য।

রঘুনাথ যৌবনোচিত উল্লাসের সহিত আপন কৃষ্ণকেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে একটি যুদ্ধগীত মৃদুস্বরে গাইতে গাইতে মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিলেন, মন্দিরের নিকটে আসিলে, মন্দিরপার্শ্বস্থ ছাদে সহসা তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দণ্ডায়মান হইলেন, সহসা তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল! দেখিলেন সেই ছাদে একজন অনুপম লাবণ্যময়ী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা একাকী আসীনা রহিয়াছেন, হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া অস্তাচলের রক্তিমা শোভা অনিমেষে দৃষ্টি করিতেছেন। কন্যার রেশম বিনিন্দি সুমার্জ্জিত অতিকৃষ্ণ কেশপাশ গণ্ডস্থলে, হস্তোপরি, ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে এবং উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও ভ্রমরনিন্দি চক্ষুর্দ্বয় কিঞ্চিৎ আবৃত করিয়াছে। ভ্রূযুগল যেন তুলিদ্বারা লিখিত, কি সুন্দর বক্রভাবে ললাটের

শোভা সাধন করিতেছে। ওষ্ঠদ্বয় সূক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ, উন্মত্তপ্রায় হইয়া রঘুনাথ সেই ওষ্ঠদ্বয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। হস্ত ও বাহু সুগোল ও অতিশয় গৌরবর্ণ, ও সুবর্ণের বলয় ও কঙ্কণদ্বারা সুশোভিত। কন্যার ললাটে আকাশের রক্তিমচ্ছটা পতিত হইয়া সেই তপ্তকাঞ্চন বর্ণকে সমধিক উজ্জ্বলতর করিতেছে। কণ্ঠ ও ঈষদুন্নত বক্ষস্থলের উপর একটি কণ্ঠমালা দোদুল্যমান রহিয়াছে। রঘুনাথ! রঘুনাথ! সাবধান! তুমি রাজকার্য্যে আসিয়াছ, তুমি দরিদ্র, একজন সৈন্যমাত্র ও দিকে চাহিও না, ওপথে যাইও না। রঘুনাথ এ সকল বিবেচনা করিতেছিলেন না, তিনি মুগ্ধের ন্যায় অনিমেষ লোচনে সেই সায়ংকালের আকাশপটে অঙ্কিত অনুপম ছবির দিকে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতেছিল, পূর্ব্বে যে ভাব কখনও জানেন নাই, অদ্য সহসা সেই নব ভাবের উদ্রেকে হৃদয় মুহুর্মুহু সবলে আহত হইতেছিল, সময়ে সময়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইতেছিল। যৌবনপ্রারম্ভের প্রথম প্রেমের উর্দ্দম বেগে তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায়।

যতক্ষণ দেখা গেল, রঘুনাথ প্রস্তরবৎ অচল হইয়া সেই সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সায়ন্তন আকাশের শোভা ক্রমে লীন হইয়া গেল, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া সেই প্রতিমূর্ত্তির উপর পড়িতে লাগিল, রঘুনাথ তখনও দণ্ডায়মান।

সন্ধ্যার সময় কন্যা গৃহে যাইবার জন্য উঠিলেন,—দেখিলেন অনতিদূরে একজন দীর্ঘকায় অতি সুগঠন যুবক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার দিকে অনিমেষ লোচনে দেখিতেছেন। ঈষৎ লজ্জায় কন্যার মুখ রঞ্জিত হইল, তিনি মুখ অবনত করিলেন। আবার চাহিয়া দেখিলেন, যুবক সেইরূপ বক্ষের উপর বামহস্ত স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ, কৃষ্ণকেশ যুবকের উন্নত ললাট ও জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নদ্বয় আবৃত করিয়াছে, কোষে খড়্গ, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ-বর্শা, ও অনিমেষ লোচনে তখনও তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মুহূর্ত্তের জন্য রমণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ মস্তকে অবগুণ্ঠন দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন রঘুনাথ যেন চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন, ললাট হইতে দুই এক বিন্দু স্বেদ মোচন করিলেন, মন্দিরের পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ও পুরোহিতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে আমরা পুরোহিতের পরিচয় দিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরোহিত অম্বরদেশীয় উচ্চ কুলোদ্ভব রাজপুত ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম জনার্দ্দন দেব। তিনি অম্ব-

রের রাজা প্রসিদ্ধ জয়সিংহের একজন সভাসদ্ ছিলেন, ও শিবজীর বহু অনুরোধে, জয়সিংহের অনুমত্যানুসারে শিবজীর সর্ব্বপ্রথম বিজিত তোরণদুর্গে আগমন করেন। তাঁহার পুত্র কন্যা কেহই ছিল না, সুতরাং সস্ত্রীক এই দুর্গে আসিয়া বহু যত্নে ভবানীর উপাসনা করিতেন ও একটি অপত্য মানসে অনেক যাগযজ্ঞও করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে এই দুর্গে আসিবার দুই তিন বৎসর পরই তাঁহার স্ত্রী একটি কন্যা প্রসব করেন, কিন্তু কন্যা প্রসব করিবাই তিনি কালগ্রাসে পতিতহন।

জনার্দ্দন কন্যার নাম সরযুবালা রাখিলেন ও একমাত্র অপত্যকে অতি যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে সরযুবালা নিরুপম রূপবতী হইলেন, ও যৌবন-প্রারম্ভে তাঁহার অপূর্ব্ব লাবণ্য ও নব নব সৌন্দর্য্যবিকাশ দেখিয়া দুর্গের সকলেই বিস্মিত হইলেন। সকলেই বলিতেন যে, ভবানী উপাসকের পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহার কন্যাকে এইরূপ দেবতুল্য সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যে বিভূষিত করিয়াছেন। জনার্দ্দনও কন্যার সৌন্দর্য্য ও স্নেহে পরিতুষ্ট হইয়া রাজস্থান হইতে নির্ব্বাসনের দুঃখও বিস্মৃত হইলেন।

দেবালয়ে রঘুনাথ কতকক্ষণ অপেক্ষা করিলে পর জনার্দ্দন দেব মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ হইয়াছে, অবয়ব দীর্ঘ ও এক্ষণও বলিষ্ঠ, চক্ষুর্দ্বয় শান্তিরস-পূর্ণ এবং শ্বেতশ্মশ্রু বিশাল বক্ষঃস্থল আবরণ করিয়াছে। জনার্দ্দনের বর্ণ গৌর, স্কন্ধ হইতে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। পূজকের পবিত্র শান্তিপূর্ণ মন, ও বালকের ন্যায় সরল হৃদয় জনার্দ্দনের মুখ দেখিলেই বোধগম্য হইত। জনার্দ্দন ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রঘুনাথ সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সংক্ষেপে মিষ্টালাপ করিয়া উভয়ে আসন গ্রহণ করিলেন ও জনার্দ্দন শিবজীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথ যতদূর পারিলেন যুদ্ধের বিবরণ বলিলেন, ও শিবজীর প্রণাম জানাইয়া পূজকের হস্তে কএকটি সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন—

"প্রভুর প্রার্থনা যে তিনি এক্ষণে মোগলদিগের সহিত যে তুমুল রণে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে আপনি তাহার জয়ের জন্য ভবানীর নিকট পূজা করিবেন। দেবীর প্রসাদ ভিন্ন মনুষ্য-চেষ্টা বৃথা।"

জনার্দ্দন তাঁহার নৈসর্গিক স্থির গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন "সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য মাদৃশ লোকের চিরকালই যত্ন করা বিধেয়, সেই ধর্ম্মের প্রহরীস্বরূপ শিবজীর বিজয়ের জন্য অবশ্যই পূজা দিব। মহাত্মাকে জানাইও সে বিষয়ে ত্রুটি করিব না।"

রঘুনাথ। "প্রভুর দেবীপদে আর একটি আবেদন আছে। তিনি ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার ফলাফল কথঞ্চিৎ পূর্ব্বে জানিবার আকাঙ্ক্ষা করেন।

ভবাদৃশ দূরদর্শী দৈবজ্ঞ এ বিষয়ে অবশ্যই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারেন।”

জনার্দ্দন ক্ষণেক চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন, পরে পুনরায় আপনার অকম্পিত গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

“রজনীযোগে দেবী-পদে শিবজীর বাসনা জানাইব, কল্য প্রাতে উত্তর জানিতে পারিবে।”

রঘুনাথ ধন্যবাদ করিয়া বিদায় হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে জনার্দ্দন বলিলেন।

“তোমাকে পূর্ব্বে এই দুর্গে দেখি নাই, অদ্য কি প্রথমে এ স্থলে আসিয়াছ?”

রঘু। “অদ্যই আসিয়াছি।”

জনা। “দুর্গে কাহারও সহিত পরিচয় আছে? থাকিবার স্থল আছে?”

রঘু। “পরিচয় নাই, কিন্তু কোন এক স্থানে রজনী অতিবাহিত করিব, কল্য প্রাতেই চলিয়া যাইব।”

জনা। “কি জন্য অনর্থক ক্লেশ সহ্য করিবে?”

রঘু। “প্রভুর অনুগ্রহে কোন ক্লেশ হইবে না, আমাদের সর্ব্বদাই এরূপে রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়।”

যুবকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও সরল উদার স্বভাব দর্শনে জনার্দ্দনের অন্তঃকরণে বাৎসল্যের উদ্রেক হইল, বলিলেন—

“বৎস! যুদ্ধসময়ে ক্লেশ অনিবার্য্য, কিন্তু অদ্য ক্লেশ সহনের কোন আবশ্যকতা নাই। আমার এই দেবালয়ে অবস্থিতি কর, সরযু তোমার খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিবে। পরে রাত্রে বিশ্রাম করিয়া কল্য দেবীর আজ্ঞা শিবজীর নিকট লইয়া যাইবে।”

রঘুনাথজীর বক্ষঃস্থল সহসা স্ফীত হইল, তাঁহার হৃদয়ে যেন কে সজোরে আঘাত করিল। এটি যাতনা না আনন্দের উদ্বেগ? সরযু! সরযু! সে কি সেই সায়ংকালীন আকাশপটে অঙ্কিত মনোহর চিত্র? রজনীর আগমনে আকাশপট হইতে সে চিত্র লীন হইয়াছে, কিন্তু রঘুনাথের হৃদয়-পট হইতে সে আনন্দময়ী মূর্ত্তি কখন—কখন—কখনই লীন হইবে না।

কাল।

১

“নদী আর কাল-গতি একই সমান,”
একই রূপেতে দোঁহে করয়ে পয়াণ।
তটিনীর গতি প্রায়, অমূল্য সময় হায়
ঢালিছে অদৃশ্য ভাবে অনন্তে শরীর;
চলিতেছে চল চল,কে তারে ফিরাবে বল?--
ফিরিবেনা--ফিরাবারে পারে কোন্ বীর?
যেন তটিনীর গতি!--এত অজ্ঞানতা অতি!--
জলেতে ভাসিয়া গেলে অতুল রতন;
যতন করিলে পরে পুনঃ তারে পাই করে--
আবর্ত্তে ঘুরিয়া উঠে আপনি কখন।
কালের তরঙ্গে হায়, যদি কভু ভেসে যায়,

পুনঃ কি কখন তার পাই করতলে ?
প্রফুল্ল কমল দলে　ভাসায়ে দিলাম জলে
ঘূরিতে ঘূরিতে পদ্ম হাসি হাসি চলে,--
তখনি নামিয়া নীরে　সাঁতারিয়া নলিনীরে
ফিরায়ে আনিতে পারি প্রয়াস করিলে;--
ফিরে কি ভাসিয়া গেলে কালের সলিলে ?

২

কত বস্তু অগণন—অমূল্য উজ্জ্বল
কাল-স্রোতে গেছে ভেসে অর্ণবে অতল--
অবনীর অলঙ্কার ! ফিরিবে না তারা আর।
এ নহে তটিনী-গতি !--বারেক তা হলে
জীবন করিয়া পণ　করিতাম দরশন
সাহসে বাঁধিয়া বুক নামি সেই জলে,
ফিরাইতে গতি তার প্রতিজ্ঞার বলে।

৩

এক দিনে কত হয় এক দিনে কত লয়--
সপ্ত দিনে এই তিন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন
পলকে প্রলয়-জলে কভু বিশ্ব যায় তলে
পলকে প্রকাশে লক্ষ জগৎ নূতন।
তুচ্ছ নহে একপল　ক্ষুদ্র এক বিন্দু জল
দণ্ড দিন যুগ মাস মিশি পলে পল,
বারি বিন্দু বিন্দু সনে　মিশি হায় একক্ষণে
জনমে ভীষণ সিন্ধু অতন্ত অতল।
ক্ষুদ্র দেখি তুচ্ছ ভাব যে হৃদয়ে জ্ঞানাভাব
অনন্ত জগৎ এই অণুকণাময় !
নব শিশু ক্ষুদ্রাকার, কালে ভীষ্ম অবতার,
পদ দম্ভে কাঁপে ব্যোম গিরি সমুদয়।
বিচিত্র কালের গতি জ্ঞানিগণ কয়।

৪

উন্নতি কি অবনতি,—সাধনের ফল ;
সভ্যতা ভব্যতা কিবা কালেতে সকল।
কালে শিশু ভীমকায় কালে ভীম শিশু প্রায়
কালেতে মশক ঐরাবত-অবতার,
কালে হয় কালে লয় কালেতে জলের রয়
ঊর্দ্ধগামী !—অবিশ্বাস ? বিচিত্রব্যাপার !
সুরম্য নগরী হায় কালেতে শ্মশান প্রায়
ফেরুপাল হা বিধাতঃ ! ফুকরে গভীর !
ভীষণ অটবীচয়　কালে রাজধানী হয়
রাজধানী অরণ্যানী ! দরিদ্র ফকির
পৃথিবীর অধিপতি !--প্রবল প্রতাপ অতি,--
ভ্রূকুটি ভঙ্গিতে কাঁপে মেদিনী গগণ !
কালে ইন্দ্র বনবাসী ইন্দ্রাণী দনুজদাসী !--
অন্নাভাবে অন্নপূর্ণা কাতর জীবন !
কালে ভীম মরুস্থল পুষ্পোদ্যান ! ঝল মল
করে কিবা প্রতিপল সাজি চারু সাজে !
সরস সরসী তায়, শতদলে শোভা পায়,
মাধবী বকুল চাঁপা হেমলতা রাজে।
চারিদিকে ফুটে ফুল বিশ্ববাসী প্রেমাকুল
মেদুর মলয় বয় ছুটে পরিমল,
কোকিল পঞ্চম গায় অলি মধুলোভে ধায়
আনন্দ-উৎসব-মত্ত ধরিত্রী সকল।
কালেতে প্রমোদ বন মরুস্থল বিভীষণ
ধূধূ করে বালুময় প্রকাণ্ড প্রান্তর !
দীপ্ত প্রভাকর করে　প্রচণ্ড মুরতি ধরে
মায়াবিনী মরীচিকা !—শিহরে অন্তর !
প্রবল প্রতাপে তায়, মত্তানিল ছুটে যায়,
উৎপাটিত সন্তাড়িত করি সমুদায়।
মরি কিবা ভীম ভাব !—উচ্ছ্বাসি২ রাব
পাবক-প্লাবনে করি প্লাবিত ধরায় !
গভীর অর্ণবচয় কালে উচ্চ হিমালয়—

কালে হিমালয় বিশ্বগর্ভে নিমগন!
প্রমত্ত পবন যায় উত্তুঙ্গ তরঙ্গ তায়
ভীম ভাবে ছুটে যায় ছাড়িয়া গর্জ্জন।
কাঁপায়ে মেদিনীব্যোম,শনি শুক্রসূর্য্য সোম,
আছাড়ে আছাড়ে পড়ি নিমগ্ন পাহাড়ে;
আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘূরি ভীমনাদ ছাড়ে!

৫

শতদল-দল-গত যেমন জীবন,
এই বিশ্বে সমুদায় জানিবে তেমন।
সমীরণ সদা বয় কখন সে স্থির নয়
সদাগতি নাম তাই; কুলু কুলু স্বরে,
আপনার মনে হায়! সতত তটিনী ধায়
মিশিছে চলিয়া নিত্য গভীর সাগরে।
অদৃশ্য কালের গতি;--কিন্তু সে চঞ্চল অতি,
জ্ঞানীরে ভুলাতে নারে অজ্ঞানে কুহরে,--
মিশিছে চলিয়া নিত্য কালের প্রান্তরে
উত্তাল তরঙ্গ রাশি, মত্ত ভাবে অট্ট হাসি,
উঠিছে ছুটিছে রঙ্গে পবন-হিল্লোলে,
অতল অনন্তব্যাপী অর্ণবের কোলে;--
সে তরঙ্গ-রঙ্গে হায়! জীব জলবিম্ব প্রায়,
জীবলীলা লীলাচলে মিশাইয়া যায়,
যে জন যথার্থ জ্ঞানী,জ্ঞানে নহে অভিমানী
জীবনের ব্রত সেই সাধে সাধনায়।

(হরিমোহন)

আগ্রা।

এমনও এক সময় হইয়া গিয়াছে, যখন এই আগ্রা ইহার অদূরবর্ত্তিনী যদু-রাজধানী মথুরা পুরীর প্রাঙ্গণস্থ কেলিকানন স্বরূপ শোভমানা ছিল। এমনও সময় আবার অতীত হইয়াছে যখন এস্থান বিশ্বব্যাপক মহাতেজস্বী শাক্যোপাসকদিগের বিহার ভূমি মথুরার দ্বার-বর্ত্মস্থ যাত্রিনিবাস মধ্যে পরিগণিত ছিল। হয়ত কোন দিন ইহাই হুষ্ক্ যুষ্ক ও কনিষ্ক প্রভৃতি ইণ্ডসাইথীয় রাজচক্রবর্ত্তীদিগের প্রতিদিন সেবনীয় মৃগয়াভূমিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আবার এমনও দিন উপস্থিত হইয়াছিল যে, হয় ত সেই দিনে ইহার প্রান্তবর্ত্তী মহাবল পরাক্রান্ত পরমার পরিহার এবং চৌহান বংশীয় রক্তঃপুত জাতীয় রাজপুরুষেরা ইহাকে আপন আপন দিগ্বিজয় পথের বিশ্রামাবাস করিয়া ব্যবহারে আনিয়াছিলেন। আবার সর্ব্বশেষে ইহার ভাগ্যে এমনও এক সময় আসিয়া যুটিয়াছিল, যখন এই আগ্রা সমস্ত ভারতবর্ষের কেন্দ্রভূমি হইয়া মোগলকুল-তিলক সম্রাট্বর আকবরের রাজধানীরূপে পৃথিবীবক্ষে অতুল ঐশ্বর্য্যের আকরভাবে বিরাজ করিতেছিল।

ভারতের ঐতিহাসিক তিমির মধ্যে মুসলমানদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে এ স্থানে কখন কোন্ সময়ে কি ভাবে যে কত [illegible] হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহা বর্ত্তমান স-

মধ্যে কোনরূপেই অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে পারি না। কিন্তু এইটি এক প্রকার নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারি যে, মোগলদিগের সভ্যতা, শিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বল প্রথমে এখান হইতেই তরঙ্গের ন্যায় স্ফীত হইয়া কখন বা হিমালয়োৎসঙ্গে, কখন বা পূর্ব্ব ঘাটপার্শ্বে, কখন বা পশ্চিমঘাটতটে এবং কখন বা কন্যাকুমারীর অন্তরীপশৃঙ্গে যাইয়া আঘাত করিতেছিল। এইখানেই কোন সময়ে আবুলফজল্, ফয়জী, বীরবল ও মানসিংহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা বৃহস্পতিকল্প চন্দ্রচতুষ্টয়ের ন্যায় আকবর পার্শ্বে থাকিয়া কখন বা ইহার দরবারে আম্ নামক গৃহে এবং কখন বা ইহার দরবারে খাস্ নামধেয় ভবনে করে কর সম্মিলন পূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছিল। ইহারই ভগ্নাবশেষের অভ্যন্তরীণ কোন এক গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া মন্ত্রিবর আবুল্‌ফজল্ তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ আইন আকবরির পাণ্ডুলিপি লিখিয়াছিলেন; এবং ইহারই ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ভগ্নগৃহ মস্‌জিদাদির কণ্ঠসমূহকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য কোন দিন সেই প্রসিদ্ধ যবনকবি ফয়জী, আপনার সুললিত কবিতাকুসুমে মালা গ্রন্থন করিয়া আপন হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপ কাল-কুরঙ্গ, সেই সমস্ত ঘটনা ও কথাকে ভূভারতের স্বপ্নভূমিতে নির্ব্বাসিত করিয়া, ইহাকে আপনার মুখাবলীঢ় তৃণ পত্রের ন্যায় কেবল কতকগুলি চূর্ণীকৃত সমাধিপুঞ্জাবশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। যে দিকে দেখ, সেই দিকেই ভাঙ্গা গোর ও সমাধি মস্‌জিদ। কোন স্থানে কোন প্রসিদ্ধ গৃহশ্রেণীর খান কত ভগ্ন ইষ্টক পড়িয়া আছে;—কোথাও বা একটি প্রাচীরাংশ তৃণ গুল্মে রোমাঞ্চিত হইয়া কোন এক নিভৃত স্থানের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া আছে। কোন স্থানে কোন একটি গৃহের বিভগ্ন শরীর ও বিকলাভ্যন্তর, অস্থিমাত্রাবশিষ্ট নরকপালের মুখাভ্যন্তরের ন্যায় পথপার্শ্বে পড়িয়া রহিয়া পান্থবর্গের দম্ভ ও অহঙ্কারের প্রতি ভ্রূকুটি করিতেছে। কোথাও বা সেই সকল প্রসিদ্ধ লোকদিগের মধ্যে কাহার কাহার দেহাবশিষ্ট রজোমুষ্টি, শকটবর্ত্মের মধ্যপথে পড়িয়া এবং চক্রঘর্ষণে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পথিকজনের শ্মশ্রু ও কপালসমূহকে বিরঞ্জিত করিতেছে। কোথাও আবার কালবিদলিত, সর্ব্বোৎপাটিত এবং শূন্যাবশিষ্ট অট্টালিকা-ভূমিতে স্বভাবজাত কণ্টক সমাকুল ববুল তরুর সমাশ্রয়ে, বিজনতা যেন বিনাশ দর্শনে অতি করুণস্বরে পারাবতকণ্ঠে রোদন করিতেছে। বস্তুতঃ যে দিকে চক্ষু এবং কর্ণ ফিরাইবে, সেই দিকেই বোধ হইবে, যেন বিরাটকাল, এক পার্শ্বে আপনার চিরসহচর স্বরূপ বন, বিজনতা, ও শূন্যতা প্রভৃতি প্রেতদলের সহিত বসিয়া অতি গম্ভীরভাবে ভোজনব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে;—আর অপর পার্শ্বে অধিবাসী পাচকেরা গৃহ, অট্টালিকা ও ঘটনাদিরূপ

নূতন নূতন অন্নব্যঞ্জন শাক সূপাদি রন্ধনের ধূম, অগ্নিজ্বালা, কোলাহল ও দণ্ড কটাহ প্রভৃতির খট খট্ শব্দে চক্ষুকর্ণকে অন্ধও বধির করিয়া তুলিতেছে।

যদিও ইহার গত যৌবনশ্রীর সহিত তুলনা করিলে আগ্রা এক্ষণ কিছুই নহে, তথাপি ইহার প্রাচীন মাহাত্ম্য এবং কালকবের অস্পৃষ্ট---ইহার অন্তর্গত কোন কোন পদার্থ দূর হইতে ভ্রমণকারীদিগকে এখনও আকর্ষণ করিয়া আনে। এখনও ইহা দর্শক বর্গের তীর্থ স্থান বলিয়া গণনীয়। অতএব যদি আমি এখানে মোগল বংশীয়দিগের মহাপীঠ এই আগ্রা নগরের কোন কোন বৃত্তান্ত লিপি বদ্ধ করি, বোধ হয় তাহা পাঠক বর্গের নিতান্ত অপ্রীতিকর অথবা পঠন-ক্লান্তিকর হইবে না। তাঁহারা প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের অর্থাৎ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বর্ত্তমান অবস্থার বহুতর বিষয় সামান্য ভাবে সাঙ্কেতিক রূপে ইহা দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। যেমন কোন একটি মনুষ্য শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরীণ নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ও তৎসহ তদন্তর্গত ব্যাপারাদি অতি সামান্য ভাবে দর্শন করিলেও সামান্যরূপে সমুদয় মনুষ্য শরীরেরই পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, সেইরূপ কোন একটি দেশ কি প্রদেশের কোন একটি কেন্দ্রীভূত নগরকে সামান্যরূপ মনোনিবেশের সহিত দর্শন করিলে, কিংবা তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিলেও সামান্যতঃ সেই সমস্ত ভূখণ্ডের বহুতর বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। আমি অতি দীর্ঘকাল এই নগরে বাস করিয়া আসিতেছি। এই সময়ের মধ্যে, যদিও কোন দিন দেখিবার জন্য অধিক যত্ন করি নাই, তথাপি বিনাযত্নেই এত বিষয় চক্ষে পতিত হইয়াছে যে, তাহা এখন যত্নের সহিত কুড়াইয়া একত্রিত করিতে পারিলে, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত এ সকল স্থান দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে তদ্দ্বারা একটি ছোট খাট কৌতুকাবহ উপহার প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমি এখানে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার স্বদেশীয় পাঠকবর্গ যদি ইহা পাঠ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও আমোদিত হন, আমি তাহা হইলেই পরিশ্রমসার্থক মনে করিব।

প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গুটিকত কথা। যদিও প্রকৃত বিষয়ের সহিত তাহার বিশেষ কোন সংশ্রব নাই, তথাপি মনের দুঃখ প্রকাশ জন্য পাঠকবর্গকে গুটিকত কথা বলা আমার যেন আবশ্যক বোধ হইতেছে। পাঠকবর্গ অল্প পরিমাণ অনুধাবনের সহিত ভাবিলেই অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে, আমাদের অন্তঃকরণ পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অধিকতর জিজ্ঞাসু এবং অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণ আমাদের দ্বারা আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী ঘটনা কি ব্যাপারাদি পূর্ব্বের ন্যায় তত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষিত হয় না। সকল বিষয়েরই একটু একটু তত্ত্ব জানিতে অনেকেরই ইচ্ছাকরে।

যদিও এই জ্ঞান-ক্ষুধা সম্যক্ রূপে সর্ব্ব সাধারণের অন্তরে এক্ষণ পর্য্যন্তও অধিকার-স্থান পায় নাই, যদিও সাধারণে দারুণ মন্দাগ্নির প্রকোপ এখন অত্যন্ত প্রবলই রহিয়াছে, তথাপি কোন কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে কোন কোন অংশে অতি সামান্য পরিমাণে একটুকু ক্ষুধার বেগ জন্মিয়া উঠিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়; এটি মৃত আশালতাতে প্রাণ সঞ্চারের কিঞ্চিৎ পরিচয় তাহার সন্দেহ নাই। ইহা যে ইংরেজি শিক্ষা এবং ইংরেজ জাতির প্রকৃতিগত দৃষ্টান্তের উদ্দীপনায় হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এ সকল হইয়াও মধ্যপথে কতকগুলি অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে, পূর্ব্বোক্ত আশালতার অঙ্কুর যেন আর বৃদ্ধি পাইতেছে না। একটু একটু হরিদ্বর্ণ মুখ বাহির করিয়া যেখানকার যাহা, তাহা সেই খানেই আবার বিবর্ণতা পাইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে। এরূপ হইয়া যাওয়ার কএকটি কারণ আছে। তন্মধ্যে প্রধান এবং সর্ব্ব প্রথম এই যে, যাহার ক্ষুধা জন্মিয়াছে তাহার অন্ন নাই, আর যাহার অন্ন আছে, তাহার ক্ষুধা কি রুচি মাত্র নাই। অন্নবানেরা অন্নের শয্যা, অন্নের উপাধান, অন্নের পাদুকা এবং অবশেষে অন্নে পথ পর্য্যন্ত বাঁধাইয়া তাহার উপরে প্রত্যহ পদচারণা করিবেন ও তাহাতে মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া অপরের অগম্য করিয়া রাখিবেন; তথাপি নিরন্নদিগের ক্ষুধানল নির্ব্বাপণ জন্য প্রাণান্তেও একটি কপর্দ্দক পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহাদের অন্নরাশি বস্তা বাঁধিয়া বাঁধিয়া আপন হস্তে প্রতিদিন মল-কূপে নিক্ষেপ করিয়া পচাইবেন, তথাপি একটি পয়সা অন্যের ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য ব্যয়িত হইতে দেখিতে পারিবেন না। তাঁহাদের ক্ষুধাও জন্মে না, অন্নের এরূপ দুর্গতিও ঘুচে না। যাঁহার অনেক উদ্দীপক ঔষধি খাওয়াইবার পরে কিঞ্চিৎ জন্মে তাহাও বিকৃত ক্ষুধা;—কাগ এবং বোতল ভাঙ্গা খাইবার ক্ষুধা;—মাটি খাইবার ক্ষুধা। একটিরও অন্ন ব্যঞ্জনের প্রতি অভিরুচি হয় না। ভারতের ভাগ্যে যদি অন্নবস্তুদিগের একবার প্রকৃত ক্ষুধা জন্মিত, তাহা হইলে অনেক নিরন্ন তত্ত্ব-ক্ষুধার্ত্ত লোক তাঁহাদের ভোজ সমারোহে আপন আপন উদর পূর্ত্তি করিয়া মহান্ আনন্দ লাভ করিতে পারিত; আর এরূপে মুহ্যমান হইয়া যাইত না। দেশের মুখও অনেক উজ্জ্বল এবং প্রসন্ন দেখাইত। যে সকল লোকের কথা এখানে উল্লিখিত হইল, ইহাঁরা প্রায় সকলেই আপন আপন পিতৃপুরুষদিগের ছল বল বাহুপার্জ্জিত অন্নে অন্নবস্তু; ইহাঁদিগের আপন বিক্রমোপার্জ্জিত কিছুই নহে, ইহাঁরা যক্ষ নাগের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কেবল পিতামহের সুবর্ণ কলসকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। ইহাতে পুরুষকারের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি পক্ষান্তরে ইহাঁরা এই

অন্নদ্বারা দেশের নানারূপ জ্ঞান-দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা পান, তাহা হইলে ইহাঁদিগের অনেক পুরুষকারের কথা হইয়া উঠে সন্দেহ নাই। ঝাড় পানসের সঙ্গে ইহাঁদিগের অস্তিত্ব চূর্ণ হইয়া যাইবার আর সম্ভাবনা থাকে না।

নিরন্নদলের মধ্যে অনেকে পাঠশালা রূপ চিকিৎসালয়ে থাকিয়া শিক্ষক বৈদ্যের উপদেশ রূপ উদ্দীপক ঔষধ দ্বারা কিছু দিন হইল জ্ঞান-ক্ষুধাকে অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়াছিলেন। দেখা গেল যে, তাঁহাদের অনেকেই সেই চিকিৎসালয় ছাড়িয়া যখন কিঞ্চিৎ অন্নবস্ত হইয়া উঠিলেন, অমনি এককালে ক্ষুধা রহিত হইয়া শয্যায় পড়িলেন। ভাতের ক্ষুধা আর রহিল না। নানাপ্রকার বিকৃত ক্ষুধা জন্মিতে লাগিল। বোতল ভাঙ্গা, কাগ, ছাই, মাটি ও গোবরে রুচি জন্মিয়া উঠিল। এইরূপ অসুরাব উপস্থিত হওয়াতে কোন দলেই পুষ্টি বিস্তৃত হইতে পারিতেছে না। অন্নবস্তেরা যেরূপ বিকৃত পদার্থ সকলের আহারে একদিকে শুষ্ক হইয়া যাইতেছেন, সেইরূপ নিরন্নেরা ক্ষুধাসত্ত্বেও অপরদিকে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছেন। একপ কেন হইল? ক্ষুধা থাকে ত অন্ন থাকেনা, অন্ন থাকে ত ক্ষুধা থাকে না। একি অন্নেরই দোষ, না, লোকের প্রকৃতির দোস? যদি অন্নের দোষ হইবে, তবে ভিন্নদেশে কেন ভিন্নরূপ দৃষ্ট হয়? লার্ডরস্, লার্ডওয়েরি প্রভৃতির ক্ষুধা কেন অন্যরূপ? এই ভারতবর্ষের কাল-চর্ব্বিত বক্ষে এত স্থানে এত কীর্ত্তি চিহ্ন রহিয়াছে এবং সেই সকল চিহ্নের সহিত এত ঐতিহাসিক তত্ত্ব লোকের অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা বশতঃ একদিকে একভাবে দৃষ্টিপথের অগোচরে ভূগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে যে, যদি তাহা এ দেশীয় ধনিসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ সম্মিলিত হইয়া আপন পিতৃপুরুষদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপে সেই সকলের চিত্রপট ও তৎসহ তাঁহাদের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত একত্রে এক স্থানে সংগ্রহ করিয়া পুস্তকে নিবদ্ধ করেন, তাহা হইলে সেই পূর্ব্ব পুরুষদিগের সমাধির উপরে একটি অপূর্ব্ব স্বর্ণ স্তম্ভ প্রস্তুত হয়। এবং এই সকল চিহ্ন-চিত্র ও তাহার বৃত্তান্ত সর্ব্বদা অন্তঃকরণে দেশের অনুরাগকে উদ্দীপন করে। সময়ে সেই উদ্দীপনা আবার প্রাণবলেও পরিণত হয়। যাঁহারা এই স্তম্ভ প্রস্তুত করেন, তাঁহারাও পৃথিবীতে সরস্বতীর অধিষ্ঠান কাল পর্য্যন্ত ভারত বাসীদিগের ভাবি হৃদয়ে জীবিত থাকিতে পারেন। যে দেশে প্রাণ আছে, খুঁজিয়া দেখ, সেই দেশেরই প্রতি গৃহে এইরূপ স্মরণ-স্তম্ভ পুস্তকাকারে গ্রন্থাগারে বিগ্রহরূপে অর্চ্চিত হইতেছে। আর যে দেশে ইহা পাদ-দলিত হইয়া স্মরণাগার হইতে অবজ্ঞা ও অবহেলার সম্মার্জ্জনী দ্বারা অপসারিত হইয়াছে, সেই দেশই প্রেতলোকগত পিতৃদেবতাদিগের অবমাননারূপ পাপে ভাজিয়া পড়িয়া এবং পূর্ব্ব

পুরুষদিগের বলবীর্য্য কীর্ত্তি সাহসাদির উদ্দীপনারূপ তেজে বঞ্চিত হইয়া ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ ও অবশেষে ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কোন একটি সামান্য গ্রামের ইতিবৃত্তও যদি প্রকৃত রূপে লিখিতে হয়, তাহাতেও অনেক পরিশ্রম, সহায়তা, সময়, অনুসন্ধান ও কখন কখন অর্থবিতরণ আবশ্যক করে। বিদেশীয়েরা এবম্প্রকারের কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে আমাদের নিকট হইতে যত সাহায্য এবং সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন, আমরা স্বদেশীয়েরা আপনাদের নিকট হইতে তাহার চতুর্থাংশের একাংশও সহজে পাইতে পারি না। সুতরাং আমরা কাব্য লিখি, কল্পনার আশ্রয় লই, এবং বৃত্তান্ত জগতের সম্মুখীন হইতে, অথবা ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রবেশ করিতে যেরূপ সাহায্য, সম্বল ও উপকরণ সামগ্রীর আবশ্যকতা তাহা না পাইয়া, এবং পাইতে চাহিলে কমল-মধুমুগ্ধ স্বদেশীয় ধনিসন্তানদিগের নিকট ঘৃণিত, উপেক্ষিত ও সর্ব্বপ্রকারে বিড়ম্বিত হইয়া কাল-কুক্ষি-নিহিত পুরাতন তত্ত্বের অনুসন্ধানে বিরত হই। পুরাতন তত্ত্বের অনুসরণ আমার পক্ষে আরও কষ্টকর। অবস্থার নিপীড়নে আমি যার পর নাই অসহায়। আর, পদমর্য্যাদা এবং প্রতিপত্তিবিরহে এই আগ্রার অনেক স্থানই আমার অগম্য, অথবা দুরধিগম্য। আমি পাঠকবর্গকে এই হেতু পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি তাঁহাদিগকে যাহা উপহার দিব, তাহা অযত্নলব্ধ এবং ইতিহাসের শৃঙ্খলা শূন্য।

আগ্রা হিন্দুদের সময়ে কি ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার কোন স্পষ্ট চিহ্নই ইহার শরীরের উপর এক্ষণ বিদ্যমান নাই। কনিংহ্যাম্ প্রভৃতি স্থপতি কারুবিশারদ ব্যক্তিরা ইহার নামের ব্যুৎপত্তি হইতে এবং অন্যান্য লেখকদিগের মত হইতে ও অন্যবিধ কারণ সমস্ত হইতে ইহার নাম ও প্রাচীনত্বের বিষয়ে নানা প্রকার অনুমান করেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ জন্য তাহার কিছুটা এখানে উল্লেখ করা হইল।

টড্ সাহেবের রাজস্থানের পুরাবৃত্তে আগ্রা কোন কালে অগরওয়াল্বংশীয় সরদারদিগের বাসভূমি ছিল বলিয়া, উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের বংশাবশেষ এখনও নাকি দিল্লীর পশ্চিমে অগরোহা নামক স্থানে, বুন্দেলখণ্ডে, রাজপুতনার কোন কোন অংশে এবং মালোয়াদেশের অগ্গর নামক স্থানে বাস করিতেছে।

কুইণ্টস্কর্টিনস্ তাঁহার পুরাবৃত্তে "অগ্রমেশ" নামে যে এক প্রাচীন রাজার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ, আগ্রা, তাঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান করেন। কেহ বলেন যে, রজঃপুতবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে "অগ্রাজ" নামে কেহ ছিলেন। তিনি অগ্নি হইতে উদ্ভব হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম অগ্রাজ হইয়াছিল। আগ্রা এক সময় তাঁহারই রাজধানী ছিল।

কেহ আবার বলেন, পুরাণে অগ্নিমিত্র নামে যে এক রাজার উল্লেখ আছে, সেই অগ্নিমিত্র শব্দই কালে আকুঞ্চিত ও অপ-ভাষিত হইয়া অগ্রাজ হইয়া গিয়াছে। অগরাজ এবং অগ্নিমিত্র এক ব্যক্তিরই অ-ভিধান। সুতরাং এস্থানে অগ্নিমিত্র অ-র্থাৎ অগরাজের রাজধানী ছিল বলিয়াই, ইহার নাম আগ্রা হইয়াছে।

কেহ অনুমান করেন, কাল-প্রসিদ্ধ মথুরার অগ্রবর্ত্তী নগর বলিয়াই ইহার আগ্রা নাম দেওয়া হইয়াছে। অন্য এক সম্প্রদায় বলেন যে, হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অগর্ শব্দে লবণকুণ্ডকে বুঝায়। আগ্রার মৃত্তিকাতে অনেক স্থানে লবণ উৎপন্ন হয়,এবং ইহার কূপাদির জলও লবণাক্ত। সুতরাং ইহাকে অগর অর্থাৎ লবণকুণ্ড মনে করিয়াই ইহার নাম আগ্রা রাখা হইয়াছে।

আবার ১৮৬১ সনে এই আগ্রানগ-রের কোন একটা স্থান খনন করিতে ক-রিতে প্রায় দ্বিসহস্রেরও অধিক রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। তাহার সমুদয় মু-দ্রাতেই প্রাচীন পাশ্চাত্য সংস্কৃত অক্ষরে অতি স্পষ্টরূপে "গুহিল শ্রী" নাম অ-ঙ্কিত ছিল। কেহ কেহ ভাবেন যে, এই "গুহিল শ্রী" হয় ত মেওয়ার দেশীয় ঘী-লোট বংশের আদিপুরুষ শ্রীগোহাদিত্য অথবা গুহিল হইবেন। ইনি ইংরেজী ৭৫০ অব্দে প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু মুদ্রার কলেবরে যে জাতীয় অক্ষর অঙ্কিত ছিল, তাহা যেন এই কাল হইতেও অনেক প্রা-চীন কালের অক্ষর বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং ঐ মুদ্রা যে ঘীলোট বংশীয় শ্রীগু-হিলের মুদ্রা, এ বিষয়ে সংশয় থাকে। এ-দিকে কনিংহ্যাম্ সাহেব গোয়ালিয়রের নিকটে নব্ওয়ার নামক স্থানে "শ্রীগুহিল পতি" নামাঙ্কিত গোটাকত টাকা পান। ঐ টাকাতে যে প্রণালীর অক্ষর সকল অঙ্কিত ছিল, তাহার সহিত আগ্রাতে প্রাপ্ত মুদ্রা সকলের কলেবরস্থ অক্ষর সমুদয়ের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু ইতি মধ্যে আবার সেই প্রদেশের তোর্‌মনের পুত্র পশুপতির নামাঙ্কিত আরও চারিটি মুদ্রা পাওয়া যায়। এই চারিটি মুদ্রা পাওয়ার পরে, কনিংহাম্ সাহেব এই অনুমান ক-রেন যে, পূর্ব্বোক্ত গুহিলপতিও এই বং-শেরই কেহ হইবেন। তোর্‌মন খ্রীষ্টীয় অ-ব্দের ২৬০ হইতে ২৮৫, এবং পশুপতি খ্রীষ্টীয় ২৮১ হইতে ৩১০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হন বলিয়া প্রবাদ আছে। এইক্ষণ সর্ব্বেশ্বর কার্লাইল সা-হেব এই ঘটনা দেখিয়া নরওয়ারের শ্রীগু-হিল পতি ও আগ্রার গুহিলশ্রীকে এক মনে করেন। এবং এই আগ্রা যে কোন সময়ে সেই শ্রীগুহিল পতির সিংহাসনভূমি ছিল, তাহা সিদ্ধান্ত করেন।

এদিকে আবার আগ্রার দুর্গ হইতে প্রায় ৩ মাইল উপরের দিকে যমুনার দ-ক্ষিণ তটে একটি বাগান ও বাড়ীর কিঞ্চিৎ চিহ্ন পড়িয়া আছে,দেখিতে পাওয়া যায়। লোকেরা ইহাকে রাজা ভোজের বাগান

ও বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই রাজা ভোজ কে, তাঁহার কি বৃত্তান্ত, তাহা এইক্ষণ জানিবার কোন উপায় নাই। সর্ব্বেয়র কার্লাইল সাহেব বলেন যে, তিনি নাকি এখানকার কোন বিচক্ষণ লোককে ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রত্যুত্তরে সে ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, ইহা খ্রীষ্টীয় ৬ ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত,মালোয়াদেশীয় রাজা ভোজের বাগান ও বাড়ীর ভগ্নাবশেষ। সাধারণেরা যদিও তাঁহাকে এত বিশেষ করিয়া এবিষয় বলিতে পারিয়া ছিল না বটে, কিন্তু ইহা যে রাজা ভোজের বাড়ী এবং মুসলমানদের আক্রমণকালের পূর্ব্ব হইতেই এখানে আছে, তাহা তিনি সকলের নিকট হইতেই এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে শুনিয়া ছিলেন। যদি এই জনশ্রুতি সত্য হয়, তাহা হইলে আগ্রাতে মুসলমানদের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের এই একমাত্র হিন্দু চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, বলিতে পারা যায়।

অঞ্জনা-পুত্র যে প্রকার সাগরগর্ভ হইতে উত্তোলিত চারিটি প্রস্তরাঙ্কিত অক্ষর দ্বারা কাল-বিলুপ্ত সমগ্র মহানাটক পুস্তক উদ্ধার করিয়াছিলেন, সাহেবদিগের অধ্যবসায় এবং যত্নরূপ আঞ্জনেয়ও সেই প্রকার বিস্মৃতি সাগরস্থ অনিশ্চিততা রূপ অতলস্পর্শ সলিলে নিমজ্জিত ভারতের প্রাচীন ইতিহাসকে কখন বা মৃত্তিকা প্রোথিত মুদ্রাশরীরাঙ্কিত চতুরক্ষর দ্বারা, এবং কখন বা ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত কাল নিষ্পিষ্ট মসৃণ ইষ্টক খণ্ড দ্বারা উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প। ধন্য ইহাঁদের যত্ন! ধন্য ইহাঁদের পরিশ্রম! এবং ধন্য ইহাঁদিগের অধ্যবসায়! আমরা শয়ন করিয়া থাকি,পরিহাসে আর গল্পে সময় অতিপাত করি এবং বৈঠকখানায় বসিয়া কখন বা হা, হা, হী, হী, রবে পৃথিবীকে তৃণবৎ উড়াইয়া দেই, তথাপি একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখি না যে, আমাদের দ্বারের দুই পার্শ্বে কি ছড়ান রহিয়াছে এবং এই সকল ছড়ান পদার্থচূর্ণ দ্বারাই বা কি বিষয় কতদূর আকৃতিতে আনা যাইতে পারে। আর ইহাঁরা ভিন্নদেশীয় এবং ভিন্ন-শোণিত শুক্র-জাত হইয়াও কেবল শুদ্ধ কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমাদের পতিত গৃহের ভগ্ন ইট, পাট্কেল এবং মৃত শরীরের অস্থি পঞ্জর ঘাটিয়া আমাদের পরিচয় নিতে এবং আমাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। আমরা পাশাপাশি থাকিয়াও আপন যত্নে কেহ কাহাকে চিনিতে চেষ্টা করিতেছি না।

পাঠকবর্গের সমীপে উপরোল্লিখিত কতিপয় পংক্তিতে আগ্রা নামের উৎপত্তি এবং তাহার ব্যুৎপত্তি হইতে যে যে অনুমান তন্তুখণ্ড এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে ও ইহার বক্ষে হিন্দুদিগের যে যে চিহ্নরেখা, ইহার প্রাচীন পরিচয়ের জন্য আজি পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা এক

প্রকার সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, এ পর্য্যন্ত আর কিছু জানা হয় নাই। কিন্তু ইহার পার্শ্ববর্ত্তি স্থানাদিতে সংশয়োৎপাদন করিবার এত বিষয় আছে যে, তাহা অর্থ ব্যয় করিয়া খনন করিলে অনেক নূতন কথা আবিষ্কৃত হইতে পারে। আজি একটি সামান্য লোক, ইফীসস্ খনন করিয়া তাহার গভীর মৃৎকুক্ষি হইতে চূর্ণীকৃত ডায়না দেবীর মন্দিরের সম্পূর্ণ অবয়ব চিত্রিত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতে কি সেরূপ অর্থ নাই যে, ইহার বক্ষে কোন কোন বিলুপ্ত স্থানের বিলুপ্ত কীর্ত্তি সকল সেই রূপে চিত্রিত হইতে পারে? আছে। অনেক তমসান্ধ গর্ত্ত সকলের মধ্যে আজিও রজত কাঞ্চন স্তূপীকৃত হইয়া আছে। কিন্তু তাহার ধারে কাছে একটিও মনুষ্য নাই।

হিন্দুদিগের পরে মুসলমানদিগের কাল। মুসলমানদিগের কীর্ত্তি ইহার বক্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই পুঞ্জে পুঞ্জে বিক্ষিপ্ত আছে। ইহাতে ইহাকে মুসলমানদিগের স্থাপিত নগর বলাই সঙ্গত। লোকেরাও এক প্রকার তাহাই বলিয়া থাকে। সর্ব্বপ্রথমে লোদীবংশীয়েরা এস্থানে আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। সেকেন্দর বিন্ বহলল লোদী খৃষ্টীয় ১৫১৫ সনে আগ্রাতে দেহত্যাগ করেন। ইহাঁর সমাধি কোথায় দেওয়া হয়, তাহার কিছু নিশ্চিত নাই। ইনি এই সহরের অভ্যন্তরে বাদল গড় নামক কোন একটি প্রাচীন হিন্দুদুর্গকে সংস্কার করিয়া এখানে বাস করেন। এই বাদলগড় নামক হিন্দু দুর্গ কোন্ খানে ছিল, এখন মৃত্তিকার উপরিভাগ দেখিয়া তাহা জানিবার কোন সুযোগ নাই। সহরের মধ্যে "লোদী খাঁকা টিলা" নামক যে একটী উচ্চ স্থান আছে, কোন কোন লোকে তাহাকেই বাদলগড়ের ভূমি বলিয়া বলে। কেহ বা আকবর নির্ম্মিত বর্ত্তমান দুর্গকে বাদলগড়ের প্রাচীন ভিত্তিভূমির উপরে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বলে। গোয়ালিয়র দুর্গের নিম্ন প্রাচীরকে সেখানে বাদলগড় বলিয়া থাকে। তাহা ১৪৭৫ খৃঃ অব্দে রাজা কল্যাণমল্লের ভ্রাতা বাদল সিংহ দ্বারা রচিত হয়। কনিংহাম সাহেব সেই সূত্রে আগ্রার কালবিলুপ্ত বাদল গড়কেও তাঁহারই রচিত বলিয়া অনুমান করেন। উপরোক্ত "লোদী খাঁ কা টিলা" ব্যতীত সহরের পশ্চিমে পাঁচ মাইল অন্তরে সেকেন্দ্রা নামক স্থানে সেকেন্দর লোদীর প্রাসাদ বাটীর অল্প কিঞ্চিৎ ভগ্নাংশ পতিত আছে। ইহা ব্যতীত লোদী বংশীয়দের আর কোন চিহ্ন এখানে নাই। লোদী খাঁর টিলার বিষয়ে একটুকু সন্দেহ আছে। খাঁ খানন্ লোদী নামে বাবর এবং হুমায়ুনের একজন প্রসিদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এবং খাঁ জাহান লোদী নামে জাহাঙ্গিরেরও এক জন সেনাপতি ছিলেন। এক্ষণ লোদী খাঁয়ের টিলা যে কোন্ লোদীর আবাস বাটী ছিল, তাহা বলা সহজ ব্যাপার নয়। সেকেন্দর লো-

দার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদীও এখানে বাস করেন।

খৃষ্টীয় ১৫২৬ সনের মে মাসে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজয় করিয়া আগ্রা এবং দিল্লী করস্থ করেন। তাঁহার প্রাসাদবাটী ও উদ্যানাদির ভগ্নাবশেষ অন্য অন্য গৃহাদির ইষ্টক চূর্ণ সংহতি সহ বর্ত্তমান নগরের ঠিক বিপরীত দিকে যমুনার পূর্ব্বতটে রেলওয়ে ষ্টেসন ও ইৎমাদুদ্দৌলার সমাধি মসজিদ হইতে নুনিহাই নামক গ্রাম পর্য্যন্ত স্তূপে স্তূপে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। নুনিহাই গ্রামকে এখনও রেলের গাড়ীর উপর হইতে যেকালে দেখা যায়, যেন একখানি ছোট খাট নগর বলিয়া ভ্রম হয়। উহার মধ্যে এখনও অনেক সমৃদ্ধিশালী লোক বাস করে। বাবরের সময়ে যে, ঐ স্থানেই আগ্রাছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ৯৩৭ হিজরী সনে বাবরের দেহ পতন হইলে পর, তাঁহার পুত্র হুমায়ুন প্রথমে এখানে অধিবাস করেন। যে সনে বাবরের মৃত্যুহয়, হুমায়ুন সেই সনেই একটি মসজিদ প্রস্তুত করেন। তাহার ভগ্নাংশ আজিও তাজমহলের বিপরীত দিকে যমুনার পর পারে কাচপুরা নামক গ্রামের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদের গাত্রে হুমায়ুনের নাম ও যে সনে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে সমুদয় লেখাআছে। গ্রাম্য লোকেরা তাহার উৎসঙ্গে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে এবং কপোত শুক প্রভৃতি পক্ষী সকল তাহার চূর্ণীকৃত মস্তকের কোটরে থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তি শস্য ক্ষেত্র অপহরণে জীবন যাপন করিতেছে। এই মসজিদেরই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে যমুনাতট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ভূমি খণ্ডকে "মাহতাব খাঁকা বাগ" বলে। এখানে এক্ষণ কিছুই নাই। কেবল একদিকে একটি ভগ্ন বুরুজ কিঞ্চিৎ ইষ্টক চূর্ণ লইয়া পতিত রহিয়াছে। এই স্থান সম্বন্ধে একটি সুন্দর ছোট প্রবাদ আছে। মাহতাব খাঁ কোন এক আমিরের পুত্র ছিলেন। তিনি তাজমহলের ন্যায় আর একটি বাড়ী এখানে প্রস্তুত করিবেন বলিয়া উদ্যোগ করেন, এবং ভূমিকে প্রাচীর-বদ্ধ করিয়া লন। সাজিহান তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন যে, যদি তুমি এস্থানে কোন গৃহ প্রস্তুত কর আর সেই গৃহ দেখিতে তাজমহল অপেক্ষা কোন অংশে কুৎসিত হয়, তাহা হইলে এতসুন্দর এই তাজ গৃহের কাছে, ওরূপ একটি কদাকার পদার্থ সম্মুখে থাকিলে তাজের শোভার অনেক ব্যাঘাত হইবে। আর যদি তোমার গৃহ তাজগৃহ হইতে সৌন্দর্য্যে উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার তাজের শোভা সমস্ত গ্রাসিত ও বিলুপ্ত হইবে। মাহতাব খাঁ ইহা শুনিয়া বাগান প্রস্তুত করিতে ক্ষান্ত হন। সাজিহান তৎপর এইস্থানে আপনার সমাধির জন্য তাজমহালের অবিকল অপর একটি উদ্যান ও বাটী প্রস্তুত করিতে মনন করেন এবং তাহা যমুনার উপর দিয়া ম-

র্ম্মর প্রস্তরের সেতু দ্বারা, তাজ গৃহের সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বৃত্ত পুত্র অরঙ্গজীব দ্বারা তিনি অকালে কারারুদ্ধ হওয়াতে সে ইচ্ছা তাঁহার অন্তরেই লীন হইয়া যায়। এই মাহতাব্ খাঁর বাগ এবং পূর্ব্বোক্ত হুমায়ুনের মস্‌জিদের পশ্চিমে যমুনাতট দিয়া বহুদূর ব্যাপিয়া বাবর ও হুমায়ুনের প্রাসাদ বাটী ও উদ্যানাদি রচিত ছিল। এক্ষণ তাহার কিছুই নাই। কেবল এখানে সেখানে মৃত্তিকা-স্তূপ ও ইষ্টক খণ্ড সকল ছড়ান রহিয়াছে। বাবর কি হুমায়ুন কাহারই সমাধি এখানে নাই।

মুসলমান বংশের কুবলয় স্বরূপ আকবর ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে আগ্রা এবং দিল্লী অধিকার করেন। অধিকারের পরক্ষণেই তিনি আগ্রাতে আসিয়া বাস করেন নাই। আগ্রা হইতে পশ্চিম দক্ষিণে প্রায় ২৪ মাইল ব্যবধানে ফকির সলিম্-চিস্তির দরগা ফতেহ্ পুর সিকরীতে কিছুদিন বাস করেন। সেখানে সম্রাটের বাসোপযোগী প্রাসাদ বাটী, উদ্যান ও অন্যান্য বহুবিধ অট্টালিকা আজিও দর্শকদিগের নয়ন বিনোদনের জন্য প্রস্তুত আছে। এইস্থানে কিছুকাল বাস করিয়া সেখানে তাঁহার পুত্র সলিমের (জাহাঙ্গিরের) জন্ম হইলে পর প্রায় ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে আগ্রাতে আসিয়া অধিষ্ঠান করেন। প্রবাদ আছে যে, যখন তিনি আগ্রাতে আসেন তখন কিছুকালের জন্য আগ্রার বর্ত্তমান দুর্গ সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত সহরের দক্ষিণ পশ্চিমে ইদ্‌গাহ নামক বৃহৎ মসজিদ হইতে সোয়া মাইল ব্যবধানে এবং বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেটি আফিস হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে সুলতানপুর ও খোসাসপুর নামক গ্রাম দ্বয়ে শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকেন, এবং দুর্গ তাঁহার অধিবাসের উপযুক্ত রূপে সজ্জিত হইলে তাহাতে আসিয়া অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। এই ঘটনা হইতেই পূর্ব্বোক্ত গ্রাম দ্বয় সুলতানপুর ও খাওয়াস্‌পুর নাম প্রাপ্ত হয়। সুলতানপুর অর্থে সুলতান অর্থাৎ রাজার আপন নগরকে বুঝায় আর খাওয়াসপুর অর্থে খাওয়াস্ অর্থাৎ চাকরদিগের অধিষ্ঠিত স্থানকে বুঝায়। খৃঃ ১৫৭১ অব্দে আগ্রার বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এই সময় হইতেই আগ্রা আকবরাবাদ রূপ অপর এক নূতন নাম ধারণ করে। কিন্তু এই নামে বোধ হয় ইহাকে এক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লোক ভিন্ন অপরে তত চিনিতে পারে না। আগ্রাই ইহার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ নাম। ক্রমশঃ

(প্রবাসী।)

বাণীস্তোত্র ।

গীতি ।

১

জয় বিদ্যে জগত জননি,
জীবন্মুক্তি-প্রদায়িনি,
কলুষনাশিনি রমে
জয়দে বরদে বাণি ও ।
সুখ মোক্ষ তব পদে
করুণাময়ি হে শুভদে
ভকতবৎসলা বালা;
মূঢ়ে জ্ঞানদায়িনি ও ॥

২

বেদমাতা বিশ্বরমে,
কবীশ-মুনীষ-প্রিয়তমে,
আগমে নিগমে ব্যক্ত,
মহিমা তোমারি ;
অনন্ত উৎসব রঙ্গে
ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গে
পূজিছে সদা চরণ কমলে
কল্পনা-কামিনী ও ॥

৩

মধুর মলয়ানিলে,
গায় ভ্রমর কোকিলে,
বসন্তে তোমার গুণ,
বসন্তবাসিনি ;
আহা কিবা সুখসঙ্গ,
নাহি তাল স্বর ভঙ্গ,
হাসিছে কুসুম, নাচিছে তারা,
খেলিছে তরঙ্গিণী ও ॥

৪

সুরাসুর মায়ের বশ,
অক্ষয় মায়ের যশঃ,
ভুবনপূজিত নাম,
পাপ-দুঃখ-হারি ;
অপরূপ দেখরে চাহিয়ে,
বসেছে আনন্দে মায়েরে লইয়ে
সারস্বত সুত যত,
মধ্যে বীণাপাণি ও ॥

৫

কত যত্ন কত শ্রমে,
শুভ দিনে স্বর্ণভূমে,
পূজিত তোমারে রমে,
নগরে নগরে ;
অযোধ্যা অবন্তী পুরী,
মথুরার সে মাধুরী,
হারায়ে কপালদোষে,
ভারত দুঃখিনী ও ॥

৬

বাল্মীকি গৌতম ব্যাস,
ভবভূতি কালিদাস,
শঙ্কর, ভাস্কর গুপ্ত
ভারত-শ্মশানে ;
দেহ বর হে বরদে
তোমার পদপ্রসাদে
ভারত পাইবে প্রাণ
মৃতসঞ্জীবনি ও ॥

৭

ছিলে যুগ যুগ ভরি,
ভারতে পবিত্র করি,
ভারতে প্রসন্না সদা,
হ্যাদে গো ভারতি ;
এ গভীর অন্ধকারে,
কৃপা কটাক্ষ বিত'রে,
পতিত ভারতে উদ্ধারহ,
পতিতপাবনি ও ॥

(পথিক)

জীবন প্রভাত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কণ্ঠমালা।

" মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

ভারতচন্দ্র রায়।

রজনী প্রায় এক প্রহর হইলে সরযুবালা পিতার আদেশে অতিথির খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিলেন, রঘুনাথ আসন গ্রহণ করিলেন, সরযু পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে অদ্যাবধি আহূত ব্যক্তিকে পরিবারের মধ্যে কোন এক জন রমণী আসিয়া ভোজন করাইবার রীতি আছে।

রঘুনাথ বসিলেন, কিন্তু ভোজন দূরে থাক, চিত্ত সংযম করিতে পারিলেন না। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত আধারে সরযু মিষ্ট সরবৎ আনিয়া দিলেন, রঘুনাথ পাত্রধারিণীর দিকে সোদ্বেগচিত্তে চাহিলেন, যেন তাঁহার জীবন, প্রাণ, দৃষ্টির সহিত মিলিত হইয়া সেই কন্যার দিকে ধাবমান হইল। চারি চক্ষু মিলন হইল, অমনি সরযুর মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, লজ্জাবতী চক্ষু মুদিত করিয়া, মুখ অবনত করিয়া, ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। রঘুনাথও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া অধোবদন হইলেন।

পুনরায় সরযু আর একটি পাত্র আনিলেন, রঘুনাথ বর্ব্বর নহেন, এবার তিনি মুখ অবনত করিয়া রাখিলেন, কেবল সরযুর সুন্দর সুবর্ণ বলয়বিজড়িত হস্ত ও কঙ্কণবিজড়িত সুগোল বাহুমাত্র দেখিতে পাইলেন ; অগত্যা হৃদয় স্ফীত হইল, এ-

কটি দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল। সরযু তাহা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার হস্ত ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল, তিনি ধীরে ধীরে পার্শ্বে সরিয়া গেলেন।

ভোজন সাঙ্গ হইল। রঘুনাথের শয্যা-রচনা হইল, রঘুনাথ দীপ নির্ব্বাণ করিলেন, শয়ন করিলেন না, ঘরের দ্বার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটন করিয়া নক্ষত্রালোকে ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

সেই গম্ভীর অন্ধকারে নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অল্পবয়স্ক যোদ্ধা কি চিন্তা করিতেছেন? নিশার ছায়া ক্রমে গভীরতর হইতেছে, সেই সুস্নিগ্ধ ছায়ায় মনুষ্য, জীব, জন্তু, সমগ্র জগৎ সুপ্ত হইয়াছে, দুর্গে শব্দমাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণের শব্দ শুনা যাইতেছে ও প্রহরে প্রহরে ঘণ্টারব সেই নিস্তব্ধ দুর্গে ও চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে প্রতিহত হইতেছে। এ গভীর অন্ধকার রজনীতে রঘুনাথ অনিদ্র হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন?

রঘুনাথের জীবনের এই প্রথম গভীর চিন্তা, এই হৃদয়ের প্রথম ভীষণ উদ্বেগ, এ চিন্তা এ উদ্বেগ রজনীর মধ্যে শেষ হইবার নহে, চিরজীবনে কি শেষ হইবে? এত দিন রঘুনাথ বালক ছিলেন, অদ্য যেন সহসা তাঁহার শান্ত, নীল, জীবনাকাশের উপর দিয়া বিদ্যুৎরূপিণী একটি প্রতিমূর্ত্তি সরিয়া গেল, রঘুনাথের নয়ন, হৃদয় ঝল্সিয়া গেল, তাঁহার সুপ্ত চিন্তা, উদ্বেগ, ও সহস্র বেগবতী মনোবৃত্তি সহসা জাগরিত হইল। শত সহস্র বার সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি মনে আসিতে লাগিল, সেই আলেখ্য-লিখিত ভ্রূযুগল, সেই ভ্রমর-কৃষ্ণ উজ্জ্বল চক্ষু, সেই পুষ্পনিন্দি মধুময় ওষ্ঠ দুইটি, সেই নিবিড় কেশপাশ, সেই সুগোল বাহুযুগল মনে জাগরিত হইতে লাগিল, আর রঘুনাথ উন্মত্ত হইয়া সেই চিত্রের দিকে দেখিতে লাগিলেন। মস্তক ঘূর্ণিত হইল, শরীর অবসন্ন হইল, কিন্তু হৃদয়ের তৃষা নিবারণ হইল না; পুনঃ পুনঃ নব নব সৌন্দর্য্য মানস-চক্ষুতে উদয় হইতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ অগ্নিদিকে পতঙ্গবৎ সেই সৌন্দর্য্যদিকে হৃদয় আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এই আনন্দময়ী কন্যা কি তিনি লাভ করিতে পারিবেন? এই আয়ত স্নেহপূর্ণ নয়ন, এই জবানিন্দি ওষ্ঠ, এই চিত্তহারি অতুল লাবণ্য, রঘুনাথ! কি তোমার হইবে? তুমি একজন সামান্য হাবিলদার মাত্র, জনার্দ্দন অতি উচ্চ কুলোদ্ভব রাজপুত, তাঁহার রূপবতী কন্যা রাজাদিগেরও প্রার্থনীয়া! কিজন্য এরূপ আশায় হৃদয় বৃথা ব্যথিত করিতেছ? রঘুনাথ! এ বৃথা তৃষ্ণায় কেন হৃদয় দগ্ধ করিতেছ? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রাচীরের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া তাহার উপর মস্তক স্থাপন করিলেন। ললাটের শিরা স্ফীত হইতে লাগিল। ভাবিলেন "হায়! আমি অকিঞ্চিৎকর বন্ধুহীন সামান্য সৈনিক মাত্র! আমার বংশমর্য্যাদা বিলুপ্ত, আমার নাম

নাই, গৌরব নাই, আমি সরযুর অযোগ্য! কোন রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তি এই কুসুমটিকে হৃদয়ে ধারণ করিবে, আমি ইহার স্মৃতিমাত্র যাবজ্জীবন বহন করিব; দেশে, বিদেশে, যুদ্ধে, শত্রুশিবিরে, জীবনে, মরণে, বহন করিব। হা বিধাতঃ! কেন আমি সরযুর অযোগ্য হইলাম,—বা অযোগ্য হইয়া কেন এ কুসুমটি দর্শন করিলাম?" তবে কি এ আশা ত্যাগ করিবেন? সে মূর্ত্তি হৃদয় হইতে তিরোহিত করিবেন? সে যে জীবনের অংশ স্বরূপ হইয়াছে; রঘুনাথ দেখিলেন স্বহস্তে হৃদয় উৎপাটন করা সম্ভব, সে মূর্ত্তি অপনয়ন করা দুঃসাধ্য। রঘুনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিলেন।

আবার চিন্তা করিলেন "সেই স্বর্গীয় অপ্সরা কি মুহূর্ত্ত জন্যও আমার জন্য চিন্তা করিয়াছেন! যাঁহার জন্য আমার হৃদয় ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ের এক কণায়ও কি আমি স্থান পাইয়াছি? যাঁহার জন্য আমার মন ও জীবন ব্যাকুল হইয়াছে, তাঁহার মন মুহূর্ত্তের জন্যও কি এ অকিঞ্চিৎকর সৈনিকের জন্য ধাবমান হয়? যাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য আমি জীবন দিতে উদ্যত, তিনি কি মুহূর্ত্তের জন্যও আমার প্রতি সদয় দৃষ্টি করিয়াছেন? জানি না কিন্তু সরযু! সরযু! আমার হৃদয় জানিলে তুমি আমার উপর বোধ হয় এক মুহূর্ত্তের জন্যও সদয় দৃষ্টি প্রদান করিতে, অভাগা তাহার অধিক চাহেনা।" আবার অন্ধকার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন।

দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজিল, কিন্তু রঘুনাথের এ বিষম চিন্তা শেষ হইল না। হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া একাকী নিঃশব্দে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। এই শান্ত রজনীতে তাঁহার হৃদয়ে কি প্রলয়ের ঝটিকা বহিতেছে!

কিন্তু যৌবনকালে আশাই বলবতী হয়, শীঘ্র আমাদের নৈরাশ্য হয় না, অসাধ্যও আমরা সাধ্য বিবেচনা করি, অসম্ভবও সম্ভব বোধ হয়। রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া, চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতেছিলেন, অনেকক্ষণ পর সহসা দণ্ডায়মান হইলেন, আপন হৃদয়ের উপর উভয় বাহু স্থাপন করিয়া সগর্ব্বে ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, মনে মনে বলিলেন "ভগবন্, সহায় হও, অবশ্য কৃতকার্য্য হইব, যশ, মান, খ্যাতি, মনুষ্যসাধ্য, কি জন্য আমার অসাধ্য হইবে? আমার শরীর কি অন্য অপেক্ষা ক্ষীণ? বাহু কি অন্য অপেক্ষা দুর্ব্বল? যুদ্ধে কি আমি অন্য অপেক্ষা ভীরু? * * "দেখিব এই পণ রাখিতে পারি কি না।" * * "তাহার পর? যদি কৃতকার্য্য হই তাহা হইলে সরযু! আমি তোমার অযোগ্য হইব না; তখন সরযু! তোমাকে গল্পচ্ছলে অদ্যকার এই সকল কথা বলিব, তখন তোমার সুন্দর হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া স্বর্গ-

সুখ তুচ্ছ করিব, তখন স্বহস্তে ঐ সুন্দর কেশ পাশে মুক্তামালা জড়াইয়া দিব, আর ঐ সুন্দর বিম্ববিনিন্দি, ওষ্ঠদ্বয়——” রঘুনাথ! রঘুনাথ! উন্মত্ত হইও না।

তখন রঘুনাথ কথঞ্চিৎ শান্ত-হৃদয়ে শয়ন করিতে আসিলেন। গৃহের ভিতর না যাইয়া সেই ছাদের যেস্থানে পূর্ব্বদিন সরযু বসিয়াছিলেন সেইস্থানে শয়ন করিতে আসিলেন। দেখিলেন—কি দেখিলেন? দেখিলেন একটি কণ্ঠমালা পড়িয়া রহিয়াছে; দুইটি করিয়া মুক্তা, পরে একটি করিয়া পলা,—রঘুনাথ সে মালা চিনিলেন। সেই মালা পুর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সরযু কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন, বোধ হয় অসাবধানতা বশত ঐস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন “ভগবন্ একি আমার আশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বলক্ষণ দান করিলেন?” শত সহস্রবার সেই মালা চুম্বন করিয়া পরে পরিধেয় কুর্ত্তীর নীচে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। পরে অচিরাৎ সেই স্থানেই নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিন্তু সে নিদ্রা স্বপ্নপূর্ণ, স্বপ্ন সরযু-পূর্ণ।

পরদিন প্রাতে রঘুনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জনার্দ্দন দেবের নিকট ভবানীর আজ্ঞা জানিলেন; “ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধে জয়, স্বধর্ম্মীদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজয়।” পরে কিল্লাদারের নিকট কতকগুলি লিপি ও যুদ্ধবিষয়ক উপদেশ লইয়া রঘুনাথ যাত্রা করিলেন।

দুর্গ ত্যাগের পূর্ব্বে একবার সরযুর সহিত দেখা করিলেন; সরযু যখন মন্দিরে আসিয়াছেন, ধীরে ধীরে আপনিও তথায় গাইলেন। হৃদয়ের তুমুল উদ্বেগ কথঞ্চিৎ দমন করিয়া ঈষৎ কম্পিতস্বরে বলিলেন— “ভদ্রে! কল্য নিশিযোগে ছাদে এই কণ্ঠমালাটি পাইয়াছি, সেইটি দিতে আসিয়াছি; অপরিচিতের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।”

এই বিনীতবাক্য শুনিয়া সরযু ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন সেই কমনীয় উদার মুখমণ্ডল, সেই কেশাবৃত উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল কৃষ্ণ নয়নদ্বয়, সেই তরুণ যোদ্ধার উন্নত অবয়ব। সহসা রমণীর শরীর কম্পিত হইল, গৌর মুখমণ্ডল পুনরায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল! সরযু উত্তর দিতে অশক্ত!

সরযুকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া রঘুনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন “যদি অনুমতি করেন তবে এই সুন্দর মালাটি উহার অভ্যস্ত স্থানে স্থাপন করিয়া জীবন চরিতার্থ করি।”

সরযু সলজ্জনয়নে একবার রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, উঃ! সে বিশাল আয়ত নয়নের ক্ষণদৃষ্টিতে রঘুনাথের হৃদয় সহস্রধা বিদ্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ রঞ্জিতমুখী লজ্জায় আবার চক্ষু মুদিত করিলেন।

মৌনই সম্মতির লক্ষণ জানিয়া রঘুনাথ ধীরে ধীরে সেই কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন, কন্যার পবিত্র শরীর স্পর্শ করিলেন না।

কন্যার শরীর একেবারে রোমাঞ্চিত হইল, ও বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; ধন্যবাদ দি-বেন কি তাঁহার কম্পিত ওষ্ঠ হইতে বাক্‌-স্ফূর্ত্তি হইল না।

রঘুনাথ সরযুর এই উদ্যম দেখিয়াই আপনাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত বিবেচনা ক-রিলেন। ক্ষণেক পর ঈষৎ খেদযুক্ত স্বরে বলিলেন—"তবে অতিথিকে বিদায় দিন।"

সরযু এবার লজ্জা ও উদ্বেগ সংযম করিয়া ধীরে ধীরে রঘুনাথের দিকে চা-হিলেন ; আবার ধীরে ধীরে ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া অতি মৃদু অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, "আপনার নিকট অনুগৃহীত রহিলাম, পুনরায় কি এ দুর্গে আগমন হইবে ?"

উ! পিপাসার্ত্ত চাতকের পক্ষে প্র-থম বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায়, পথভ্রান্ত পথিকের পক্ষে ঊষার প্রথম রক্তিমচ্ছটার ন্যায়, সরযুর প্রথমোচ্চারিত এই অমৃত কথাগুলি রঘুনাথের হৃদয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত করিল। তিনি উত্তর করিলেন—

"রমণীরত্ন! আমি পরের দাস, যুদ্ধ আমার ব্যবসায়, পুনরায় কবে আসিতে পারিব, কখনও আসিতে পারিব কি না তা জানি না ; কিন্তু যতদিন জীবিত থা-কিব, যতদিন এই হৃদয় শুষ্ক না হইবে, ততদিন আপনার সৌজন্য, আপনার যত্ন, আপনার দেবনিন্দিত মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইব না। আপনার পিতা এই পথে আসিতেছেন, আমি বিদায় হইলাম, কখন কখন নিরাশ্রয় দরিদ্র সৈনিককে স্মরণ করিবেন।"

সরযু উত্তর দিতে পারিলেন না, রঘু-নাথ দেখিলেন সেই আয়ত নয়ন দুইটি ছল্‌ ছল্‌ করিতেছে ; তাঁহার আপনার নয়নও শুষ্ক ছিল না।

অচিরে দেবালয় হইতে বাহির হইলেন ও অশ্বে আরূঢ় হইয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন।

রঘুনাথের অধীনের অশ্বারোহিগণ পূর্ব্ব দিন রঘুনাথের অল্প পরে আসিয়া ছিল, সুতরাং প্রাচীরের বাহিরে তাহারা রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল। তাহারা পুনরায় আপনাদিগের অসমসাহসী ও দু-র্দ্দম তেজস্বী হাবিলদারকে পাইয়া হুঙ্কার শব্দ করিয়া উঠিল, কিন্তু সেই সরল বাল-ককে আর পাইল না। তোরণ দুর্গাগম-নের দিন হইতে রঘুনাথজীর বালোচিত চপলতা দূর হইল, মনুষ্যের চিন্তা ও প্রতি-জ্ঞায় জীবন আচ্ছন্ন হইল।

সেই দিবসেই রঘুনাথজী হাবিলদার সিংহগড় উপস্থিত হইয়া শিবজীকে সমস্ত সংবাদ জানাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শায়েস্তা খাঁ।

"কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন ?"

নবীনচন্দ্র সেন।

যদিও কএক বৎসর অবধি শিবজীর ক্ষমতা ও রাজ্য ও দুর্গসংখ্যা দিন দিন

বৃদ্ধি পাইতেছিল, তথাপি ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে বশীকরণ অভিপ্রায়ে বিশেষ কোন যত্ন করেন নাই। সেই বৎসর শায়েস্তাখাঁ আমীর উল ওমরা খেতাপ প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণের শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হয়েন, ও শিবজীকে একেবারে জয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। শায়েস্তাখাঁ সেই বৎসরেই পুনা ও চাকন দুর্গ ও অন্য কএক স্থান অধিকার করেন, ও পর বৎসর অর্থাৎ এই আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন। দিল্লীর-সম্রাটের আদেশানুসারে মাড়ওয়ারের রাজা প্রসিদ্ধনামা যশোবন্ত সিংহও এই বৎসরে (১৬৬৩ খ্রীঃ) বহু সৈন্য লইয়া শায়েস্তাখাঁর সহিত যোগ দিলেন, সুতরাং শিবজীর বিপদের সীমা ছিল না। মোগল ও রাজপুত সৈন্য পুনা নগরের নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিল ও শায়েস্তাখাঁ স্বয়ং দাদাজী কানাইদেবের গৃহে অর্থাৎ যে গৃহে শিবজী বাল্যকালে মাতার সহিত বাস করিতেন, সেই গৃহেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। শায়েস্তাখাঁ শিবজীর চতুরতা বিশেষরূপে জানিতেন সুতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে অনুমতিপত্র বিনা কোন মহারাষ্ট্রীয় পুনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। শিবজী নিকটবর্ত্তী সিংহগড় নামক এক দুর্গে সসৈন্য অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সে সময়ে যুদ্ধব্যবসায়ে অধিক পরিপক হয় নাই, দিল্লীর পুরাতন সেনার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করা কোনমতেই সম্ভব নহে; সুতরাং শিবজী চতুরতা ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষা ও হিন্দুরাজ্য বিস্তারের অন্য উপায় দেখিলেন না।

চৈত্র মাসের শেষযোগে একদিন সায়ংকালে মোগলসেনাপতি শায়েস্তাখাঁ আপন অমাত্য ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া সভায় বসিয়াছেন, ও কিরূপে শিবজীকে জয় করিবেন তাহাই পরামর্শ করিতেছেন। দাদাজী কানাইদেবের বাটীর মধ্যে সভাগৃহেই এই সভা হইয়াছিল। চারিদিকে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে; ও জানালার ভিতর দিয়া সায়ংকালের শীতলবায়ু উদ্যানের পুষ্পগন্ধ বহিয়া আনিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। আকাশ অন্ধকার, কেবল দুই একটি নক্ষত্র দেখা যাইতেছে, আমির উল ওমরা স্বয়ং ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন—

"তাহাকে পাইলে জয় করিতে কত ক্ষণ?" আনওরী নামে একজন চাটুকার বলিল "আমিরেব সেনার সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন মহাবাত্যার সম্মুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবে অথবা ভীত হইয়া পৃথিবীর ভিতর প্রবেশ করিবে।"

সেনাপতি তুষ্ট হইয়া হাস্য করিলেন।

চাঁদখাঁ নামক একজন প্রাচীন সেনা কএক বৎসর অবধি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল বিক্রম দেখিয়াছিলেন; তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন "আমি বোধ করি তাহাদের উক্ত দুইটি ক্ষমতাই আছে।"

শায়েস্তা খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

চাঁদখাঁ নিবেদন করিলেন "গত বৎসর কতিপয় পার্ব্বতীয় মহারাষ্ট্রীয় যখন চাকন দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদের সমস্ত সৈন্য দুই মাস অবধি চেষ্টা করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দুর্গ জয় করিয়াছে তাহা জঁহাপনার স্মরণ আছে; একটি দুর্গ হস্তগত করিতে সহস্র মোগলের প্রাণনাশ হইয়াছে। আবার এ বৎসর সর্ব্বস্থানে আমাদের সৈন্য থাকাতেও নিতাইজী আসমান দিয়া আহম্মদনগর ও অরঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইয়া দেশ ছারখার করিয়া আসিয়াছে।

সভাসদ্ সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, শায়েস্তাখাঁ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন—

"চাঁদখার বয়স অধিক হইয়াছে, তিনি এক্ষণে পর্ব্বত-ইন্দুরকে ভয় করেন। পূর্ব্বে তাঁহার এরূপ ভয় ছিল না।" চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রহিলেন।

আনওরী সময় বুঝিয়া বলিল "জহাঁপনা ঠিক আজ্ঞা করিয়াছেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা ইন্দুর বিশেষ, তাহারা যে পর্ব্বতইন্দুরের ন্যায় গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে তাহা আমি অস্বীকার করি না।"

শায়েস্তাখাঁ একটি বড় সুন্দর রহস্য বিবেচনা করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, সুতরাং সভাসদ্ সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল। চাটুকারেরই জয়!

চাঁদখাঁ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অস্পষ্টস্বরে বলিলেন—"ইন্দুরে পুনার ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাহির না হইলে রক্ষা।" শায়েস্তাখাঁ এ বিষয়ে উদ্বেগশূন্য ছিলেন না; কিন্তু ভয়চিহ্ন সম্বরণ করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—"এখানে দিল্লীর সহস্র সহস্র নখায়ুধ বিড়াল আছে, ইন্দুরে সহসা কিছু করিতে পারিবেন না।" সভাসদ্ সকলেই "কেরামৎ" "কেরামৎ" করিয়া সেনাপতির এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিষয়ে এইরূপ অনেক রহস্য হইলে পর কি প্রণালীতে যুদ্ধ হইবে তাহাই স্থির হইতে লাগিল। চাকন দুর্গ হস্তগত হওয়া অবধি শায়েস্তা খাঁ দুর্গ হস্তগত করা একেবারে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন "এই প্রদেশ দুর্গ পরিপূর্ণ,যদি একে একে সমস্ত দুর্গ হস্তগত করিতে হয়, তবে কত দিনে যে দিল্লীশ্বরের কার্য্যসিদ্ধি হইবে, কখনও সিদ্ধি হইবে কি না তাহার স্থিরতা নাই।" চাঁদখাঁ কার্য্যজ্ঞ ছিলেন এই ক্ষণেই অপ্রতিভ হইয়াছেন সে কথা বিস্মৃত হইয়া সৎপরামর্শ দিবার চেষ্টা করিলেন। "জহাঁপনা! দুর্গই মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল, উহারা সম্মুখ রণ করিবে না, অথবা রণে পরাস্ত হইলেও উহাদিগের ক্ষতি নাই, কেননা দেশ পর্ব্বতময়, উহাদের সেনা

এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কোন্ দিক দিয়া অন্য স্থানে উপস্থিত হইবে, আমরা তাহার উদ্দেশ পাইব না। কিন্তু দুর্গগুলি একে একে হস্তগত করিতে পারিলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবশ্যই দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।”

শায়েস্তাখাঁ চাকন দুর্গ অধিকার করিয়া অবধি আর দুর্গ জয় করিবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বলিলেন ‘কেন? মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে কি আমরা পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিব না? আমাদের কি অশ্বারোহী নাই, পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সমস্ত মহারাষ্ট্রসেনা ধ্বংস করিতে পারিবে না?’

চাঁদখাঁ পুনরায় নিবেদন করিলেন—‘যুদ্ধ হইলে অবশ্যই মোগলের জয়, ধরিতে পারিলে আমরা মহারাষ্ট্রীয়সেনা বিনাশ করিব তাহার সংশয় নাই, কিন্তু এই পর্ব্বতপ্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধরিতে পারে এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নাই। আমাদের অশ্বগুলি বৃহৎ অশ্বারোহী বর্শ্মাবৃত ও বহু-অস্ত্র-সমন্বিত; সমভূমিতে, সম্মুখক্ষেত্রে তাহাদের তেজ, তাহাদের ভার দুর্দ্দমনীয়, তাহাদের গতি অপ্রতিহত; কিন্তু এই পর্ব্বতপ্রদেশে তাহাদিগের যাতায়াতের ব্যাঘাত জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ যেন ছাগের ন্যায় তুঙ্গশৃঙ্গে লম্ফ দিয়া উঠে, ও হরিণের ন্যায় উপত্যকা ও গুহাখের মধ্য দিয়া পলায়ন করে। জাঁহাপানা! আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। সিংহগড়ে শিবজী আছেন সহসা সেই স্থান অবরোধ করুন; এক মাস কি দুই মাস কালের মধ্যে দুর্গ জয় করিব, শিবজী বন্দী হইবে, দিল্লীশ্বরের জয় হইবে। নচেৎ এ স্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের জন্য অপেক্ষা করিলে কি হইবে? তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের চেষ্টা করিলেই বা কি হইবে? দেখুন নিতাইজী অনায়াসে আমাদের নিকট দিয়া যাইয়া আহ্মদনগর ও আরঙ্গাবাদ ছারখার করিয়া আসিল, রুস্তম জমান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কি করিল?’

শায়েস্তাখাঁ সক্রোধে বলিলেন—‘রুস্তম জমান বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া নাতাজীকে পলাইতে দিয়াছে; আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। চাঁদখাঁ, তুমিও সম্মুখ যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতেছ, দিল্লীশ্বরের সেনাগণের মধ্যে সাহসী কি কেহই নাই?’

প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আবার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া এক বিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিলেন; পরে সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—‘পরামর্শ দিতে পারি এরূপ সাধ্য নাই; সেনাপতি, যুদ্ধের প্রণালী স্থির করুন, যেরূপ হুকুম হইবে, তামীল করিতে এ দাস পরাঙ্মুখ হইবে না।’

চাঁদখাঁর উৎকৃষ্ট পরামর্শ অনুসারে

কার্য্য করেন, শায়েস্তাখাঁর এরূপ সাহস ছিল না।

এই সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সমাচার দিল যে, সিংহগড়ের দূত মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। শায়েস্তাখাঁ তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে সভাগৃহে আসিবার আজ্ঞা দিলেন। সভার সকলে এই দূতকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

ক্ষণেক পরই মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ন্যায়শাস্ত্রীর বয়স এক্ষণও চত্বারিংশৎ বৎসর হয় নাই; অবয়ব মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় ঈষৎ খর্ব্ব ও কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল দীর্ঘ, নয়ন গম্ভীরবুদ্ধিব্যঞ্জক, ললাটে দীর্ঘ তিলক চন্দন, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শরীর পুরু তূলার কুর্তিতে আবৃত, সুতরাং গঠন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মস্তকে প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, এরূপ প্রকাণ্ড যে বদনমণ্ডল যেন তাহার ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে। শায়েস্তাখাঁ সাদরে দূতকে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

শায়েস্তাখাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন 'সিংহগড়ের সংবাদ কি?'

মহাদেওজী একটি সংস্কৃত শ্লোক পড়িলেন—

'সন্তি নদ্যোদণ্ডকেষু তথা পঞ্চবটীবনে।
সরযুবিচ্ছেদশোকং রাঘবস্তু কথং সহেৎ॥'

পরে তাহার অর্থ করিলেন 'দণ্ডকারণ্যে ও পঞ্চবটী বনে শত শত নদী আছে কিন্তু তাহা দেখিয়া কি রাঘব সরযু নদীর বিচ্ছেদ দুঃখ ভুলিতে পারেন? সিংহগড় প্রভৃতি শত শত দুর্গ এক্ষণও শিবজীর হস্তে আছে, কিন্তু পুনা আপনার হস্তগত, সে সন্তাপ কি তিনি ভুলিতে পারেন?'

শায়েস্তাখাঁ পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন—'হাঁ, তোমার প্রভুকে বলিও প্রধান দুর্গ আমি হস্তগত করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার যুদ্ধ করা বিফল, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিলে বরং এক্ষণও আশা আছে।'

ব্রাহ্মণ ঈষদ্ধাস্য করিয়া পুনরায় সংস্কৃত পাঠ করিলেন—

'ন শক্তোহি স্বাভিলাষং জ্ঞাপয়িতুঞ্চাতকঃ।
জ্ঞাত্বাতু তং বারিধরস্তোষয়তি যাচকং॥'

অর্থাৎ চাতক কথা কহিয়া আপন অভিলাষ মেঘকে জানাইতে পারে না, কিন্তু মেঘ আপনার দয়া বশতই সেই অভিলাষ বুঝিয়া পূর্ণ করে। মহজ্জনের যাচককে দিবার এই রীতি। প্রভু শিবজী এক্ষণে পুনা ও চাকন হারাইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতেও লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু ভবাদৃশ মহলোক তাঁহার মনের অভিলাষ জানিয়া অনুগ্রহ করিয়া যাহা দান করিবেন তাহাই শিরোধার্য্য।'

শায়েস্তাখাঁ আনন্দ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন 'পণ্ডিতজী তোতোমার পাণ্ডিত্যে আমি যে কতদূর পরি-

তুষ্ট হইলাম বলিতে পারি না; তোমাদের সংস্কৃত ভাষা কি সুমধুর ও ভাবপরিপূর্ণ। যথার্থই কি শিবজী সন্ধির ইচ্ছা করিতেছেন ?'

মহাদেও। 'খাঁ সাহেব ! সম্মুখ-যুদ্ধে দিল্লীশ্বরের সৈন্যের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা কেবল সন্ধি সন্ধি এই শব্দ করিতেছি।'

শায়েস্তাখাঁ এবার আহ্লাদ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'চাঁদ খাঁ ! সম্মুখ যুদ্ধ ভাল না দুর্গ অবরোধ ভাল, কিসে দ্বারা শত্রু অধিক ভীত হইয়াছে ?' পরে আনন্দ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া শায়েস্তাখাঁ বলিলেন,—

'ব্রাহ্মণ ! আপনার শাস্ত্রালোচনায় সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে যদি সন্ধির কথাই বলিতে আসিয়া থাকেন তবে শিবজী আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহার নিদর্শন কৈ ?'

ব্রাহ্মণ তখন গম্ভীরভাবে বস্ত্রের ভিতর হইতে নিদর্শন পত্র বাহির করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শায়েস্তাখাঁ সেইটি দেখিলেন। পরে বলিলেন—'হাঁ আমি নিদর্শন পত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে কি কি প্রস্তাব করিবার আছে করুন।'

মহাদেওজী। 'প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা যে যখন প্রথমেই আপনাদিগের জয় হইয়াছে, তখন আর যুদ্ধ করা বৃথা।

শায়েস্তাখাঁ। 'ভাল।'

মহা। 'সুতরাং সন্ধির জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছেন।'

শায়ে। 'ভাল।'

মহা। 'এক্ষণে কি কি নিয়মে দিল্লীশ্বর সন্ধি করিতে সম্মত হইবেন তাহা জানিতে তিনি উৎসুক, জানিলে সেই গুলি পালন করিতে যত্নবান্ হইবেন।'

শায়ে। 'প্রথম, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করণ। তাহাতে আপনার প্রভু স্বীকৃত আছেন ?'

মহা। 'তাঁহার সম্মতি বা অসম্মতি জানাইবার আমার অধিকার নাই; মহাশয় যে যে কথাগুলি বলিবেন তাহাই আমি তাঁহার নিকট জানাইব, তিনি সেই গুলি বিবেচনা করিয়া সম্মতি অসম্মতি পরে প্রকাশ করিবেন।'

শায়ে। 'ভাল। প্রথম কথা আমি বলিয়াছি, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করণ। দ্বিতীয়, দিল্লীশ্বরের সেনা যে যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছে তাহা দিল্লীশ্বরেরই থাকিবে। তৃতীয়, সিংহগড় প্রভৃতি আরও কএকটি দুর্গ তোমরা ছাড়িয়া দিবে।'

মহা। 'সে কোন্ কোন্‌টি।

শায়ে। 'তাহা দুই এক দিনের মধ্যে পত্রদ্বারা জানাইব। চতুর্থ, অবশিষ্ট যে যে দুর্গ ও দেশ শিবজী আপন অধীনে রাখিবেন তাহাও দিল্লীশ্বরের অধীনে জায়গীর স্বরূপ ভোগ করিবেন, তাহার জন্য কর দিতে হইবে। এইগুলি তোমার প্রভুকে জানাইও, ইহাতে তিনি সম্মত কি

অসম্মত তাহা যেন আমি দুই এক দিনের মধ্যে জানিতে পারি।'

মন্ত্রী। 'যেরূপ আদেশ করিলেন সেইরূপ করিব। এক্ষণে যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে তখন যতদিন সন্ধিস্থাপন না হয়, ততদিন যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকিতে পারে?'

শায়ে। 'কদাচ নহে। ধূর্ত্ত কপটাচারী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আমি কদাচ বিশ্বাস করি না। এমত ধূর্ত্ততা নাই যে তাহাদের অসাধ্য। যতদিন সন্ধি একেবারে স্থাপন না হয় ততদিন যুদ্ধ চলিবে, আমরা তোমাদের অনিষ্ট করিব, তোমরা পার আমাদের অনিষ্ট করিও।'

'এবমস্তু' বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। একজন মোগল প্রহরী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'দূত মহাশয় কি দেখিতেছেন?' দূত উত্তর করিলেন 'এই গৃহে প্রভু শিবজী বাল্যকালে ক্রীড়া করিতেন তাহাই দেখিতেছি; এটিও তোমাদের হস্তগত হইয়াছে, বোধ হয় একে একে সমস্ত দুর্গগুলিই তোমরা লইবে; হা! ভগবন!' প্রহরী হাস্য করিয়া বলিল 'সে জন্য আর বৃথা খেদ করিলে কি হইবে, আপন কার্য্যে যাও।' 'সে কথা সত্য' বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

ব্রাহ্মণ শীঘ্রই বহুজনাকীর্ণ পুনা নগরীর লোকের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শুভকার্য্যের দিনস্থির।

"———————নিশি দ্বিপ্রহরে
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজদ্রোহিগণ।"
নবীনচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্মণ একে একে পুনার বহু পথ অতিবাহন করিলেন; যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন সেই সেই স্থান বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দুই একটি দোকানে দ্রব্য ক্রয়ের ছলে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা বিষয় জানিলেন, পরে বাজার পার হইয়া গেলেন, প্রশস্ত রাজপথ হইতে একটি গলিতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে রজনীতে দীপ সমস্ত নির্ব্বাণ হইয়াছে, নাগরিক সকলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ আলয়ে সুপ্ত।

ব্রাহ্মণ একাকী অনেক দূর যাইলেন, আকাশ অন্ধকারময় কেবল দুই একটি তারা দেখা যাইতেছে, নাগরিক সকলে সুপ্ত, জগৎ নিস্তব্ধ। ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ হইল, তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। স্থির হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন,—কৈ সে পদশব্দ আর শুনা যায় না।

পুনরায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পর পুনরায় বোধ হইল যেন পশ্চাতে কে অনুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণের হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল হইল। এই গভীর নিশীথে কে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে? সে শত্রু না মিত্র? শত্রু হইলে কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে? উদ্বেগ পরিপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষণেক চিন্তা করিলেন; পরে নিঃশব্দে তুলা-নির্ম্মিত কুর্ত্তির আস্তিনের ভিতর হইতে একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন, একটি পথের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইলেন; গভীর অন্ধকারের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন, কৈ কেহই নাই, সকলে সুপ্ত, নগর শব্দশূন্য ও নিস্তব্ধ!

সন্দিগ্ধমনা ব্রাহ্মণ পুনরায় আলোকপূর্ণ বাজারে ফিরিয়া গেলেন; তথায় অনেক দোকান, নানাজাতীয় অনেক লোক এখনও ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, তাহার ভিতর মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। আবার তথা হইতে সহসা এক গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন, পরে দ্রুতবেগে অন্যান্য গলির ভিতর দিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। নিঃশব্দে অনেকক্ষণ শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। শব্দমাত্র নাই, চারিদিকে পথ, ঘাট, কুটীর, অট্টালিকা সমস্ত নিস্তব্ধ, নৈশ গগন গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার দ্বারা সমস্ত জগতকে আবৃত করিয়াছে! অনেকক্ষণ পর একটি চীৎকারশব্দ শ্রুত হইল; ব্রাহ্মণের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্ষণেক পর আবার সেই শব্দ হইল, মহাদেওজীর ভয় দূর হইল, সে নাগরিক প্রহরী পাহারা দিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মহাদেও যে গলিতে লুক্কায়িত ছিলেন সেই গলিতেই প্রহরী আসিল। গলি অতি সঙ্কীর্ণ, মহাদেও পুনরায় সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী ধীরে সেই স্থানে আসিল; এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সেইস্থানে আসিল; মহাদেও যেস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন সেই দিকে চাহিল। উঃ মহাদেবের হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল, তিনি শ্বাস রুদ্ধ করিয়া হস্তে সেই ছুরিকা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না; ধীরে সে পথ হইতে চলিয়া গেল। মহাদেও ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির হইয়া ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন।

পরে নিকটবর্ত্তী একটি দ্বারে আঘাত করিলেন; শায়েস্তাখাঁর এক জন মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক বাহির হইয়া আসিল, দুই জনে অতি সঙ্গোপনে নগরের মধ্যে অতি গোপনীয় ও মনুষ্যের অগম্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দুই জনে উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন 'সমস্ত প্রস্তুত?'

সৈনিক। 'প্রস্তুত।'

ব্রাহ্মণ। 'অনুমতিপত্র পাইয়াছ?'

সৈনিক। 'পাইয়াছি।'

আবার অস্পষ্ট পদশব্দ শ্রুত হইল। মহাদেওজী এবার ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া ছুরিকাহস্তে সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন; অন্ধকারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না। ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে সৈনিককে বলিলেন 'রিক্তহস্তে আসিয়াছ?'

সৈনিক বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইল। ব্রাহ্মণ বলিল 'ভাল। সতর্ক থাকিও। বিবাহ কবে?'

সৈনিক। 'কল্য।'

ব্রাহ্মণ। 'অনুমতি পাইয়াছ?'

সৈনিক। 'হাঁ' একটি কাগজ দেখাইল।

ব্রাহ্মণ। 'কত জন লোকের?'

সৈনিক। 'বাদ্যকর দশ জন, ও অস্ত্রধারী ত্রিশ জন ইহার অধিক অনুমতি পাইলাম না।'

ব্রাহ্মণ। 'এই যথেষ্ট, কোন সময়ে?'

সৈনিক। 'রজনী এক প্রহর!'

ব্রাহ্মণ। 'ভাল। এই দিক হইতে বরযাত্রা আরম্ভ হইবে।'

সৈনিক। 'স্মরণ আছে।'

ব্রাহ্মণ। 'বাদ্যকরেরা সজোরে বাদ্য করিবে।'

সৈনিক। 'স্মরণ আছে।'

ব্রাহ্মণ। 'জ্ঞাতি কুটুম্ব যত পারিবে জড় করিবে।'

সৈনিক। 'স্মরণ আছে।'

ব্রাহ্মণ তখন অল্প হাস্য করিয়া বলিলেন 'আমরাও শুভকার্য্যে যোগ দিব, সে শুভকার্য্যের ঘটা সমস্ত ভারতবর্ষে রাষ্ট্র হইবে।'

সহসা একটি সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর আসিয়া ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে লাগিল; সে তীরে প্রাণনাশ নিশ্চয় সম্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণের কুর্ত্তির নীচে লৌহ-বর্ম্মে লাগিয়া তীর খণ্ড খণ্ড হইল।

তৎপরেই একটি বর্শা। বর্শার ভীষণ আঘাতে ব্রাহ্মণ ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম ভিন্ন হইল না, মহাদেও পুনরায় উঠিলেন। সম্মুখে দেখিলেন নিষ্কোষিত অসিহস্তে একজন দীর্ঘ মোগল যোদ্ধা,—তিনি চাঁদখাঁ।

অদ্য সভাতে সেনাপতি শায়েস্তাখাঁ চাঁদখাঁকে ভীরু বলিয়াছেন। যুদ্ধব্যবসায় চাঁদখাঁর কেশ শুক্ল হইয়াছিল, সম্মুখযুদ্ধ বিনা তিনি কখনও পলায়ন জানিতেন না, এ অপবাদ কখন কেহ তাঁহাকে দেয় নাই।

মনে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন, অন্যকে তাহা কি জানাইবেন, মনে স্থির করিলেন কার্য্য দ্বারা এ অপবাদ দূর করিব, নচেৎ এই যুদ্ধেই এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ দান করিব।

ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি শিবজীকে বিশেষ করিয়া জানিতেন, শিজবীর অসাধা-

রণ ক্ষমতা, তাঁহার বহুসংখ্যক দুর্গ, তাঁহার অপূর্ব্ব ও দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনা, তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা, হিন্দুরাজ্য স্থাপনে অভিলাষ, হিন্দুস্বাধীনতাসাধনে প্রতিজ্ঞা, এ সমস্ত চাঁদখাঁর নিকট অগোচর ছিল না। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ প্রারম্ভেই যে শিবজী পরাজয় স্বীকার ও সন্ধি যাচ্ঞা করিবেন এরূপ সম্ভব নহে, তথাপি এ ব্রাহ্মণ শিবজীর নিদর্শন পত্র দেখাইয়াছে। এ ব্রাহ্মণ কে ? ইহার গুপ্ত অভিসন্ধিই বা কি ?

ব্রাহ্মণের কথাগুলিতেও চাঁদখাঁর সন্দেহ জন্মিয়াছিল, মহারাষ্ট্রের নিন্দা শুনিয়া যখন ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হয় তাহাও তিনি দেখিয়াছিলেন। এ সমস্ত সন্দেহের কথা শায়েস্তাখাঁর নিকট বলেন নাই, সত্য বলিয়া কেন আবার তিরস্কার সহ্য করিবেন, কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন এই ভণ্ড দূতকে ধরিব। সেই অবধি দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, পথে পথে, গলিতে গলিতে অদৃশ্যভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও ব্রাহ্মণ চাঁদখাঁর নয়নবহির্ভূত হইতে পারেন নাই।

সৈনিকের সহিত ব্রাহ্মণের যে কথা হয় তাহা শুনিলেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা তখনই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এই দূতকে বিনাশ করিয়া সৈনিক সেনাপতিসদনে লইয়া যাইয়া প্রতিপত্তি লাভের সঙ্কল্প করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন ‘ শায়েস্তা খাঁ ! যুদ্ধব্যবসায় বৃথা এ কেশ শুক্ল করি নাই, আমি ভীরুও নহি, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারীও নহি ; অদ্য যে ষড়যন্ত্রটি ধরিয়া প্রকাশ করিয়া দিব তাহার পর বোধ হয় এ প্রাচীন দাসের কথা অবহেলা করিবে না। ’ কিন্তু আশা মায়াবিনী।

মহাদেওজী ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতে চাঁদখাঁ তীর ও বর্শা ব্যর্থ দেখিয়া লম্ফ দিয়া তাঁহার উপর আসিয়া পড়িলেন ও খড়্গ দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন। আশ্চর্য্য বর্ম্মে লাগিয়া সে খড়্গ প্রতিহত হইল।

“ কুক্ষণে আমার অনুসরণ করিয়াছিলে ” বলিয়া মহাদেওজী আপন আস্তীন গুটাইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন।

নিমেষমধ্যে বজ্রমুষ্টি চাঁদখাঁর বক্ষঃস্থলে অবতীর্ণ হইল,—চাঁদখাঁর মৃতদেহ ধরাতলশায়ী হইল।

ব্রাহ্মণ সূক্ষ্ম অধরোষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ধীরে ধীরে সেই ছুরিকা পুনরায় লুকাইয়া বলিলেন—

“ শায়েস্তাখাঁ ! মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা করার এই প্রথম ফল, ভবানীর কল্যাণে দ্বিতীয় ফল কল্য ফলিবে। ”

শায়েস্তাখাঁ ! অন্যায় তিরস্কারে অদ্য যে অমূল্য বীর রত্নটিকে হারাইলে, বিপদের সময় তাহাকে স্মরণ করিবে কিন্তু আর পাইবে না।

যোদ্ধার কর্ত্তব্যকার্য্যে যে সময়ে চাঁদ-খাঁ জীবন দান করিলেন, সেনাপতি শা-েয়স্তাখাঁ সে সময়ে বড় সুখে নিদ্রা যাই-তেছিলেন, শিবজীকে বশীকরণ বিষয়ে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক এই সমস্ত ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া বলিল 'প্রভু কি করিলেন? কল্য এ বিষয়ে গোল হইবে, আমাদের স-মুদায় সঙ্কল্প বৃথা হইবে।'

ব্রাহ্মণ। 'কিছুমাত্র বৃথা হইবে না। আমি জানিয়াছি চাঁদখাঁ অদ্য সভায় অ-পমানিত হইয়াছেন, এখন কএক দিন সভায় না যাইলেও কেহ সন্দেহ করিবে না। এই মৃতদেহ ঐ গভীর কূপে নি-ক্ষেপ কর, আর স্মরণ রাখিও কল্য র-জনী এক প্রহরকালে "—

সৈনিক। "রজনী একপ্রহরকালে।"

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনানগর ত্যাগ ক-রিলেন। তিন চারি স্থানে প্রহরিগণ তাঁ-হাকে ধরিল, তিনি শায়েস্তাখাঁর স্বাক্ষরিত অনুমতি পত্র দেখাইলেন, ও নিরাপদে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজা যশোবন্ত সিংহ।

" কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পর পর সদা।"

মধুসূদন দত্ত।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় রাজপুত রাজা যশোবন্ত সিংহ একাকী শিবিরে বসিয়া রহিয়াছেন; হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া এই গভীর নিশীথেও কি চিন্তা করিতেছেন, সম্মুখে কেবল একটি মাত্র দীপ জ্বলি-তেছে, শিবিরে অন্য লোক মাত্র নাই।

সংবাদ আসিল মহারাষ্ট্রীয় দূত সা-ক্ষাত করিতে আসিয়াছেন। যশোবন্ত তাঁহাকে আনয়ন করিতে কহিলেন, তাঁ-হারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী শিবিরে আ-সিলেন, যশোবন্ত তাঁহাকে সাদরে আ-হ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলি-লেন। উভয়ে উপবেশন করিলেন।

ক্ষণেক যশোবন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহি-লেন, কি গভীর চিন্তা করিতেছিলেন। মহাদেও নিঃশব্দে রাজপুতের দিকে সু-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতেছিলেন।

পরে যশোবন্ত বলিলেন 'আমি আ-পনার প্রভুর পত্র পাইয়াছি। তাহাতে যাহা লিখিত আছে অবগত হইয়াছি, তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাব আছে?

মহা। 'প্রভু আমাকে কোন প্র-স্তাব করিতে পাঠান নাই, খেদ করিতে পাঠাইয়াছেন।'

যশো। 'কেবল পুনা ও চাকান দুর্গ আমা-দের হস্তগত হইয়াছে মাত্র, এইজন্য খেদ?'

মহা। 'দুর্গনাশে তিনি ক্ষুব্ধ নহেন, তাঁহার অসংখ্য দুর্গ আছে।'

যশো। 'মোগল-যুদ্ধস্বরূপ বিপদে পড়িয়া তিনি খেদ করিতেছেন।'

মহা। 'বিপদে পড়িলে খেদ করা তাঁর অভ্যাস নাই।'

যশো। 'তবে কি জন্য খেদ করিতেছেন?'

মহা। 'যিনি হিন্দুরাজ-তিলক, যিনি ক্ষত্রিয়কুলাবতংশ, যিনি সনাতন ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহাকে অদ্য ম্লেচ্ছের দাস দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।'

যশোবন্তের মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হইল; মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন;—

'উদয়পুরের প্রতাপরাণার বংশে যিনি বিবাহ করিয়াছেন, মাড়ওয়ারের রাজচ্ছত্র যাঁহার মস্তকের উপর ধৃত হইয়াছে, রাজস্থান যাঁহার সুখ্যাতিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সিপ্রাতীরে যাঁহার বাহুবিক্রম দেখিয়া আরংজীব ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ যাঁহাকে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ জ্ঞান করে, দেশে দেশে,গ্রামে গ্রামে, মন্দিরে মন্দিরে যাঁহার জয়ের জন্য হিন্দুমাত্রেই, ব্রাহ্মণমাত্রেই, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, অদ্য তাঁহাকে মুসলমানের পক্ষ হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। রাজন্। আমি সামান্য দূতমাত্র, আমি কি বলিতেছি জানি না, অপরাধ হইলে মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু এ যুদ্ধসজ্জা কেন? এ সৈন্যসামন্ত কেন? এ সমস্ত বিজয়পতাকা কি জন্য উড্ডীন হইতেছে? স্বাধিকার বৃদ্ধি করিবার জন্য? হিন্দু স্বাধীনতা স্থাপন করিবার জন্য? ক্ষত্রোচিত যশোলাভের জন? আপনি ক্ষত্রকুলর্ষভ! আপনি বিবেচনা করুন; আমি জানি না।'

যশোবন্ত অধোবদনে রহিলেন। মহাদেও আরও বলিতে লাগিলেন—

'আপনি রাজপুত! মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুত-পুত্র; পিতা পুত্রে যুদ্ধ সম্ভবে না। আপনার সহিত প্রভুর যুদ্ধ সম্ভবে না; স্বয়ং ভবানী এ যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন। আপনি আজ্ঞা করুন আমরা পালন করিব। রাজপুতের গৌরবই অনাথ ভারতবর্ষের একমাত্র গৌরব। রাজপুতের যশোগীত আমাদের রমণীগণ এখনও গাইয়া থাকে, রাজপুতদিগের উদাহরণ দেখিয়া আমাদের বালকগণ শিক্ষিত হয়, সে রাজপুতের সহিত যুদ্ধ! ক্ষত্রকুলতিলক! রাজপুত শোণিতে আমাদিগের খড়্গ রঞ্জিত হইবার পূর্ব্বে যেন মহারাষ্ট্র নাম বিলুপ্ত হয়, রাজ্য বিলুপ্ত হয়, আমরা যেন বর্শা ও খড়্গ ত্যাগ করিয়া পুনরায় লাঙ্গল ধারণ করিতে শিখি!'

যশোবন্ত সিংহ তখন নয়ন উঠাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন 'দূতপ্রধান! তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট; কিন্তু আমি দিল্লীশ্বরের অধীন, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ

করিব বলিয়া আসিয়াছি, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব—'

'এবং শত শত স্বধর্ম্মীকে নাশ করিবেন, হিন্দু হিন্দুর মস্তক ছেদন করিবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বক্ষে ছুরিকা বসাইবে, ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোতে ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোত মিশাইবে, শেষে ম্লেচ্ছ সম্রাটের সম্পূর্ণ জয় হইবে।' ঈষৎ ব্যঙ্গভাবে দূত এই কথা বলিলেন।

যশোবন্তের মুখ আরক্ত হইল, কিন্তু উদ্বেগ সম্বরণ করিয়া কিঞ্চিৎ কর্কশভাবে বলিলেন—

'কেবল দিল্লীশ্বরের জয়ের জন্য যুদ্ধ নহে;—আমি তোমার প্রভুর সহিত কিরূপে মিত্রতা করিব? শিবজী বিদ্রোহাচারী, চতুর শিবজী অদ্যের অঙ্গীকার অনায়াসে কল্য ভঙ্গ করে।'

এবার ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন 'মহারাজ। সাবধান, অলীক নিন্দা আপনার সাজে না। শিবজী কবে হিন্দুর নিকট যে বাক্য দান করিয়াছেন তাহার অন্যথা করিয়াছেন? কবে ব্রাহ্মণের নিকট যে পণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? দেশে শত শত গ্রাম, শত শত দেবালয় আছে; অনুসন্ধান করুন, শিবজী সত্য পালন করিতে, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিতে, হিন্দুর উপকার করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, হিন্দুদেবের পূজা দিতে কবে পরাঙ্মুখ? তবে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ! জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে কবে কোন্ দেশে সখ্যতা? বজ্রনখ যখন সর্পকে ধারণ করে সর্প সে সময় মৃতবৎ হইয়া থাকে, মৃত বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র জর্জ্জরিত-শরীর নাগরাজ সময় পাইয়া দংশন করে, এটি বিদ্রোহাচরণ নয়, এটি স্বভাবের রীতি। কুক্কুর যখন খরগোশকে ধরিবার চেষ্টা করে, খরগোশ প্রাণরক্ষার জন্য কত যত্ন করে, একদিকে পলাইবার উদ্যোগ করিয়া সহসা অন্যদিকে যায়, এটি চাতুরী না স্বভাবের রীতি? দেখুন, যাবতীয় জীব জন্তু দিগকে জগদীশ্বর যে প্রাণরক্ষার যত্ন ও উপায় শিখাইয়াছেন, মনুষ্যকে কি সে উপায় শিখান নাই? আমাদের প্রাণের প্রাণ,জীবনের জীবন স্বরূপ স্বাধীনতা যে মুসলমানেরা শত শত বৎসর অবধি শোষণ করিতেছে, হৃদয়ের শোণিত স্বরূপ বল, মান, দেশ-গৌরব, জাত্যভিমান শোষণ করিতেছে, ধর্ম্ম বিনাশ করিতেছে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সখ্যতা ও সভ্যসম্বন্ধ? তাহাদিগের নিকট হইতে যে উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি, স্বধর্ম্ম ও জাতি-গৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরতা, সে উপায় কি নিন্দনীয়? জীবনরক্ষার্থ পলায়ন-পটু মৃগের শীঘ্রগতি কি বিদ্রোহ? শাবককে বাঁচাইবার জন্য পক্ষী যে অপহারককে অন্যদিকে লইয়া যাইতে

যত্ন করে, সেটি কি নিন্দনীয়? ক্ষত্রিয়-রাজ! দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুসলমান-দিগের নিকট মহারাষ্ট্রীয় চতুরতার নিন্দা শুনিতে পাই, কিন্তু হিন্দুপ্রবর! আপনি হিন্দুজীবন রক্ষার একমাত্র উপায়কে নিন্দা করিবেন না, শিবজীকে নিন্দা করিবেন না।' মহাদেওয়ের জ্বলন্ত নয়নদ্বয় জলে আবৃত হইল।

ব্রাহ্মণের চক্ষে জল দেখিয়া যশোবন্ত হৃদয়ে বেদনা পাইলেন। বলিলেন 'দূত-প্রবর! আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি নাই, যদি অন্যায় বলিয়া থাকি মার্জ্জনা করিবেন। আমি কেবল এই মাত্র বলি-তেছিলাম যে দেখুন রাজপুতগণও স্বাধী-নতা রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা সা-হস ও সম্মুখ রণ ভিন্ন অন্য উপায় জানেন না। মহারাষ্ট্রীয়েরাও কি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সেইরূপ ফললাভ করিতে পারে না?'

মহা। 'মহারাজ! রাজপুতদিগের পুরাতন স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, দুর্গম পর্ব্বত বা মরুবেষ্টিত দেশ আছে, সুন্দর রাজধানী আছে, সহস্র বৎ-সরের অপূর্ব্ব রণশিক্ষা আছে, মহারাষ্ট্রীয়-দিগের ইহার কোন্‌টি আছে? তাহারা দরিদ্র, তাহারা চিরপরাধীন, তাহাদের এই প্রথম রণ-শিক্ষা। আপনাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আপনাদের পুরাতন রী-ত্যনুসারে যুদ্ধ দেন, পুরাতন দুর্দ্ধর্ষ তেজ ও বিক্রম প্রকাশ করেন, অসংখ্য রাজ-পুত সেনার সম্মুখে দিল্লীশ্বরের সেনা স-রিয়া যায়। আমাদের দেশ আক্রমণ ক-রিলে আমরা কি করিব? পূর্ব্বরীতি বা রণশিক্ষা নাই, অসংখ্য সৈন্য নাই, যাহারা আছে তাহারা প্রত্যুত রণ দেখে নাই! যখন দিল্লীশ্বর কাবুল, পঞ্জাব, অযোধ্যা, বিহার, মালব, বীরপ্রসবিনী রাজস্থান ভূমি হইতে সহস্র সহস্র পুরাতন রণদর্শী যোদ্ধা প্রেরণ করেন, যখন অপরূপ বৃহৎ অনিবার্য্য রণ-অশ্ব ও রণ-গজ প্রেরণ ক-রেন, যখন তাঁহার কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলা, রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা, সহস্র সহস্র শকটে আনিয়া রাশীকৃত করেন, তখন দ-রিদ্র মহারাষ্ট্রীয়েরা কি করিবে? তাহা-দিগের সেরূপ অসংখ্য যুদ্ধদর্শী সেনা নাই, সেরূপ অশ্ব গজ নাই, সেরূপ বিপুল অর্থ নাই, চতুরতা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? ত্বরিত-গতি ও পর্ব্বত-যুদ্ধ ভিন্ন তাহাদের আর কি উপায় আছে? ক্ষত্রিয়রাজ! জীবন-প্রারম্ভে দরিদ্রজাতির এইরূপ আ-চরণ ভিন্ন উপায় নাই। জগদীশ্বর করুন মহারাষ্ট্রীয় জাতি দীর্ঘজীবী হউক, তাহা-দিগের অর্থ ও যুদ্ধায়োজনের উপায় সং-স্থান হইলে, দুই তিনশত বৎসরের রণ-শিক্ষা হইলে, তাহারাও রাজপুতের অ-সাধারণ গুণ অনুকরণ করিবে।'

এই সমস্ত কথা শুনিয়া যশোবন্ত চি-ন্তায় অভিভূত হইয়া রহিলেন, হস্তে ললাট স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহাদেও দেখিলেন তাঁহার

বাক্যগুলি নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই,আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

'আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, হিন্দুগৌরবসাধনে সন্দেহ করিতেছেন কেন? হিন্দুধর্ম্মের জয় অবশ্যই আপনি ইচ্ছা করেন, শিবজীরও ইহা ভিন্ন অন্য ইচ্ছা নাই। মুসলমান শাসন ধ্বংস করণ, হিন্দুজাতির গৌরব সাধন, স্থানে স্থানে দেবালয় স্থাপন, সনাতন ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধি, হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান, গোবৎসাদি রক্ষা করণ, ইহা ভিন্ন শিবজীর অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই বিষয়ে যদি তাঁহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হয়েন তবে স্বহস্তে এই কার্য্য সাধন করুন। আপনি এই দেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন, মুসলমানদিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করুন। আদেশ করুন দুর্গের দ্বার এইক্ষণেই উদ্ঘাটিত হইবে, প্রজারা আপনাকে কর দিবে, আপনি শিবজী অপেক্ষা সহস্রগুণে বলবান্, সহস্রগুণ দূরদর্শী,সহস্রগুণ উপযুক্ত,শিবজী সন্তুষ্টচিত্তে আপনার একজন সেনাপতি হইয়া মুসলমানদিগের ধ্বংস সাধন করিবেন। তাঁহার অন্য বাসনা নাই।'

এই প্রস্তাবে উচ্চাভিলাষী যশোবন্তের নয়ন যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন 'মাড়য়ার ও মহারাষ্ট্র অনেক দূর, এক রাজার অধীন থাকিতে পারে না।'

মহাদেও। 'তবে আপনার উপযুক্ত পুত্র থাকিলে তাঁহাকে এই রাজ্য দিন, নচেৎ কোন আত্মীয় যোদ্ধাকে দিন। শিবজী ক্ষত্রিয় রাজার অধীনে কার্য্য করিবেন, কিন্তু কদাচ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিবেন না।'

যশোবন্ত আবার চিন্তা করিয়া বলিলেন—'এই বিপদকালে, আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া এদেশ রাখিতে পারিবে এমন আত্মীয় নাই।'

মহাদেও। 'কোন ক্ষত্রিয় সেনাপতিকে নিযুক্ত করুন, হিন্দুধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা হইলে শিবজীর মনস্কামনা পূর্ণ হইবে; শিবজী সানন্দচিত্তে রাজ্যপরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন।'

যশো। 'সেরূপ সেনাপতিও নাই।'

মহা। 'তবে যিনি এই মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন তাঁহাকে সাহায্য করুন। আপনার সাহায্যে, আপনার আশীর্ব্বাদে, শিবজী অবশ্যই স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের গৌরব সাধন করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয়রাজ! ক্ষত্রযোদ্ধাকে সহায়তা করুন,ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই, আকাশে এরূপ দেবতা নাই যিনি আপনাকে এজন্য প্রশংসাবাদ না করিবেন।'

যশোবন্ত ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'দ্বিজবর, তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু দিল্লীশ্বর আমাকে স্নেহ করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি কিরূপে অন্যরূপ আচরণ করিব? সে কি ক্ষত্রোচিত?

মহা। 'দিল্লীশ্বর যে হিন্দুদিগের কাফের বলিয়া জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছেন সে কার্য্য কি ভদ্রোচিত? দেশে দেশে যে হিন্দুপূজক, হিন্দুমন্দির, হিন্দুদেবালয়ের অবমাননা করিতেছেন সে কি ভদ্রোচিত? কাশীর পুরাতন মন্দির চূর্ণ করিয়া সেই প্রস্তর দ্বারা সেই পুণ্যধামে মসজীদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সে কি ভদ্রোচিত?'

ক্রোধকম্পিতস্বরে যশোবন্ত বলিলেন—'দ্বিজবর! দ্বিজবর! আর বলিবেন না, যথেষ্ট বলিয়াছেন। অদ্যাবধি শিবজী আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র। রাজপুতের প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হয় না, অদ্যাবধি শিবজীর পণ ও আমার পণ এক, শিবজীর চেষ্টা ও আমার চেষ্টা অভিন্ন। সেই হিন্দুবিরোধী দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে এত দিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন সে মহাত্মা কোথায়? একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করি।'

মহারাষ্ট্রীর দূত ঈষৎ হাস্য করিয়া যশোবন্তের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া যাইয়া একটি কথা কহিলেন। শুনিবা মাত্র যশোবন্ত একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন, চকিতের ন্যায় ক্ষণেক নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন, বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে দূতের দিকে দেখিতে লাগিলেন, পরে সাহ্লাদে ও সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে গোপনে, অতি মৃদুস্বরে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর মহাদেও বলিলেন 'মহারাজ, অনুগ্রহ করিয়া কল্য কোন ছলে পুনা হইতে কএক ক্রোশ দূরে থাকিলে ভাল হয়।'

যশো। 'কেন? কল্য পুনা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে?'

দূত। হাস্য করিয়া বলিল 'না, একটি বিবাহ কার্য্য সম্পাদন হইবে, মহারাজ থাকিলে শুভকার্য্যে ব্যাঘাত হইতে পারে।'

যশোবন্ত বুঝিয়া বলিলেন 'ভাল, দূরেই থাকিব।' দূত বিদায় যাচ্ঞা করিলেন। যশোবন্ত ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন—

'ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয়ের বোধ হয় অনেক দিন পাঠ সমাপন হইয়া থাকিবে; এক্ষণে স্মরণ আছে কি না?'

মহা। তথাপি যে বিদ্যা আছে তাহাতে দিল্লীর সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ বিস্মিত হইয়াছেন।'

যশোবন্ত দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইলেন, পরে বিদায়ের সময় বলিলেন 'তবে যুদ্ধ বিষয়ে যেরূপ কথোপকথন হইল সেইরূপ কার্য্য করিবেন।'

মহা। 'সেইরূপ কার্য্য করিবার জন্য প্রভু শিবজীকে বলিব।'

যশো। 'হাঁ বিস্মরণ হইয়াছিলাম, সেই রূপ কার্য্য করিতে তোমার প্রভুকে

বলিও।' হাসিতে হাসিতে শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

যশোবন্তের এক জন বিশ্বস্ত অমাত্য অল্পক্ষণ পরে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'আপনার শিবির হইতে এই মাত্র এক জন অশ্বারোহী সিংহগড় প্রমুখে যাইলেন, উনি কে?'

যশোবন্ত উত্তর করিলেন, 'উনি হিন্দুজাতির আশাস্বরূপ, হিন্দুধর্ম্মের প্রহরী।'

(প্রাপ্ত)

ভারতের প্রজানীতি।

ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে উদীচ্য ভাষা সমূহে যে সকল সংবাদ পত্র, পুস্তক ও পত্রিকাদি মুদ্রিত হয় বা হইবে, তাহার সুশাসন জন্য সংপ্রতি রাজপুরুষগণ যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা লইয়া ভারতের সর্ব্বত্র তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। ব্যবস্থার সম্ভাবিত কার্য্যকারিতা এখনও পরিচারিত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রবর্ত্তনাতেই আশঙ্কার তরঙ্গাভিঘাত আরব্ধ হইয়াছে; ইহার প্রকৃতি ও পরিণাম বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনোযোগ বিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা এই নিমিত্ত মনন করিয়াছি, এই উপলক্ষে আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সমালোচন করিয়া, বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থার স্বরূপগত বিচার করিব।

রাজার গৌরব রাজার ভাষায় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; রাজার শরীর অলংঘ্য এবং পবিত্র; সুতরাং রাজভাষাও নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থাতেও এই সূত্রের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে; ইংরেজরাজ বলিয়া দিয়াছেন, যে ইংরেজীতে যে ব্যক্তি মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ, তাহার অভিপ্রায়গত সাধুতার, তাহার নীতিগত সুশিক্ষার এবং তাহার ধর্ম্মবুদ্ধিসঙ্গত বিজ্ঞতার অন্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। সে যে কথা বলে, তাহাতে ভ্রান্তি থাকিলেও সে ভাল মন্দ বিচার করিয়া বলিয়াছে, ইহা বুঝা যায়; যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলে, সেও সে কথার ভাল মন্দ বিচার করিয়া লইতে জানে। সেই জন্য ইংরেজীতে ভ্রম মার্জ্জনীয়, কারণ সংশোধনের সম্ভাবনা আছে।

এই নিয়মের ফলে, ১৫ মার্চ্চের পরে দেশীয় ভাষায় যে সকল পত্রাদি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে রাজনীতি বা রাজব্যবস্থা সম্বন্ধে আর সে পূর্ব্বের মত বাক্যের পরিস্ফুটতা নাই। কিন্তু নিপীড়িত ক্রোধের কম্পে, ক্ষোভের দীর্ঘনিশ্বাসে, শঙ্কার সংকোচে, দ্বিগুণিত অন্তর্দাহের প্র-

মাণ সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। মুদ্রণ স্বাধীনতার লোপ হইল বলিয়া মুদ্রিতাক্ষরে ভারতীয় লেখক যাহা প্রকাশ করিতেছেন না, ভারতবাসীর সভায়, ভারতবাসীর প্রমোদ-মন্দিরে, যানে, পাদচারে, আলাপে, প্রলাপে, হাস্যে পরিহাসে, সেই অসন্তোষ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া বিচরণ করিতেছে। কাগজের কথা এখন মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ফলে, এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই সমস্তই ভারতবাসীর একতম সম্প্রদায় নিবদ্ধ। সাম্প্রদায়িকদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়, তাহা আমরা জানি; পাশ্চাত্য শিক্ষায় যাঁহাদের হৃদয়-বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, যাঁহাদের চিন্তবলের বিকাশ হইয়াছে, জন্মভূমি ও মাতৃভাষার নামে যাঁহাদের অন্তঃকরণ তরঙ্গায়িত হয়, তাঁহাদের অনেকেই এ সম্প্রদায় ভুক্ত, তাহাও আমরা জানি। তথাপি সবিনয়ে, অথচ নিঃসঙ্কোচে আমরা বলিতেছি, যে এই দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আমরা বিশেষ বা সামান্য কোন প্রকার গৌরবের বিষয় বিবেচনা করি না। আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব, তাহার জন্য স্পষ্টাক্ষরে একথা ব্যক্ত করিয়া রাখা আবশ্যক।

যাঁহারা এই সম্প্রদায়ের অধিনায়ক, তাঁহারা ভারতবর্ষের দুঃখে নিরন্তর ব্যথিত। ভারতবর্ষে বিজাতীয়, বিদেশীয় রাজা আধিপত্য করিতেছে, ভারতবর্ষের রাজস্বে বিদেশীর দেহ পুষ্ট হইতেছে, ভারতবর্ষে বিজাতির রীতি নীতি, ভারতবাসীর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবর্ত্তিত হইতেছে,—এই ইহাঁদের দুঃখ। স্থূল কথা, ভারতবর্ষ স্বাধীন নহে,—তাহাতেই ইহাঁদের অসন্তোষ। এ অসন্তোষের অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করে না; যে ব্যবস্থার উপলক্ষে আমরা এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছি, তাহার উপস্থাপন সময়ে মন্ত্রণাবিশারদ ব্যবস্থাপকবর্গ এই অসন্তোষের উপরেই ব্যবস্থার ভিত্তি পত্তন করা হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং এই অসন্তোষের বিস্তার অনিষ্টকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই অসন্তোষ ন্যায় ও যুক্তিমূলক কি না, এই স্বাধীনতাস্পৃহা অনুমোদনীয় কি না, প্রথমতঃ তাহারই বিচার করা আবশ্যক।

স্বাধীনতা ও স্বৈরাচারে অল্পই প্রভেদ। মনুষ্যের নিকট যাহার জবাবদিহি করিতে হয় না, এইরূপ দায়শূন্য নবাবও যদি নিজের অর্থের সার্থকতা করিতেছি মনে করিয়া অতি সুখাদ্য সামগ্রী বা অত্যুপাদেয় পানীয়ে অমিত আসক্তি দ্বারা স্বীয় স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত করেন, তাঁহাকেও আমরা দোষ দিয়া থাকি; কারণ, তিনি স্বৈরাচার-পরায়ণ। অথচ এই দোষ দেওয়াতে, এই নিন্দা করাতে আমাদের যে অনধিকার চর্চ্চা করা হয়, তাহা নহে। সমাজভুক্ত ব্যক্তি মাত্রেই সমাজের নিকট নীতিমূলক দায়ে আবদ্ধ, সেই জন্যই আ-

মরা নবাবের নিন্দাবাদ করি; তাঁহার বুভুক্ষা বা পিপাসার শান্তি করণ বিষয়ে তাঁহার স্বাধীনতা থাকিলেও সেই স্বাধীনতার অপপ্রযোগ বা অতি প্রয়োগে আমরা আমাদের সেই নিন্দা করিবার ক্ষমতার পরিচালন করি; সাধ্য থাকিলে সেরূপ স্থলে শাসন করিতেও ত্রুটি করিতাম না, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার শরীর লইয়া আত্মতৃপ্তি সাধন বিষয়ে এত বাধা;—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহাতে কাহারই ক্ষতি হয় না ও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, তথাপি সমাজনীতির এই আক্রোশ। এমত অবস্থায় রাজনৈতিক সমাজের বন্ধন যে ইহা অপেক্ষা দৃঢ়তর হইবে, তাহা বিচিত্র কি ?

রাজনৈতিক সমাজের মূলসূত্র,—অধীনতা। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারের কিয়দংশ করিয়া রাজার হস্তে ন্যস্ত করাতেই রাজনৈতিক সমাজের স্থিতি। কিন্তু সেই অংশের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। ক্ষেত্র বুঝিয়া, সময় বুঝিয়া ইহা তাবৎ কালের নিমিত্ত নিরুপিত হইয়া থাকে। এই অধীনতাই আমাদের মঙ্গলের কারণ; এই রাজা প্রজা সম্বন্ধের উপরে সামাজিক উন্নতির নির্ভর। সভ্য সমাজের প্রজাগণ শারীরিক ও বৈষয়িক সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিয়া, কাব্য, সঙ্গীত এবং চিত্রবিদ্যাদির আলোচনায় যে অন্তর্জগতের উন্নতি ও স্বাস্থ্যসাধনের অবসর পাইয়া থাকে, এই অধীনতাই তাহার মূল্য স্বরূপ। সুতরাং সমাজে যাহাকে স্বাধীনতা বলি, তাহা স্বেচ্ছাচার হইতে বিভিন্ন; বস্তুতঃ তাহা অধীনতারই এক প্রকার ফল। কেবল নিয়ম ও নিয়মকর্ত্তা কথঞ্চিৎ স্বাধীন; তদ্ভিন্ন সকলেই সেই নিয়মের এবং যাহার হস্তে সেই নিয়ম বলবৎ করিবার ভার দেওয়া হয়, তাহার অধীন। ইউরোপ ও ইউরোপের মন্ত্রদীক্ষিত আমেরিকা এই সকল তত্ত্বের আদর ও গৌরব বুঝিয়াছে, শাসনের সুখ সেখানে জানে; সেখানে প্রজায় যাহা কিছু করে, সেই শাসনের উৎকর্ষ চেষ্টাতেই তাহা করে, সুতরাং তত্তৎ দেশে সভ্যতা, বিদ্যা এবং ধনশালিতার বিস্ময়কর বৃদ্ধি।

ভারতবর্ষের অবস্থা অন্যরূপ। ভারতবর্ষ কোন্ কালে এক সাম্রাজ্য ছিল, ইতিহাসেরও তাহা মনে নাই। এখনকার ভারতবর্ষ দেখিয়া যাহা মনে হয়, তাহাতে মস্তক ঘুরিয়া যায়।—একাদশ কোটি হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা; তদুপরি বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, রামজী, হনুমানজী আছেন; বিংশতি কোটি লোকের বিংশতি প্রকার ভাষা, শতাধিক প্রকার পরিচ্ছদ। শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়, বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে বঙ্গবাসী, বোম্বাই বাসীর সঙ্গে কোলাকুলি দূরে থাকুক, বাক্যালাপ পর্য্যন্তও করে নাই; এখনও যোজনান্তরে স্বাধীন রাজা, আর ইহাঁদের মধ্যে কেহই আধুনিক নহেন, সূর্য্য বা চন্দ্রের সাক্ষাৎ বংশধর। এতদ্ভিন্ন আর্য্য,

অনার্য্য, ম্লেচ্ছ, যবন, মারহাট্টা, বর্গী—কে নয় ? আমাদের সমাজনীতির শিক্ষক ; যাহার যে ভাবে ইচ্ছা আমাদিগকে পশুত্ব শিখাইয়া গিয়াছে । তথাপি স্বাধীনতাবাদীরা বলিবেন—ভারতবর্ষ একবর্ষ !

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ছিল না, এখনও নাই ; অথচ এ স্বাধীনতার বিনিময়ে ইউরোপ প্রভৃতির তুলনায় আমরা কিছুই পাই নাই । ইহার উত্তম কারণ আছে ।—প্রথমতঃ, আমরা স্বাধীনতাই হারাইয়াছি, কিন্তু কোন প্রণালীর অনুরোধে কাহাকেও তাহা অর্পণ করি নাই, স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ আমরা কখনই কোন চুক্তিতে পক্ষভুক্ত হই নাই । দ্বিতীয়তঃ, বহুযুগ ধরিয়া আমাদের উপকারের জন্য কেহ আমাদের রাজা হয় নাই, স্বার্থসাধনের জন্য কেহ দস্যুভাবে আসিয়া দস্যুর মত চলিয়া গিয়াছে, কেহ বা অতিলোভপরবশ হইয়া রহিয়া গিয়াছে । আত্মাতিরিক্ত উদ্দেশ্য কাহারই ছিল না । আমরা কে, ভারতবর্ষ কি, ইহা বুঝিনা বলিয়াই এত গণ্ডগোল । /

যাঁহা একান্ত জন্মভূমিভক্ত ; যাঁহারা শুদ্ধ ...নামামৃত শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান করিয়া বিস্মৃত হই হিমালয় হইতে চন্দ্রনাথ পর্য্য ক্ষেত্র যাঁহাদের মা কল্পিত হয় ; বেদ বলিলেই একেশ্বরবাদ, নিরীশ্বরবাদ, নির্ব্বাণমুক্তি, ষষ্ঠী মাখালের পূজা ও সত্য পীরের সিন্নী যাঁহাদের অন্তরের অন্তস্তলে উদিত হয় ; পুরাণের নামে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণাকৌশল হইতে বিপিন কৃষ্ণের গগণ-মার্গ-বিদারিণী বক্তৃতা ও কুরুক্ষেত্র হইতে পাবনার প্রজাদের দাঙ্গার ধারাবাহিকতা দেখিতে পান,—তাঁহারাও একথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আর্য্যোপনিবেশ এই ভারতভূমি রাজসূয় ও অশ্বমেধ সত্ত্বেও চির দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত, যে এই খণ্ডরাজ্যমালা বিভিন্ন সময়ে বিবিধ ধর্ম্মবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত ; তাঁহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য যে রাজনীতিসম্বন্ধে সমগ্র ভারতবর্ষ কস্মিন্ কালেও একতন্ত্রাধীন হয় নাই, যে দরবেশ বা সেকেন্দরের আক্রমণে বিন্ধ্যাচল বা রাজমহলের উপলমালা বিকম্পিত হয় নাই, দক্ষিণে বা পূর্ব্বে ভারত ভরিয়া কেহ অশ্রুপাত করে নাই । এই অনার্য্য ভারতভূমি যবনের সংস্পর্শদূষিত হইবার পরে একবার একটুকু একীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু যে কারণেই হউক, তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠে ...১ । ... ন উ-

একথা সত্য ; কবির এ সকল কথা বলিবার অধিকার আছে ; অতি দূরসম্পর্কেও কৃতিত্ব দেখাইয়া মানবচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা যায়, আভিজাত্যগৌরব কোন প্রকারে উদ্দীপ্ত করিতে পারিলে মনুষ্যকে উন্নীত করিতে পারাযায়। কিন্তু রাজনীতির কঠোর অঙ্কে উপস্থাপিত করিবার যোগ্য কথা এ সকল নহে। ধর্ম্ম বা বিদ্যার আলোচনায় ভারতবর্ষের এক ব্যক্তি বা এক প্রদেশ চরমসীমা দেখাইয়া থাকিলে, আহ্লাদের কথা, এবং সেই মূলে স্বজাতীয়তা স্থাপন করিতে পারিলে মঙ্গলের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে শাসনতন্ত্র-গত একজাতিত্ব সপ্রমাণ হয় না। এসিয়া খণ্ডে যীশুখ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন, এবং স্বকীয় ধর্ম্মনীতির প্রচার করেন, ইহাও আমাদের পরিতুষ্টি-জনক সংবাদ, কিন্তু তাই বলিয়া জেরুসালেম এবং পঞ্চনদের রাজনৈতিক উত্থানপতনের একীকরণ উপপন্ন হইবে না। সমগ্র পৃথিবী মনুষ্যের আবাসক্ষেত্র, অতএব এক এবং অভিন্ন ; যতদিন এই পরমবৈরাগ্য অবলম্বন করিতে না পারিবে, ততদিন প্রাচীন ভারতের একতার কথা মনে করিয়া অদ্য দীর্ঘ

কিন্তু মুসলমানের যখন প্রথম অভ্যুদয়, তখন ভারতের প্রাণ কাঁদে নাই, ভারতের বণিক্ ও কৃষক কবোষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে নাই। তাহার পর, যখন ক্রমে ক্রমে ইংরেজের প্রতাপ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, তখনও ভারতবর্ষ তদবস্থ। অদ্য এই ইংরেজের রাজ্যে সাঁওতাল, গারো, কুকির যে অবস্থা, ইংরেজ যখন প্রথম রাজ্য-বিস্তার আরম্ভ করিল, তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের রাজনৈতিক অবস্থায় যে বিশেষ প্রভেদ ছিল, এরূপ বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই, বিশ্বাস করা উচিতও নহে।

ইংরেজ বণিগ্বৃত্তি, ইংরেজ ধূর্ত্ত, ইংরেজ প্রবঞ্চক, ইংরেজ—তাহাকে যাহা বলিবে, তাহাই। কিন্তু সে কথায় আমাদের ইষ্টাপত্তি কি ? গজনবী মামুদের বা ঘোরীর মত না আসিয়া ইংরেজ বণিগ্বেশে এদেশে আসিয়াছিল, তাহাতে আমাদেরই লাভ ;—অন্যথা রক্তস্রোত প্রবলতর বহিত মাত্র। তথাপি স্বল্পতমামা স্বদেশ-বৎসলদের মনে রাখা উচিত যে, ভাব গ্রহণ করিয়া ইতিহাসপাঠে ইহাই বুঝা যায় যে ইংরেজ রা[illegible] লাবে প্রথ- [illegible] এদেশে আইসে নাই [illegible] ময়ের তাড়- [illegible] াদিগকে রা- [illegible] আর ইংরে- [illegible] তাহার অ- [illegible] লব্ধ হয় নাই, ই- [illegible] ক।

ফলতঃ যেরূপেই ইংরেজের রাজ্যলাভ ঘটিয়া থাকুক, কি নিয়মে সে রাজ্য পরিচালিত হইতেছে; তাহা দেখা কর্ত্তব্য। নিয়মের পরীক্ষা, ফলে;—উদ্দেশ্যের পরিচয়, কার্য্যে। যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখিতে পারে যে ইংরেজের রাজ্যে অসভ্যতার পরিবর্ত্তে সভ্যতা, মূর্খতার পরিবর্ত্তে জ্ঞান,দারিদ্র্যের পরিবর্ত্তে ধনবিস্তার, উপদ্রবের পরিবর্ত্তে শান্তি, অন্ধকারের পরিবর্ত্তে আলোক স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন, নির্ভীকচিত্তে, নিঃসঙ্কোচে, ট্যাঁকে টাকা গুঁজিয়া, ছাতা মাথায়, জুতা পায়, চাষা গ্রামের জমিদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে যায়; একশত ব্যক্তি এক শত বার সুবিচার পাইয়াছে দেখিয়া বিচারককে ধর্ম্মাবতার বলে, ধর্ম্মাবতার মনে করে। এখন, যে গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-পত্র নাই, সে গ্রামকে আমরা ধিক্কার করি; বাঙ্গালা ভাষায় জর্ম্মণীয় পণ্ডিতের বিদ্যা পরীক্ষা করি; এখন, রুস তুরস্কে যুদ্ধ হইলে ইউরোপের কোন্ রাজার কি পন্থা অনুসরণীয় আমরা তাহার নির্দ্ধারণ করি; সূর্য্যমণ্ডলের কলঙ্কে শস্য সম্ভাবনার বিচার করি; এখন, গলায় কম্ফর্টার, পায়ে মোজা না থাকিলে আমাদের সর্দ্দী হয়; ভদ্রলোক আমাদের বাটীতে আসিয়া আমাদিগকে অনাবৃত দেখিলে, আমরা উলঙ্গ মনে করিয়া লজ্জিত হই; এখন, কাগজে লিখিয়া রাজরাজেশ্বরকে অপদস্থ করি; বক্তৃতা করিয়া জগৎ উন্মাদিত করিয়া তুলি। অধিক কি, কএক বৎসর মাত্র ইংলণ্ডীয় গুরুর পদপ্রান্তে জ্ঞান চর্চ্চা করিয়া, গুরুকে বিদ্যায় পরাভব করিতে পারি না বলিয়া, গাত্রজ্বালায় জলে ডুবিয়া মরিতে যাই!—জিজ্ঞাসা করি,এই সমস্ত কাহার প্রসাদাৎ? তোমার ভারতের ইতিহাসের কোন্ স্থলে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া এইরূপ আর একটি চিত্র তুমি দেখাইতে পার?

তথাপি আমরা স্বাধীন হইব! আমাদের অপেক্ষাও মূর্খ ভারতবাসীকে এহেন রাজারও বিদ্রোহিতা করিতে উপদেশ দিব! রাজদ্রোহিতা শিখাও তাহাতে তত দুঃখ নাই, কিন্তু তুমি যে এখনও বালক, এখনও শিক্ষানবীশ। এ গুরু মহাশয় হয়ত মরিতে পারেন,কিংবা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে পারেন, কিন্তু কর্ত্তা যে এখনও জীবিত। আগে সংসারের ভার গ্রহণ কর, গৃহস্থ হও, তখন গুরু মহাশয়কে পেন্সন দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা থাকে দিবে; না দাও, তিনি চলিয়া যাইবেন। এখন উতলা হইও না।

উপরে যাহা বলা গেল, একবার তাহার ফল স্থির করা যাউক। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষ কখনও এক সাম্রাজ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ নাই। ইংরেজ যে সূত্র অবলম্বন করিয়া রাজ্য করিতেছেন, তাহাতে ভারতের একতা সম্পাদন সম্ভবপর; একতা সংসাধিত হইলে মঙ্গলের আশা করা

দাঁড়াইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের রাজত্বে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিলক্ষণ রূপে হইতেছে। এখনও ভারতবর্ষে যে সকল স্বাধীন উপরাজ্য আছে, সেখানকার প্রজাদের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বিশেষরূপে ইহা উপলব্ধ হইবে। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এক্ষণ যেরূপ প্রসার, পূর্ব্বে এমন ছিল না। চতুর্থতঃ, রাজনীতি সম্পর্কে আমরা এখনও বালক ; আমাদের রাজনৈতিক পুষ্টিসাধন আবশ্যক এবং ইংরেজের দ্বারা তাহা সাধিত হইতেছে। সুতরাং ইংরেজের অধীনতা আমাদের বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার প্রধান উপকরণ গুরুভক্তি। গুরুর প্রতি ভক্তি না থাকিলে,তাঁহার উপদেশে শ্রদ্ধা না থাকিলে, তাঁহার কথায় আস্থা না থাকিলে, বিদ্যালাভের কিংবা জ্ঞানোপার্জ্জনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। রাজনীতিতে ইংরেজ সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমাদের গুরু . অতএব তিনি যখন বলেন যে ভারতবর্ষের উপকারের নিমিত্তই তিনি প্রয়াসী,তখন সে কথার মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিলেও তোমার বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। যে সূত্রে ইংরেজ ভারতের রাজতন্ত্র পরিচালন করিতেছেন, তাহার আমূলপ্রান্ত ধারণা করিবার শক্তি ভারতবাসীর এখনও হয় নাই। তথাপি গুরুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইংরেজ করিতেছেন,—যে মন্ত্রে যখন ভারতবাসীকে দীক্ষিত করেন, তাহার উদ্দেশ্য, তাহার পরিণাম, তাহার উপকারিতা এবং তাহার প্রয়োগার্হতা বুঝাইবার যত্ন করিয়া থাকেন ; এবং বুঝিতে না পারিলে জিজ্ঞাসু হইতে পারিবে বলিয়া ইংরেজ ভারতবাসীকে বচনস্বাধীনতা প্রদান করিতেছেন। অসঙ্কোচে যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর, যেখানে তোমার সন্দেহ হয় ভঞ্জন করিতে বল, সন্তুষ্টচিত্তে ইংরেজ তাহা শুনিতেছেন, শুনিবেন। কিন্তু অভক্তি প্রদর্শন করিলে কেন তিনি বিরক্ত হইবেন না? ধৃষ্টতা দেখাইলে কেন তোমার কথায় কর্ণপাত করিবেন? তুমি যে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পাও,ইহা ইংরেজের দয়ার গুণে ; তুমি যে দয়ার পাত্র, তুমি যে অনুগৃহীত হইলে যথোচিত আচরণ করিতে জান, তাহা কেন দেখাইবে না? আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে ইংরেজরাজকে,—

"মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি" মনে করিয়া এবং এই শাস্ত্র-বচন সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আচরণ করাই আমাদের উচিত, আমাদের আবশ্যক, আমাদের পরম ধর্ম্ম।

অতএব, ইংরেজ যখন আমাদের গুরুস্থানীয়, ভারতবর্ষে ইংরেজের স্থায়িত্ব যখন সর্ব্বথা আমাদের কাম্য, তখন যাহাতে আমাদের ভক্তিভাব অবিচলিত থাকিতে পারে, আমাদের প্রেমভাব দিন দিন প্রবলতর হয়, আমাদের মাধুর্য্যমিশ্রিত মমতার ভাব ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হ-

ইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বথা আমাদের যত্নশীল হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল লোকের বিদ্যাবুদ্ধি কখনই সমান হইতে পারেনা; সেই জন্য সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল বলিয়া যাহারা পরিচিত সেই উপরিতন দশের কথায় নিম্নতর স্তরের ব্যক্তিবৃন্দ বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়া কার্য্য করে। সুতরাং যাহাতে রাজপুরুষবর্গের সাধু এবং অকৃত্রিম সারল্যপূর্ণ অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দেহ আরোপিত হয়, তাহা করা সেই দশের পক্ষে মহাপাপ, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি এবং অনিষ্টের সম্ভাবনা।

আমরা গুণবাদী নহি; সকল বস্তুর সুন্দর অংশই বাছিয়া দেখি, তাহা নহে। যাঁহারা আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধীয় উপরি ন্যস্ত কথা গুলিতে গুণবাদিতার লক্ষণ দেখিবেন, তাঁহাদিগকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, অপ্রিয় হইলেও অনেক সময়ে সত্য কথা বলা আবশ্যক এবং—

"হিতং মনোহারিচ দুর্ল্লভং বচঃ।"

তথাপি আমরা স্বীকার করি যে, কল্পিতই হউক বা বাস্তবই হউক যে সকল দুঃখের কাহিনী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আজি কালি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সমুদয়ই ঈর্ষা, দাম্ভিকতা বা অসদভিসন্ধিবিজৃম্ভিত নহে। কিন্তু অজ্ঞতার পরিচয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেদীপ্যমান, ইহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের দুঃখের গীত যাঁহারা গাহিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের মনের ভাব এইরূপ যে তাঁহারা ইংলণ্ডের প্রজাবর্গ এবং ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ সমতার অভাবে পক্ষপাতিতার প্রমাণ দেখিতে পান, এবং তাহা ন্যায়ানুমোদিত নহে বিবেচনা করিয়া অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাহার ফলে রাজভক্তির যে কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা ইহাঁদের খেদের কারণ বুঝিতে পারি না। ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত, ভিন্নরুচিসম্পন্ন, ভিন্ন-সভ্যতা-প্রবর্দ্ধিত রাজা ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা সংস্থাপন করেন, তাহার অধিকাংশই পরীক্ষোদ্দিষ্ট; ইংরেজ স্বদেশে যাহার গুণবত্তা দেখিয়াছেন, যাহার উপকার বুঝিয়াছেন, স্বভাবতঃ [illegible]দেশে সেই নির্বন্ধের মাণ দে[illegible] কার্য্যের ফলবত্তা দেখিতে বাঞ্ছা মাত্রের; কিন্তু তাহার উপযোগিতার বি[illegible] আদৌ তাঁহারা সন্দিহান হইবেন ইহাও স্বভাবসিদ্ধ। সেই জন্য প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা নিত্য পরীক্ষা করিয়া সময়ে সময়ে তাহার সঙ্কোচন বা সম্প্রসারণ করিতে বাধ্য হন। আমরা ইংলণ্ডের ইতিহাস, ইংলণ্ডের সাহিত্য, ইংলণ্ডের সমাজনীতিতে লালিত এবং পালিত; ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা জানি না বলিলেও চলে। ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের সহিত আমাদের যে সহানুভূতি, তাহাও সেই বিজাতীয়শিক্ষা-

প্রণোদিত। সুতরাং উভয় দেশের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্যের প্রতি সমুচিত দৃষ্টি না রাখিয়া সহসা রাজনৈতিক বৈষম্যে বিরক্তি প্রকাশ করি; ইংলণ্ডে যাহা ভাল, এখানেও তাহাই ভাল, এই এক ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা রাজকীয় কার্য্যকলাপের সমালোচনা করি। গতিকেই আমাদের অসন্তোষ। ইতঃপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এখানে তাহা প্রতিপন্ন হইল; আমাদের অজ্ঞতার জাজ্বল্যমান উদাহরণ এই স্থলে পাওয়া গেল। ইংলণ্ডের প্রজা যে কথায় জাতস্বত্ব বলিয়া আস্ফালন করে, যাহার সঙ্কোচ দেখিলে বা আশঙ্কা করিলে খড়্গহস্ত হইয়া উঠে, সেই কথাতে আমাদের তদ্রূপ উল্লেখ বা উক্তি নিতান্ত হাস্যজনক এবং নিতান্ত উপেক্ষণীয়, ইহা অনেকেই বুঝেন না। তবে এই সকল পরীক্ষোদ্দিষ্ট স্থলে আমাদের [illegible] ব্যক্ত করিবার আবশ্যকতা আছে; শান্তভাবে [illegible] পূর্ণ বাক্যে আমাদের যাহা বক্তব্য বলা উচিত। ইংরেজ আমাদিগকে [illegible] স্থলে বলিবার অধিকার দিয়াছেন; সে অধিকারে এখনও হস্তক্ষেপ করা হয় নাই; কখনও হইবে বলিয়াও বোধ হয় না।

অন্য এক সম্প্রদায়ের দুঃখকারী, নিয়ম এবং যাহার উপর সেই নিয়মের প্রয়োগ পরীক্ষার ভার আছে, সেই ব্যক্তির প্রভেদ করেন না বা করিতে জানেন না। কর্ক্‌ড্‌ ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ফৌজদারি আইন ইহাঁরা এক এবং অভিন্ন বিবেচনা করেন। যে লর্ড লিটন, ফুলার্ ব্যাপারের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার মুদ্রণ আইন উপলক্ষে তথাবিধ বক্তৃতা করিতে পারেন, ইহাও তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। ফলতঃ এই সম্প্রদায়ের লোককে বুঝাইবার প্রয়োজনও নাই; ক্ষেত্রভেদে প্রয়োগ-ভেদ, এবং ফল-ভেদ হয়, আপনা আপনি যে ইহা দেখিতে পায় না, সে অন্ধ; তাহার পক্ষে আলোকেও অন্ধকারে প্রভেদ নাই। তথাপি একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক; অযুত কর্ম্মচারী লইয়া এই সাম্রাজ্য চালাইতে হয়; সুতরাং ক্বচিৎ কুত্র ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমপ্রমাদ হইবে, ইহা কেবল যে সম্ভব তাহা নহে, প্রত্যুত গৌরবেরই বিষয়; এবং এই সকল ভ্রমপ্রমাদের শাসন বা সংশোধনে আত্যন্তিক কাঠিন্য প্রদর্শন না করিয়া যে, অপেক্ষাকৃত সদয়াচরণ দেখান হইয়া থাকে, ইহা উচ্চতর রাজপুরুষবর্গের বিজ্ঞতা এবং মহানুভাবতারই পরিচায়ক। রাজ্যরক্ষা শিশুর ক্রীড়া নহে। যে সকল ব্যক্তি উল্লিখিত দোষ প্রদর্শন করেন, তাঁহারা যদি অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া দোষের গুরুত্বানুসারিণী কথা বলেন, রাজপুরুষবর্গ কখনই সে কথায় অবজ্ঞা করিবেন না।

অতএব স্থূলতঃ দেখিতে গেলে স্বাধীনতাবাদীদের কথা যে প্রকার অসার এবং অগ্রাহ্য, যাহারা ইংরেজারিত, এবং যাঁহারা সূত্রগত ও ব্যক্তিগত কার্য্যের প্রভেদনির্ব্বাচনে অক্ষম, তাহাদের কথাও

সেইরূপ অযৌক্তিক। কিন্তু ইহাদের অসন্তোষ এই অবধি ক্ষান্ত হইলেই ক্ষতি ছিল না। ফলতঃ তাহা না হইয়া ইহাতে প্রকৃত বিপদের আশঙ্কা আছে।

ইউরোপে, মধ্যএসিয়াতে, এবং ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমায় এইক্ষণে সত্য সত্যই রাজ-নীতি-সঙ্কট উপস্থিত। ভারতবাসী রাজনীতির কথায় এখনও নিতান্ত শিশু, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং এখন কোন কথা কহিতে হইলে দ্বিগুণ সাবধানতার প্রয়োজন। তদ্বিপরীতে আমাদের অসত্য বা অসম্যক্ তত্ত্ববার্ত্তা এবং অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া আজি কালিকার বিষম সমস্যা পূরণ করিতে ʼ য়া, আমরা যদি হঠকারিতার পরিচয় দেই, যদি ইংরেজরাজের অধার্ম্মিকতা, ভীরুতা, দুর্ব্বলতা, স্বার্থপরতা, শোষকতা, রাজপুরুষগণের পক্ষপাতিতা, অত্যাচারপরতা; আর সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন কল্পিত গৌরবকথার প্রলাপবচনে প্রজাবর্গকে উত্তেজিত, ভক্তিশূন্য, এবং বিপ্লবপ্রিয় করিবার জন্য ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক পন্থা প্রদর্শন করি, তবে ইংরেজের হস্তক্ষেপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আজি কালি যখন চিরদিনাপেক্ষা অধিকতর রূপে শান্তির প্রয়োজন, তখন অঙ্কুরেই উপদ্রবের বিনাশসাধন, ইংরেজের একান্তই উচিত। না করিলে রাজধর্ম্মের অপলাপ হইবে, আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে।

তিন শ্রেণীর লেখককে লক্ষ্য করিয়া মুদ্রণ-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম, যাহারা স্পষ্টতঃ, বা পাকতঃ ইংরেজরাজকে অত্যাচারপরায়ণ, শোষক, পক্ষপাতকলুষিত, ভীম ইত্যাদি বিশেষণ দিয়া অপদস্থ এবং সম্মানচ্যুত করিতে যত্ন করে; দ্বিতীয়, যাহারা ইংরেজ ও ভারতবাসী হিন্দু ও খৃষ্টানকে পরস্পরের প্রতি জাতিবৈরের পন্থা প্রদর্শন করে, একজন বা দশজন দুরাচারের ব্যবহার দেখাইয়া সমগ্র জাতির নিন্দাবাদ করে, এবং ব্যক্তিবিশেষের কথা তুলিয়া শেষে কুলে কালি দিতে যায়; তৃতীয়, যাহারা অনুগ্রহ-লব্ধ এই মহাস্ত্র পাইয়া, তাহার অপপ্রয়োগ করিয়া স্বার্থসাধনের জন্য ভয়প্রদর্শন বা উৎপীড়ন করে। এই নীচবৃত্তি, লঘুচেতা, কাপুরুষ লেখকদিগের উল্লেখ করিলেই, ইহাদের জঘন্যতার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়। বাস্তবিক ইহারা সমাজের কণ্টক, মনুষ্যনামের গ্লানি মাত্র। ফলতঃ উপরে আমরা যাহা বলিযাছি, তাহাতে এই তিন শ্রেণীর লোকেরই যে দমন হওয়া আবশ্যক, বোধ করি সমদর্শী ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছি। ব্যবস্থার সম্পাদন যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, তাহার কোনও অংশে দোষ নাই, অভাব নাই, বা বাহুল্য নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে ইহার সূত্র লইয় করিবার অধিকার নাই, অ-

ন্যায়, একথা আমরা বার বার বলি। যাঁহারা ভারতবর্ষের হিতকামনার ছলে আত্মবিনাশ সাধন করিতে বসিয়াছেন, প্রজাবৃন্দের গলে ছুরিকা বসাইতে উদ্যত, তাঁহারা শঙ্কিত হউন, সাবধান হউন,—যাঁহাদের লেখনী গরলপ্রসবিনী, ভারতবর্ষের শিরায় শিরায় যাঁহারা বিষ ঢালিতেছেন, তাঁহারা শঙ্কিত হউন, সাবধান হউন;—যাঁহারা রৌদ্র-তপ্ত অথচ লঘুতৃণসদৃশ ভারতবাসীর চিত্তে অগ্নিসংযোগ করিতে ব্যগ্র, ভারতবর্ষ ছার খার করিতে উপস্থিত, তাঁহারা শঙ্কিত হউন, সাবধান হউন। অন্য কাহারও শঙ্কার কারণ নাই, ক্রোধের কারণ নাই, দুঃখের কারণ নাই, এবং স্বকীয় কুসুমকোমল সুখশয্যার কুসুমকোমল ক্রোড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া বৃথা ভাবনায় শুষ্ক হইবার কারণ নাই।

(উকীল)

আগ্রা।

আগ্রার যাহা কিছু মাহাত্ম্য, এই সময় হইতেই তাহার সূত্রপাত হয়। এই সময় হইতেই ইহার উন্মেষিত যৌবন-গন্ধ নানা রাজ্য হইতে ভ্রমরনিবহ স্বরূপ বিবিধ প্রকারের লোককে ঝাঁকে ঝাঁকে অন্ধ করিয়া আনিতে থাকে। কত আমির, কত ওমরা, কত সাহেব, কত পাদরী, কত ফকীর, কত সন্যাসী, কত পণ্ডিত এবং কত ছদ্মবেশী এই সময় হইতেই ইহার লক্ষ্মীপ্রদ পাংশু রাশিতে মস্তক অলঙ্কৃত করিয়া ঘাটে, পথে, মাঠে, আলয়ে ও গলিতে গলিতে ঘটিকাস্থ দোলক যন্ত্রের ন্যায় ইহার সর্ব্বত্র বিলুলিত হইতে থাকে। এই সময় হইতেই ইহার ভূত-বিলীন অধিবাসীরা প্রতি রাত্রে সুরণা, নফীর ও নাক্কারা [illegible] মধুর অভিঘাতে নিদ্রিত হইয়া [illegible] মা ও করতালের সঘন গভীর গর্জ্জনে প্রভাতে জাগরিত হইতে থাকে। এই দিন হইতেই আগ্রা কিয়ৎকালের জন্য প্রাসাদ-মুকুট-শ্রেণীস্থ সুবর্ণ কলসে ঝলসিয়া সমস্ত পৃথিবীতে বিস্ময়োৎপাদন করে; এবং এই সেই দিন, যে দিন হইতে ইহা দূর দূরস্থ চক্রবর্ত্তীদিগের নিকটে সুপরিচিত হইয়া মোগলশরীরে ভারতের ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব বিস্তার করিতে থাকে। এখন যাহা কবিদিগের কল্পনা স্বপ্নেও চিত্র করিতে পরাস্ত হয়, কিছু দিন পূর্ব্বে তাহাই সত্য ঘটনারূপে ইহার বক্ষঃসরোবরে ভাসমান ছিল। ইহার রেণুপরিণত অট্টালিকামালার গবাক্ষপংক্তি চতুর্দ্দিকে প্রায় দিবা রাত্র মোগল সুন্দরীদিগের মুখপদ্মে চিত্রিত থাকিত। সেকালে কিছু দিনের জন্য সমস্ত ভারতের বিদ্যাবুদ্ধি এই খানেই সমবেত

ভাবে সমাসীন ছিল। এই বিদ্যা এবং এই বুদ্ধির কণিকা মাত্র কর্ষণে কি সংস্পর্শনে লোকে তখন আজিকার মতই গর্ব্বিত হইত, অন্য বুদ্ধি কি বিদ্যা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট হইলেও লোকে তখন এ বিদ্যার নিকটে তাহাকে উৎকৃষ্ট দেখিত না। মাতৃভাষার যে আসন, তাহা প্রায়লোকেরই রসনাবেদিতে আজিকার ন্যায় সঙ্কীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখানকার রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, বেশ ও ভূষাদির তরঙ্গমালা ভারতের ঘরে ঘরে ব্যাপ্ত হইয়া এক সময় তুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিল। এখানেও কোন সময় মোগলমস্তিষ্কের প্রতিভা হইতে নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ধর্ম্মসংহিতা রচিত হইয়াছিল, প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছিল, প্রচারিত হইয়াছিল এবং শিষ্যোপশিষ্যাদি দ্বারা ধরাতল বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। "আল্লাহু আকবর" এই দ্ব্যর্থ বাচক ধ্বনি কোন সময় লোকের মুখগহ্বরে দৈনিক সম্ভাষাতে এখানেই প্রথমে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। দেবতা হইয়া লোকের ভক্তিমঞ্চে আসীন হইবার আশা এক সময়ে এখানকার সিংহাসন হইতেই লতাকারে উত্থিত হইয়া আকাশ বেষ্টন করিতে চাহিয়াছিল। আজিকার লোকেরা যেমন আজিকার স্থান বিশেষে আজিকার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছে, কোন সময়ে কোন সময়ের লোকেরাও সেইরূপ এই স্থানবিশেষের শিল্পাদি দেখিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিয়াছিল। আজি যেমন নগরবিশেষে সমস্তই সাহেবানা, কোন সময়ে এখানেও সমস্তই মোগলানা ছিল। এই দিনে যেমন লোকেরা, সমুদয় বাগান, ভিটি ও বসতির বাটী বিক্রয় করিয়া সমুদ্র সন্তরণান্তর দ্বীপবিশেষে যাইয়া যে ফল লাভ করে, সেই দিনেও লোকেরা সেইরূপ সর্ব্বস্বান্ত পণ করিয়া একবার গঙ্গা ও যমুনা বাহিয়া এখানে আসিতে পারিলে সেই ফল লাভ করিত। পাঠকবর্গকে আর অনর্থক ভাষার ব্যাপকতা দ্বারা উত্তাক্ত না করিয়া সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, কোন সময় সমস্ত ভারতের সুখ দুঃখ বিতরণের ভাঁড়ার কিয়ৎকালের জন্য এইখানেই সংস্থাপিত ছিল। কোন সময় ইহার এক খানি ইষ্টকখণ্ড এক দিবসে যে ব্যাপার দর্শন করিয়াছে, আজি তাহা এক ব্যক্তি এক মাস বসিয়া লিখিয়া শেষ করিতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব আমি আমার অসহায় অবস্থায় ইহার প্রাচীন এবং নবীন অবস্থা সম্বন্ধে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা ক্রমে পাঠকবর্গের নিকটে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

প্রাকৃতিক অবস্থা।

আগ্রা হিমালয়ের প্রসারিত পাদপত্রের ক্রমনিম্ন ভূমির উপরে সংস্থাপিত এবং সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ৫৫০ ফুট উচ্চ। বাঙ্গলা দেশ সমুদ্রের বক্ষঃস্থল হইতে

যত খানি উচ্চ, তাহা ইহা হইতে বিয়োগ করিলেই পাঠকবর্গ অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে, বঙ্গের নগরাদির সহিত তুলনা করিলে উচ্চতায় এস্থান একটি অনতিবৃহৎ পর্ব্বতপৃষ্ঠ সদৃশ। সিকিম-শৈলশ্রেণীর পাদদেশে নিম্ন আসাম প্রভৃতি স্থান এখান হইতে ২৫০ ফুট নিম্ন, এবং সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থান ৪০৫ ফুট; হাতের পরিমাণে ২৭০ হাত নীচে। কলিকাতা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান যে আরো কত নীচে, তাহা ইহা হইতেই অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সাধারণের এই বিশ্বাস যে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, হিমালয়ের পদতলস্থ একটি সামান্য সমতল উচ্চ ভূমি মাত্র। আমাদেরও পূর্ব্বে এই বিশ্বাসই ছিল; কিন্তু এখন জানা যাইতেছে যে, ইহার উত্তরপশ্চিমে যমুনা এবং শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তি ক্ষেত্র এখান হইতে আরও ৩৬৬৬ হাত উচ্চ। অতএব ইহা হইতে এই দেখা যায় যে, হিমালয় যেন সপরিবারে ভারতের মস্তকে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া বঙ্গাভিমুখে পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া আছে, এবং তাহার পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে নখ-রেখা সদৃশ বঙ্গভূমি সমুদ্রতটে অবস্থান করিতেছে।

আগ্রাবিভাগে ইটাওয়া, মইনপুরী, ফরক্কাবাদ, এটা এবং মথুরা এই কয়টি প্রদেশ আছে। ইটাওয়া আগ্রা হইতে লৌহবর্ত্মে ৭৩ মাইল ব্যবধানে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে রেলপথে আগ্রা আসিবার কালে ইটাওয়া ষ্টেশনের মধ্যদিয়া উত্তরপশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইতে হয়। ইটাওয়ার সহর, ইটাওয়ার রেল ষ্টেশন হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে থাকে। সহর হইতে আবার যমুনা, প্রায় মাইল দুই দক্ষিণ দিয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। এস্থান আগ্রাবিভাগের মধ্যে স্বাস্থ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। অনেক কঙ্কালাবশিষ্ট বাঙ্গালি বাবুরা দেশের জল বায়ুর উৎপাতে উৎপীড়িত হইয়া শরীর সংস্কারের জন্য অনেক সময় এস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করে। গ্রীষ্মকালে আগ্রা যত গরম হয়, এস্থান তত হয় না; এবং ইহার বায়ুতে আগ্রা অপেক্ষা স্নিগ্ধতা কিঞ্চিৎ অধিক আছে বলিয়াই ইহার সহবাস অনেকের মনোরম্য। ইহাতে স্নিগ্ধতা থাকিবার বোধ হয় আর কোন কারণ নাই; কেবল এই কারণ যে, ইহার উত্তর পার্শ্বেই মইনপুরী প্রদেশ। এই মইনপুরী প্রদেশের দেশের মধ্যদিয়া অনেকগুলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাহার গাত্রের অন্যান্য ভাগ কতকগুলা ঝিল ও হ্রদে, খচিত আছে। মইনপুরী আগ্রা হইতে রাজবর্ত্মে প্রায় ৭০। ৮০ মাইল পূর্ব্বদিকে। ইটাওয়া হইতেও যাইবার পথ আছে, লৌহবর্ত্ম নাই। এস্থান আমাদের কাছে এক বিষয়ে একান্ত মনোহর। এখান হইতে আমরা কখন কখন ঝিলজাত মাগুর ও শিঙ্গীমৎস্য পাইয়া থাকি। যদিও তাহা আয়তনে এবং

স্বাদে জন্মভূমির মৎস্য হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট, তথাপি অবয়বের সাদৃশ্য আছে বলিয়া উহার অভাবাংশ সকল আহার সময়ে কল্পনাসাহায্যে পূরণ করিয়া লই। দেশীয় মৎস্য অনেক দিন হইল দেখি না, এই বলিয়াই উহাতে আমাদের এত আদর। মইনপুরীর পূর্ব্বোত্তর ফরক্কাবাদ। এই প্রদেশ গঙ্গা নদীর উভয় তটে বিস্তৃত। ফরক্কাবাদের সহর গঙ্গার তট হইতে প্রায় ৩।৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আগ্রা হইতে রাজবর্ত্মে প্রায় ১০০ মাইলেরও অধিক দূর ব্যবধানে। ইহার সহিত আমাদের এক রাজস্ব ব্যতীত আর কোন বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই। ফরক্কাবাদের পর এটা। এটা আগ্রা হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বোত্তর এবং রাজবর্ত্মের প্রায় ৫০ মাইল হইতেও অধিক দূরে। এক রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ভিন্ন এস্থানের সহিতও আমাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার পর মথুরা। মথুরার সহর আগ্রা হইতে পশ্চিমোত্তরে রাজবর্ত্মের প্রায় ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার সহিত তীর্থ সম্বন্ধে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিছু দিন পূর্ব্বে যাত্রীরা আগ্রা হইয়া উটের গাড়ীতে ইহাকে দর্শন করিয়া যাইত এবং পথে দস্যুকর্ত্তৃক সর্ব্বস্বাপহৃত হইয়া অনেক সময় অশ্রুমুখে পদব্রজে মথুরা ও বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইত। আজি কালি লৌহবর্ত্ম হওয়াতে লোকেরা সে উৎপাত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাইয়াছে। ইংরেজদিগের শাসিত রাজ্যে এত দস্যুভয় কিরূপে সম্ভবে, ইহা ভাবিয়া পাঠকবর্গ বোধহয় কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যের কোন কারণ নাই। মথুরার রাজবর্ত্মের কিয়দংশ ভরতপুরের এলাকা মধ্যে পড়িয়াছে। দস্যুরা সর্ব্বদাই এই সন্ধিস্থানে থাকিয়া আপন আপন অভীষ্ট সাধন করে। যদি রাজার শাসন উৎকৃষ্ট হইত, তাহা হইলে এরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এদেশীয়দের নিতান্ত দুরদৃষ্টবশতঃই তাহা না হওয়াতে যাত্রীদিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হয়। আজি কালি যাত্রীদিগকে আর এ ভাবনা ভাবিতে হয় না। এখন যেমন আগ্রা না আসিয়া বরাবর কলিকাতা হইতে বাষ্পীয় শকটে হোট্রাস্ ষ্টেশন দিয়া স্বতন্ত্র লৌহবর্ত্মে এককালে মথুরায় যাইয়া উপস্থিত হওয়া যায়, সেরূপ আবার আগ্রা হইয়াও রাজপুতনার বাষ্পীয় শকটে স্বতন্ত্র শাখা লৌহবর্ত্মে মথুরায় যাওয়া যায়। মথুরা কখন কখন কুটুম্ব হস্তে আমাদিগকে পেরা ও খুর্‌চুন্দরূপ মিষ্টান্ন যোগাইয়া থাকে। খুর্‌চুন্দ্ চিনিতে প্যাক করা দুগ্ধের চাঁচি। আর মথুরার পেরা এইজন্য প্রসিদ্ধ যে, ইহা যুগান্তেও নষ্ট হয় না এবং ছুড়িয়া ফেলিলে দস্যুর মস্তকও ভগ্ন করা যায়। প্রবাদ আছে যে, মথুরাবাসী চৌবে ব্রাহ্মণেরা ইহার ৬।৭ সের অনায়াসে আহার করিয়া উঠে।

আগ্রাবিভাগের দক্ষিণ সীমা ধোলপুর, গোয়ালিয়র এবং জ্বালাউন্। পূর্ব্বসীমা কানপুর এবং অযোধ্যা বিভাগের অন্তর্ব্বর্ত্তী হরদোই প্রদেশ। উত্তর সীমা সাজিহানপুর, বদাওন, আলিগড় এবং পঞ্জাবের অধীনস্থ গুড়গাঁও। পশ্চিম সীমাতে রাজপুতনার অন্তর্গত ভরতপুর।

আগ্রা যমুনার পশ্চিমতটে অবস্থিত। যমুনা হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া ইহার উত্তরপশ্চিম দিয়া আসিয়া নগরের পাদদেশ ধৌত করিয়া বালগতিতে পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। ইহার গতি এক এক স্থানে এত বক্র হইয়া গিয়াছে যে, সেই বক্রের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে আসিতে কোথাও বা ২০ মাইল, কোথাও বা ১২ মাইল এবং কোথাও বা ৬ মাইল পথ ঘুরিয়া আসিতে হয়। প্রভাতে একস্থান হইতে নৌকা খুলিয়া আসিয়া, সন্ধ্যার সময় নৌকা লাগাইয়া দেখ যে, সেই স্থানেরই অপরদিকে মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। এই কারণেই বোধ হয়, আমাদের দেশীয় লোকদিগের নৌকাপথে আসিতে এত বিলম্ব হইত। যমুনা আমাদের একমাত্র জলাশ্রয়। ইহারই আশ্রয়ে আমরা দারুণ নিদাঘের পশ্চিমোত্তরীয় আগ্নেয়বাতে জীবন ধারণ করিয়া থাকি ; ভস্ম হইয়া যাই না। জন্মভূমির সাগর-নিভা তটিনী সকলের ভ্রূকুটি আমরা ইহারই কুশাঙ্গোপরিস্থ মন্দ মন্দ বীচিলহরী দেখিয়া অনেক সময় এককালে বিস্মৃত হইয়া যাই। ইহার তটদ্বয় বিলক্ষণ উচ্চ এবং স্থানে স্থানে গ্রামসীমাস্থিত শ্যামল বৃক্ষাদি দ্বারা ভূষিত হওয়াতে দূর হইতে যেন মনোহর কেলিশৈলশ্রেণীর ন্যায় দেখায়। তটস্থিত ভূমি উভয় পার্শ্বেই ভিতরের দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দূর দূরস্থ উচ্চভূমি সকল হইতে আনীত বর্ষাকালীয় জলপ্রবাহ সকলের দ্বারা এরূপ গভীর ভাবে বন্ধুর হইয়া গিয়াছে এবং নানাদিক হইতে আগত সেই সকল পয়ঃপথের পরস্পর সঙ্গম দ্বারা এরূপ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার প্রতিরূপ মানচিত্রে দেখিলে, যেন তাহা যমুনার শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট তনুরুহরাজীর ন্যায় বোধ হয়। একাএক স্থানের পয়ঃপ্রণালী এত গভীর ও দীর্ঘ যে, তাহাতে দুই তিন সহস্র সৈন্য অনায়াসে লুক্কায়িত হইয়া থাকিতে পারে। নানাদিক হইতে নানা পয়ঃপথ আসিয়া নানাভাবে মিলিত হওয়াতে ইহাদের গতি এত বিভিন্নপথগামিনী হইয়াছে যে, কোন অপরিচিত ব্যক্তি ইহার মধ্যে নামিলে সহজে বাহির হইতে পারে না। অনেক সময় পথ না পাইয়া ঘুড়িতে থাকে। এদেশের প্রায় নদীর তটই এইরূপ রেভাইন্ জাল (Ravines) দ্বারা বন্ধুরীকৃত হইয়া আছে, বৃষ্টি হইবামাত্রই এই সকল পথ আশ্রয় করিয়া তটভূমিস্থ সমস্ত গ্রাম ও নগরাদির জল বেগে আসিয়া যমুনা গর্ভে পতিত হইয়া থাকে।

ক্ষণকালও ভূমির উপরে তিষ্ঠিতে পারে না। বৃষ্টির পরমুহূর্ত্তেই ভূমি শুষ্ক হইয়া উঠে, এই গতিকেই দেশ বর্ষাকালেও অতিশয় শুষ্ক থাকে। সহরের মধ্য দিয়া অনেক গভীর গভীর পয়ঃপথ যাইয়া এরূপে যমুনাতে পতিত হইয়াছে। বর্ষাকালে যখন ইহাদের মধ্যদিয়া জল চলিতে থাকে, তখন জলের এত বেগ হয় যে, প্রতিবৎসরেই শুনা যায়,দুই চারি জন যুবা ও বালক ইহার জলবেগে ক্রীড়া করিতে গিয়া যমুনাতে পতিত হইয়া মৃত হইয়াছে। যমুনার জল খাইতে অতিশয় মধুর। অনেকে সংস্কারবশতঃ অগুণ করে বলিয়া ইহার গর্ভের জল খায় না। ইহার তটস্থিত কূপোদকই প্রায় সাধারণ্যে ব্যবহৃত। বর্ষাকালে ইহার বক্ষঃ অপেক্ষাকৃত অনেক বিস্তৃত হয়। জল অত্যন্ত আবিল হয়, এবং অতিশয় বেগবান্ হয়। কোন কোন বর্ষে উভয় তট প্লাবিত হইয়া ইহার তীরস্থিত পথ ও গৃহপ্রাঙ্গণ সকলে পর্য্যন্ত জল প্রবেশ করে। শীতকালে ও গ্রীষ্ম ঋতুতে ইহা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ইহার প্রায় সমস্ত বক্ষেই শুষ্ক ও শুক্লবর্ণ পুলিন সকল জাগিয়া উঠে। কোন কোন স্থানে হাঁটু জল হইতেও অনেক কম জল থাকে, কোন স্থানে মানুষ পর্য্যন্তও জল হয়। ইহাতে বিস্তর কচ্ছপ আছে; স্নান করিবার সময় দুই হাতে ঠেলিয়া স্নান করিতে হয়। এত কচ্ছপ যে প্রথমতঃ নামিতে অতিশয় ভয় বোধ হয়, কিন্তু লোকের সঙ্গে ইহাদের এইরূপ ভ্রাতৃভাব জন্মিয়াছে যে, ইহারা কাহারও কিছু অনিষ্ট করে না। ইহার কোন কোন অংশে কুম্ভীরও আছে। কিছু দিন হইল এখানে বিডস্ মিউজিয়ম্ নামে যে একটি মিউজিয়ম ছিল, তাহাতে আমি একটি বৃহৎ কুমীরের কঙ্কাল দেখিয়াছিলাম। সেটি নাকি লোকে এই যমুনার মধ্যেই মারিয়াছিল। তাহার উদরের মধ্যে মনুষ্যের শরীরের যে সকল অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও তাহার শরীর-কঙ্কালের সঙ্গে এক পার্শ্বে আবদ্ধ ছিল। বর্ষাকালে ইহাতে শুশুকদিগকেও উল্লম্ফন করিতে দেখা যায়।

যমুনা ছাড়া আগ্রার প্রায় ৮।১০ মাইল দক্ষিণ দিয়া খাড়ি নদী নামে নালার আকৃতি অতিকৃশাঙ্গী অপর একটি নদী পশ্চিমে ভরতপুরের এলাকা হইতে আসিয়া পূর্ব্বদক্ষিণবাহিনী হইয়া সহরের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে গিয়া এরাদত্ নগরের নামাতে বৌন্ অথবা উতুনখুন্ নামে আর একটি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

বৌন্ নদীও ভরতপুর অঞ্চল হইতে আসিয়া আগ্রার আরও বহুদূর দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গোইতা, পার্ব্বতী ও পূর্ব্বোক্ত খাড়ি প্রভৃতি অতিক্ষীণা পয়ঃপ্রণালীসদৃশী নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া সিকোহাবাদ নামক রেলওয়ে ষ্টেশনের বহুদূর দক্ষিণে যমুনাতে যাইয়া পতিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধা চর্ম্মণ্বতী অথবা চম্বলও আমাদের অপর এক জলৈশ্বর্য্য। যদিও ইহাকে সম্পূর্ণরূপে আমাদের বলিয়া বলিতে আমরা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হই, তথাপি ইহা আমাদের বিভাগের দক্ষিণ সীমার আংশিক পরিখা এবং ইহার মৎস্য-সম্পত্তি আমাদেরই বাবুরচিখানার বিভব। চম্বল ধোলপুরের মধ্যদিয়া আসিয়া আগ্রার প্রায় ১২।১৩ ক্রোশ দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইটাওয়া ষ্টেশনের বহুদূর পূর্ব্ব দক্ষিণে যমুনাতে মিলিত হইয়াছে। ইহা আকৃতি এবং প্রকৃতিতে প্রায় যমুনার সদৃশ।

ইহা ছাড়া সহরের প্রায় ৪ মাইল পূর্ব্ব দিকে অপর একটি আংশিক আর্দ্র পয়ঃপ্রণালী উত্তর দিক হইতে আসিয়া যমুনার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। জল-সম্পত্তি নাই বলিয়া আহ্লাদে ইহাকেও আমরা নদী বলিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন আমাদের বিভাগে মইনপুরী ও ইটাওয়ার মধ্যে শির্বা, সিন্দুর, পীরা. আহমি, উকন্দ, কুলুন্দ্রী, কালী, ইসুন এবং পাণ্ডু প্রভৃতি নদীনামধারিনী কতকগুলা সোতা নালা চারিদিক হইতে যাইয়া যমুনা ও গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। যদিও ইহারা অনেকে বর্ষার মেঘাপগমে ভানুমুখ দেখিয়া শুষ্কতাপ্রাপ্তে পাংশুবুক হইয়া উঠে, তবু গ্রাম্য স্কুলের উপস্থিতিপুস্তকের ছাত্রসংখ্যার ন্যায় ইহারা আমাদের বিভাগের মানচিত্রে নদী সংখ্যা পূরণ করিয়া থাকে, এবং আমরাও ভীষণ লু-বায়ুর দাহসময়ে ইহাদের শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মসিচিত্র দেখিয়া আশ্বস্ত হই। এখানেই যে আমাদের জলবিভব ক্ষান্ত হইল, পাঠকবর্গ কখন এরূপ মনে করিবেন না। ইহা ছাড়াও আমাদের বিভাগে ঝিল ও হ্রদ নামধারী খানা, ডোবা ও গর্ত্ত এদিকে ওদিকে ছড়ান আছে, এবং প্রকৃত ঝিল ও হ্রদও আছে। এই বিরুক্ষ দগ্ধবক্ষ মহামরু রাজস্থানের পার্শ্বে থাকিয়া আমরা কিরূপে এত সোতা, নালা, খানা, ডোবা, হ্রদ এবং ঝিলের অধিপতি হইলাম? যে রাজস্থানের অন্তর্গত বিকানোর প্রদেশে প্রবাদ আছে যে, খৃষ্টীয় ১৮৬১ সনে টাকাতে চারি সের জল বিক্রয় হইযাছিল এবং যাহার অধিবাসীদিগের মধ্যে কেহ একবার আগ্রাতে আসিয়া যমুনার প্রবাহ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিল যে, "আরে! ইকেইসা, তমাম্ জল বহ্ চলা কোই ইসে বাঁধ নেহি রাখ্তা!" ঈদৃশ অঞ্চলের ধারে কাছে এত জলস্থলীর বিদ্যমানতা, কিরূপে সম্ভবে? পাঠকবর্গ এবিষয় আন্দোলন করিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইতে পারেন। আমরাও মানচিত্র দেখিয়া প্রথমে তাহাই হইয়াছিলাম? কিন্তু বিশেষ অনুধাবন দ্বারাই সেটি আমাদের মন হইতে দূর হইয়াছে। আমাদের পদতলেই যমুনা এবং যমুনার আর এক পার্শ্বেই খানিক দূর দিয়া গঙ্গা বহিতেছে। মইনপুরী, ইটোওয়া, ফরক্কাবাদ, এটা এবং

মথুরা প্রদেশের অধিকাংশ, সমুদয়ই এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রবৎ ভূমিতে অবস্থিতি করিতেছে। এই ভূমিখণ্ডকে এখানে দোয়াব বলে। দোয়াব অর্থাৎ দুই জলের মধ্যবর্ত্তী ভূমি। এই দুই ভারতপ্রসিদ্ধ নদীর মধ্যবর্ত্তী হওয়াতেই এই স্থান সকল সর্ব্বদা ইহাদের দ্বারা ধৌত হইয়া হইয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে। যদিও আমি কখন এসকল স্থানে যাইয়া দেখি নাই,তথাপি মানচিত্রস্থ প্রতিরূপ দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, ইহারা এই নদীদ্বয়ের গতি পরিবর্ত্তন দ্বারা বারে বারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ইহাদেরই থিতান পদার্থ সকল দ্বারা পুনঃ পুনঃ বচিত হইয়াছে। ইহারা এই উভয় নদীবই শুষ্ক গর্ভ ভিন্ন আব কিছু নয়। অতএব এ সকল স্থানে এত বিল, ঝিল এবং সোতা, নালা থাকিবার এই কারণ। কোন কোন বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে বাঙ্গলা দেশের সদৃশ। শুনিয়াছি গ্রীষ্মকালে লু-বায়ু ইহাদের শরীরোপরি কিঞ্চিৎ মন্দভাবে বহিয়া থাকে। বর্ষাতেও আর্দ্রতার তত প্রকোপ হইতে পারে না। এই অঞ্চলের অনেক স্থানে নীল জন্মে। পাঠকবর্গ আমাদিগকে যেন সম্পূর্ণভাবে অগ্নিদগ্ধার মধ্যে গণনা করেন না। যদিও আমাদের অব্যবহিত পশ্চাৎদিক হইতে রাজস্থানের মরুস্থলীরূপ চুল্লী, শীতের ছয় মাস নির্ব্বাপিত থাকিয়া, সমস্ত নিদাঘ আমাদিগকে উত্তপ্ত তন্দুর মুখে ফেলিয়া ভাজিতে থাকে, তবু আমরা আমাদের বিভাগীয় প্রতিবেশিবর্গের জল-সম্পত্তির কথা শুনিয়া শ্রুতিপথে অনেক স্নিগ্ধ থাকি। এককালে কবাব হইয়া যাই না। আমাদেব দৈনিক আহাবেব মৎস্যোপকরণ এই সকল নদী, নালা, বিল, ঝিল হইতেই যোগান হইয়া থাকে। রোহিত, কাতলা, কালীবাউস, বোয়াল, ছোট ছোট চাইন, ফলি, চিতল, মিরকা, পাঙ্গাস, গজার, সরপুঁটী, পুঁটী, খরশুন, চেনা,বাঁশপাতি, টেঙ্গরা, ক্ষুদ্র চিঙ্গরী, নারিকেলি,বাচা, রিঠা,আইর, চাঁদা, পোঁয়া, ফেশুয়া, চাপিলা, ছোট ছোট শকুল, মাগুড, শিঙ্গী, কাঁকড়া এবং কখন কখন ইলিশ পর্য্যন্তও পাইয়া থাকি। ইলিশ, ফাল্গুন, চৈত্র এবং বৈশাখ এই তিন মাসের মধ্যে কোন কোন দিন পাওয়া যায়। এখানে ইলিশ শব্দ শুদ্ধ ইলিশের আকৃতি এবং অবয়ব বাচ্য। স্বাদবোধক নয়। ইহাকে যখন পাই, তখনই অন্তঃসত্বা অবস্থায় পাই। ডিমেই ইহা প্রায় সর্ব্বস্বাপহৃতা হইয়া থাকে। অন্য অন্য মৎস্যেরা আপনাদের ঋতু অনুসারে উপস্থিত হয়। রোহিত, কাতলা, মিরকা এবং বোয়াল প্রায় বার মাসই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের মৎস্য অপেক্ষা শীতের মৎস্য কিছু স্বাদু। তত আঁইশের গন্ধ থাকে না। ফিরিঙ্গী ভায়াদের জন্য খরশুন মাছে হাত রাখিবার যো নাই। এদেশে বাসার ভৃত্য কাহার-জাতিরাই মৎস্য বিক্রয় করে এবং নৌকাবাহক মাল্লা

জাতীয়েরাই মৎস্য ধরে। কখন কখন কাহারেরাও ধরে। এখানে মৎস্যের কোন বাজার নাই। কাহারেরা স্ত্রীপুরুষে মাথায় করিয়া করিবা বাঙ্গালি, ফিরিঙ্গী এবং মুসলমান এই জাতির মধ্যে বিক্রয় করে। বোধ হয় এই তিন জাতি এই অঞ্চলে আসিবার পূর্ব্বে এদেশে মৎস্যের ব্যবহার ছিল না, ব্রজধর্ম্ম এবং জৈন ধর্ম্মের শাসনই ইহার বোধ করি এক মাত্র কারণ। মরা খায় বলিয়া যদিও এদেশের কচ্ছপ খাইতে অতিশয় ঘৃণা হয় এবং কখন কোন বাঙ্গালি কি ফিরিঙ্গী খায় না, কিন্তু তাহার ডিম মৎস্যবিক্রেতাদিগকে বলিয়া আনাইয়া খাইয়া থাকে। হকিমি মতে মাছ গরম বলিয়া গ্রীষ্মকালে এদেশের মুসলমানেরা কেহ খান না। এই গতিকে একটুকু শস্তা হয়। কিন্তু খাইতে বড় ভাল লাগে না। বিশেষতঃ বড় বড় মাছ। বড় মাছ মাত্রেরই পেট চিরা থাকে সুতরাং তাহাদের আভ্যন্তরিক অনেক খাদ্যাংশ পাইবার যো থাকে না। অনেক সময় মনোমত এবং অভিরুচি-গত দ্রব্য লাভের জন্য বাঙ্গালিরা মৎস্য বিক্রেতাদিগকে পুরাতন বস্ত্রাদি দান করিয়া উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।

আগ্রা ও যমুনা সম্বন্ধে আর একটি বিষয় পাঠক বর্গকে পূর্ব্বে কহিতে ভুলিয়াছি। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যমুনা এবং গঙ্গার গর্ভ নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। ইহাদের গর্ভ-পরিবর্ত্তন দ্বারাই পার্শ্ববর্ত্তি স্থানাদির আকৃতি এবং প্রকৃতিগত অনেক বৈলক্ষণ্য জন্মিয়া থাকে। শুনা যায় যে, আগ্রা হইতে পূর্ব্বদক্ষিণে প্রায় ১২। ১৩ মাইল দূরে যমুনার একটি পরিত্যক্ত শুষ্ক গর্ভ আছে। ইহা প্রস্থে কোন কোন স্থানে ১½ মাইলের অধিক হইবে এবং দীর্ঘে কোন কোন স্থান ২০ মাইলের ও অধিক হইবে। বর্ষাকালে এখনও এই গর্ভ অংশতঃ প্লাবিত হয়। কার্লাইল সাহেব বলেন, এবং তাহা অনেক সম্ভব যে, যদি হিন্দুদিগের সময়ের প্রাচীন আগ্রা খুজিতে হয়, তাহা হইলে এই পুরাতন গর্ভের পার্শ্বস্থ গ্রামাতে খোজাই কর্ত্তব্য। বাস্তবিক এইক্ষণ ভারতবর্ষে যত নগর বিদ্যমান আছে,* তাহাতে প্রাচীন হিন্দুদিগের কীর্ত্তি-সমাধি দেখিতে হইলে, আধুনিক নগর সকলের পার্শ্ববর্ত্তি স্থানাদি খনন করিয়া দেখিতে হয়।

কোন নবীন অভ্যাগত বঙ্গবাসী, যখন বাষ্পীয় শকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘপর্য্যটনজনিত শরীর-গ্লানি হইতে কিঞ্চিৎ অবকাশ পান, এদিকে ওদিকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, এবং পথের এপাশে ওপাশে ছাটিয়া মুহুর্মুহুঃ নগরের মুখচ্ছবির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তখন সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার মনে একটি ধূলিধূসরিত বিরুক্ষ ভাবের উদয় হইয়া থাকে; এবং সুস্নিগ্ধ শ্যামল লতাপত্রতরুগুল্মাদির গাঢ় অবগুণ্ঠনে সুন্দর

অবগুণ্ঠিতা বঙ্গভূমির সান্নিধ্য হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেন চতুর্দ্দিকে কেবল হাহাকারের প্রতিকৃতি দেখেন। গৃহাদির প্রতি নয়নপাত করিলে দেখেন, কেহ আতপভয়ে মস্তকে খড় বাঁধিয়া, কেহ সুজীর্ণ পুরাতন পতনোন্মুখ গাত্রবেষ্টনে দরমা জড়াইয়া, কেহ শৈবালে লেপিত, কেহ তৃণাঙ্কুরে রোমাঞ্চিত ভগ্ন কর্পরে বলিয়া, কেহ পলিতকেশনিভ মর্ম্মরগ্রথিত মস্তকে বিচূর্ণচূড় হইয়া, কেহ সুবর্ণকলস মস্তকে মর্ম্মরাম্বরে আপাদশির আচ্ছাদিত করিয়া ও পদ্মাসনে যমুনাতটে উপবিষ্ট হইয়া, কেহ সদ্যঃ চূর্ণ-ধৌত-কলেবরে বিবিধ রঙ্গমালায় কণ্ঠ বিরঞ্জিয়া, কেহ আবার তাহারই পার্শ্বে গলিতত্বকে ও জানু-জঙ্ঘা-কপোল-বিভগ্নে বিকটাস্য হইয়া এবং কেহ বিক্ষিপ্ত শরীর ইষ্টকে ধরা পৃষ্ঠে পতিত রহিয়া অতি গম্ভীর ভাবে মনুষ্যকণ্ঠের অবিরাম কল কল ও যানাদির খট খট ও ঘর্ঘরের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান চিন্তারূপ যোগে যেন নিস্পন্দ নিমগ্ন রহিয়াছে। চারিদিক হইতে ব্রজের রজোরেণু উড়িয়া উড়িয়া সকলের গাত্রে লাগিতেছে। ধূলিরই মঞ্চ, ধূলিরই আসন, এবং ধূলিরই ধুনী। যে দিকে দেখা যায়, কেবল ধূলাই ধূলা। বাস্তবিক আজি কালি আগ্রার ধূলাই প্রথম প্রধান প্রাকৃতি[illegible] সম্পত্তি। জানি না, আকবর কি দে[illegible] হাকে মনোনীত করিয়াছিলেন।

দুটি মাস নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গেলে, অবশিষ্ট দশ মাস আগ্রা কেবল ধূলিতরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। এত ধূলা হইবার বোধ হয় দুটি কারণ। প্রথমতঃ ইহার মৃত্তিকাই স্বাভাবিক পাংশুল ও আঁঠা শূন্য। দ্বিতীয়তঃ, বিবিধ প্রকারের যানাদি অনবরত অবিশ্রান্তভাবে ইহার পৃষ্ঠকে ঘর্ষণ করিয়া থাকে। ইহার পৃষ্ঠোপরিস্থ অণুসংহতিতে যে কিঞ্চিৎ যোগাকর্ষণ আছে, তাহাও প্রতিনিয়ত ইংরেজিশকট এবং দেশীয় এক্কা, বহেলী ও উষ্ট্র সিকরমের চক্রঘর্ষণে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহার শরীরস্থ প্রায় দ্বিহস্ত প্রমাণ মৃত্তিকা বর্ষে বর্ষে আকাশপথে উড্ডীন হওতঃ দূর দূরস্থ রাজ্যাদিতে নিক্ষিপ্ত হয়। এখানকার ক্ষেত্রাদির মৃত্তিকাও এইরূপ পাংশুল এবং মরুবর্ণ অর্থাৎ ঈষৎ পীতাভ। জলে সিক্ত না করিলে ডেলা বাঁধে না। যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকার স্বাভাবিক ডেলা বাঁধা হয়, শুনিয়াছি তাহা অতিশয় উর্ব্বর এবং তাহার প্রতি বিঘাতে কৃষককে বার্ষিক সাত আট টাকা কর দিতে হয়। মধ্যম শ্রেণীর ভূমিও কিঞ্চিৎ ডেলা বাঁধা হয় এবং তাহাতেও শস্যাদি উৎপন্ন হয়। বিঘা প্রতি ইহারও তিন চারি টাকা কর দিতে হয়। অধম শ্রেণীর ভূমি অধিকাংশই ক্ষার ও কঙ্করময়। ইহাতে উষ্ট্রের খাদ্য নানা প্রকার কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই জন্মে না। যখন আমরা কোন কোন সময় ক্ষেত্রাদিতে ভ্রমণ করিতে যাই, তখন আমরা দেখি যে, কোন কোন স্থান সুভ্র-

তোক্ত ঔদ্ভিদ-লবণ দ্বারা শুক্লীকৃত হইয়া আছে। কোন কোন খানে সোরাও দৃষ্ট হয়। নগরের অভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকাতে এত সোরা যে, নূতন কোন গৃহ নির্ম্মিত হইলে, কএক বৎসরের মধ্যেই ইহার আক্রমণে জর্জ্জরিত হইয়া উঠে এবং প্রাচীরস্থ চূর্ণের আস্তর সকল খসিয়া খসিয়া পড়ে। ইষ্টক সকল চূর্ণ হইয়া ঝুর ঝুর করিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহে এরূপ হইতে দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন বহুকাল হইতে মনুষ্য এবং পশুমূত্র সঞ্চিত হইয়া এরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বে সহরেরই উত্তরপশ্চিম প্রান্তে মণ্ড নামক গ্রামের কাছে এক প্রকার লবণ জন্মিত, এখন তাহা সরকার হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যমুনার ধারে আকবরের সময়ের সোরাওয়ালী কুঠীনামে একটি বৃহৎ বাটী আছে; এইক্ষণ তাহা মথুরার প্রসিদ্ধ ধনী লক্ষ্মী চাঁদ শেঠ কিনিয়া লইয়াছেন। শুনা যায় যে, আকবরের সময়ে এখানে সোরা প্রস্তুত হইত।

আগ্রার সহর সমুদয় একস্থানে একত্রীকৃত নয়। ইহা অংশে অংশে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত এবং সহরের মধ্যে মধ্যে অনেক বিস্তৃত বিস্তৃত শূন্য স্থান সকল পড়িয়া আছে। এ সকল শূন্য স্থানের অনেক গুলা পূর্ব্ব হইতেই শূন্যাবস্থায় আছে, এবং কতক গুলা প্রাচীন গৃহাদির বিলোপে ক্রমে শূন্য হইয়া উঠিয়াছে। কাশী এবং দিল্লীকে কোন অত্যুচ্চ স্থানে বসিয়া যেরূপ মনোহর দেখায়, ইহার শরীরের অভ্যন্তরে অনেক শূন্য ভূমি থাকাতে ইহাকে সেরূপ সুন্দর দেখায় না। এরূপ হওয়াতে যদিও ইহা নয়নের আরাম দায়ক হয় নাই বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের অনেক আরামজনক হইয়াছে। স্থানে স্থানে বায়ু সুন্দররূপে খেলিতে পারে বলিয়া অনেক পরিষ্কৃত থাকে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইহার এক একটি অংশও নিতান্ত অবিস্তৃত নয়। ইহার সমুদয় অংশ এক স্থানে একত্রিত হইলে, ইহাকে বর্ত্তমানাপেক্ষা অত্যন্ত বিস্তৃত দেখাইত। ইহার গাত্রোপরিস্থ ভূমি, আমাদের দেশের ভূমির ন্যায় তত সমতল নয়; সর্ব্বত্রই প্রায় উচ্চ নীচ। যদিও এখানকার বর্ষা অতিশয় ক্ষীণ, তবু ইহার মৃত্তিকা অনেক শ্লথ বলিয়া নানাদিক হইতে আগত বর্ষার জল-গতি দ্বারা ক্রমে ধৌত হইয়া হইয়া স্থানে স্থানে বড় বড় নালা সকল প্রস্তুত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে কঙ্কর-প্রস্তরমিশ্রিত মৃত্তিকার বিস্তৃত স্তূপ সকল দাঁড়াইয়া আছে। লোকেরা তাহার উপরে গৃহ অট্টালিকাদি তুলিয়া বাস করিতেছে। এই জন্যই সহরের বক্ষঃ এই সকল নালার গর্ত্ত দ্বারা এক প্রকার এবড়ো খেবড়ো হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কোন নালা প্রায় পঁচিশ ত্রিশ মাইল হইতেও দীর্ঘ। পীপলমণ্ডি নামক সহরের একটি অংশ এইরূপ একটি নালার ও অংশের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। বর্ষার সম... মধ্যে স্থাপিত গৃহাদির কটি দেখি.

চলিতে থাকে। কলিকাতাতে সাহেবেরা এত অর্থ ব্যয় করিয়াও যাহাতে কৃতকার্য্য হইতেছেন না, এখানে প্রকৃতি আমাদিগাকে আপন যত্নে বিনা ব্যয়ে তাহা-করিয়া সর্ব্বদা শুষ্ক বিছানায় সুস্থ রাখিতেছে।

মৃত্তিকার হাত কএক নীচেই কঙ্কর প্রস্তরের স্তর। পূর্ব্ব বাঙ্গালার মৃত্তিকাতে কোন খানেও ইহা নাই। থাকিবার বোধ হয় কারণও নাই। কিন্তু রাঢ় দেশের কোন কোন স্থানে আমি ইহা দেখিয়াছি। তাহারা ইহাকে ঘেটেং বলে এবং ইহা ভস্ম করিয়া চূণা প্রস্তুত করে। এখানেও তাহাই করে। এখানে সাধারণতঃ সমস্ত চূণার কর্ম্ম ইহাকে ভস্ম করিয়া হয়। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণ-প্রস্তর। আকৃতি অত্যন্ত বন্ধুর। ইহাকে কুটিয়া গুঁড়া করিয়া এবং তদ্দ্বারা কর্দ্দম প্রস্তুত করিয়া কুম্ভকারেরা এক প্রকার সুন্দর অতি পাতল সুরাই প্রস্তুত করে। এই সুরাইতে সাধারণ মাটির সুরাই হইতে জল অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। এখানে ইহাকে ‘ কঙ্কর কা সুরাই ’ বলে। ভূমির অব্যবহিত নীচেই এই চূর্ণ প্রস্তরের স্তর থাকাতে এখানকার কূপোদক মাত্রেই চূণের অংশ থাকে। কোন খানে কম, কোন খানে বেশি। এই চূণের অংশ এবং তৎসহ সোরা ও অন্যবিধ ক্ষারজ লবণের অংশ মিশ্রিত থাকাতে এখানকার প্রায় সমুদয় কূপোদকই খাইতে বিস্বাদ। কেবল যমুনার পার্শ্ববর্ত্তি কূপোদকেই এ দোষ নাই। থাকিলেও সহজে জিহ্বাতে অনুভব করা যায় না। এই চূর্ণ-প্রস্তরের স্তর ভেদ করিয়া আরও অনেক নীচে চলিয়া গেলে মিষ্ট জলের স্তর পাওয়া যায়। আমার পরিচিতের মধ্যে কোন একটি সমৃদ্ধিশালী ক্ষত্রিয় বাড়ীতে বসিয়া মিষ্ট জল খাইবার আশায় এখানকার ইঞ্জিনিয়র সাহেবদিগের দ্বারা আপনার গৃহপ্রাঙ্গণে বহু অর্থব্যয় করিয়া একটি কূপ খনন করাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন মতেই মিষ্ট জল পাইতে পারিলেন না। উপরিস্থিত স্তর সকলের মধ্যদিয়া বর্ষা এবং অন্যান্য প্রকারের জল সকল চোঁয়াইয়া পড়িয়া কূপের নিম্নস্থ জলকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

উপরোক্ত কঙ্কর ব্যতীত, ইহার বক্ষে চিকনী ও পোতানি নামে আরও দুই প্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়। তাহা এখানকার সাধারণ লোকেরা গৃহ-প্রলেপে ব্যবহার করিয়া থাকে। সাহেবেরাও অনেক সময়ে পরিমিতব্যয়িতা'র অনুরোধে আপনার প্রাঙ্গণস্থ বহিঃ-প্রাচীরাদিতে ইহার প্রলেপ করাইয়া থাকেন। ইহার প্রলেপ দেখিতে চূর্ণের প্রলেপ হইতে বড় কম সুন্দর দেখায় না।

(ক্রমশঃ) (প্রবাসী)

তরঙ্গিণী।

গীতি-কবিতা।

(রাগিণী লগ্নী, তাল জৎ)

বড়ই সাধের তুমি সজনি আমার রে,
তরঙ্গ-রঙ্গিনি !
যখনি দেখিতে যাই
তখনি দেখিতে পাই
নূতন-মূরতি তব নয়ন-রঞ্জিনী।
প্রেমের প্রবাহ তুমি প্রাণ-বিনোদিনি।

২

কত লীলা ও তনুতে, কতই ভঙ্গিমা রে,
বিভ্রম, ভামিনি !
চাঁদের আলোতে হেসে,
চাঁদের আলোতে ভেসে,
চলেছ চটুলে কোথা বল তাহা শুনি।
হাসিছে তোমার সুখে সুখদা যামিনী।

৩

কার না জুড়ায় প্রাণ হেরিলে ও রূপ রে,
রূপ-বিলাসিনি !
আকাশে একটি চাঁদ,
হৃদে তব কোটি চাঁদ,
জড়িত জ্যোৎস্নায় তুমি রস-তরঙ্গিণি !
তুমিই কি বিয়োগীর সন্তাপ-বারিণী ?

৪

যৌবন-জোয়ারে তব খেলিছে লহরী রে,
ভুবন-মোহিনী,
লহরে লহরে মরি
উথলিছে কি মাধুরী
কি গরিমা, কিবা ছটা ভুজঙ্গ-গঞ্জিনী,
পুলিনে মলিন লাজে বন-সোহাগিনী।

৫

মৃদুল মৃদুল বহে ধীর-সমীরণ রে,
অধীর-গামিনি !
অধীর সে পরশনে,
বুঝি না কি ভেবে মনে,
কি মায়ায় কি ছলনা খেল মায়াবিনি !
একি পুনঃ ? তালে তালে নাচিছ তটিনি ?

৬

আবার আবার একি ভীষণ হিল্লোল রে,
তট-বিঘাতিনি !
কেন এই গরজন
এ নিঠুর দরশন
নিরখি অম্বরে ওই নীল-কাদম্বিনী,
পরকীয় ছায়াও কি ছোঁয় না মানিনী ?

৭

কল কল কল নাদে কি কথা কহিছ রে,
কল-নিনাদিনি !
অস্ত যায় রবি শশী
পোহায় দুঃখের নিশি
তবু হায় না ফুরায় তোমার কাহিনী
কার প্রেমে বল রঙ্গি, তুমি উন্মাদিনী ?

৮

মরমের দুখ আজি কহিব তোমায় রে,
ভূধর-নন্দিনি !
তব তটে বসি' বসি',
অশ্রু জলে সদা ভাসি,
মিবার এ অশ্রু-বারি দুঃখীর-সঙ্গিনি !
প্রেমময়ি ! প্রেম-দয়া, করুণা-রূপিণি !

৯

বড়ই সাধের তুমি সজনি আমার রে,
তরঙ্গ-রঙ্গিণি !
'কোথা যাও ফিরে চাও
সঙ্গে মোরে লয়ে যাও
তরল-তরঙ্গ-ময়ি ! অনন্ত-গামিনি !
ভাসাব তরঙ্গে তব জীবন-তরণী। (শ্রীবঃ)

সংক্ষিপ্তসমালোচন ।

১। 'মিত্রপাঠ ; অ.　　মিত্র প্রণীত।'—বঙ্গদেশের ইহা এক.　　লক্ষ যে, যাঁহাদিগের কবিত্বশক্তি আছে, তাঁহারা বালকবালিকাদিগের জন্যে কাব্য লেখেন না। ইহার এক কারণ এই, এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে,তাঁহারা প্রায়শঃই স্বজনবৎসল ও অনুগত-পালক শিক্ষাসমাজের নিকট বিড়ম্বিত হন ;—আর এক কারণ এই, তাঁহারা কাব্যের বিপণিতে যাঁহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করেন, ঈদৃশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা দূরে থাকুক,—সেই অনন্ত কোটি লেখকবর্গের সহিত তাঁহারা সময় বিশেষে মল্লযুদ্ধ করিতেও বাধ্য হন। বর্তমানকাব্যের রচয়িতা উল্লিখিত বিড়ম্বনা গঞ্জনা উভয়েরই প্রতি দৃক্‌পাতশূন্য হইযা এই বালক পোষণে যত্নশীল হইয়াছেন। তাঁহার 'মিত্রপাঠ' বালকশিক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। যে শ্রেণির বালকেরা বোধোদয় পড়িয়া থাকে, তাহারা মিত্রপাঠ পড়িলে ভাষা শিখিবে, অথচ জ্ঞান লাভ করিবে'।

২। 'কুন্দমালা। নিসর্গ সুন্দরী-প্রণেতা শ্রীশারদা প্রসাদ স্মৃতিরত্ন বিরচিত।' এদেশীয় কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে ইদানীং যাঁহারা প্রসিদ্ধ ও প্রথিতনামা হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিল্টন, বায়রণ, স্কট ও টেনিসন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের মন্ত্রশিষ্য। তাঁহাদিগের বাঙ্গালা কবিতা ইংরেজী কবিতার নূতন এক মূর্ত্তির মত। বিলাতের বিবিদিগকে সাড়ী এবং বলয় চন্দ্রহার প্রভৃতি আভরণ পরাইয়া বৌ সাজাইলে, অথবা এদেশের বধূদিগকে গাউন পরাইযা বিবি সাজাইলে যেমন দেখায়, ঐ সমস্ত কবিতাও আমাদিগের নিকট তেমনি প্রতীত হয়। দেখিতে সুন্দর,—শোভায় অপূর্ব্ব ; কিয়ৎপরিমাণে নূতন নূতন, অথচ স্থিরচক্ষে তাকাইলে পরিচিতপূর্ব্ব। স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির গুরুস্থান স্বদেশ। তাঁহারা যাহা কিছু শিখিয়াছেন, তাহা কা-

লিদাস, ভারবি ও ভবভূতি প্রভৃতি ভারতীয় কবিসম্প্রদায়ের নিকট। সুতরাং তাঁহাদিগের কবিতায় ঐ অপূর্ব্বত্ব, ঐ নূতনত্ব নাই। কিন্তু অপূর্ব্ব ও নূতন না হইলেও কুন্দমালার মত কবিতা অবহেলার বস্তু নহে। আমরা নিসর্গনন্দবীর নির্ম্মল কান্তি দেখিয়াই স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে কবি বলিয়াছি, তদীয় অশ্রুজলসিক্ত কুন্দমালার গাঁথনি দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তির বিকাশবিষয়ে আশান্বিত হইলাম।

৬। 'কবিতামুকুর। শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।' গ্রন্থকার তদীয় বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় দফায় লিখিয়াছেন ; "—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি নবাবসরকারে চাকরি করিয়া মজুমদার খেতাব প্রাপ্ত হন, এবং তদবধি আমাদের বংশাবলী ঐ খেতাবে আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু আপাততঃ ঐ খেতাব মনোরম বোধ না হওয়ায় আমাদের চিরপ্রচলিত মুখোপাধ্যায় উপাধি গ্রহণ করা গেল।"

একথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই। কত লোক কত অসৎকর্ম্ম করিয়া খেতাব লইতেছে, অথচ কেহ তাহাদের নিন্দা করিতেছে না। এমত স্থলে আমাদের গ্রন্থকার কেতাব লিখিয়া খেতাব লইবেন, অথবা পুরাতন খেতাব, পুরাতন জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতে ইহ খণ্ড নশ্বর জগতে কোন্ পাষাণচিত্ত দুর্নীত ব্যক্তির আপত্তি হইতে পারে? কিন্তু গ্রন্থকার তদীয় বিজ্ঞাপনের প্রথম দফায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের নানারূপ আপত্তি আছে। প্রথম দফার প্রথম পংক্তি এই,— "কয়েকটি কবিতা বিরচিত করিয়া কবিতামুকুর প্রকাশিত হইল।" বাঙ্গালা ভাষা বেওয়ারিশী মাল হইলেও ইহাতে এইরূপ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ ও রীতিবিরুদ্ধ বাক্য গ্রথিত হওয়া অনুচিত। দ্বিতীয় আপত্তি 'পরাপরা[illegible] দণ্ডং।' গ্রন্থকার লিখিয়া[illegible] কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]হাদয়ের রীতি অবলম্বন পূর্ব্বক অধিকাংশ কবিতাগুলি লিখিত হইয়াছে।" এই কথায় আমাদের কেন, অনেকেরই আপত্তি হইতে পারে। গ্রন্থকার কিরূপ কবিতাকে হেমচন্দ্রের অনুকৃতি বলেন, নিম্নে তাহার একটি প্রদর্শিত হইল।

"আশীলক্ষ বর্ষ পশ্বাদি জনম,
জনমি জগতে, ভুঞ্জিয়া অসম
যাতনা যতেক, জীবাত্মা চরম,
হয় দৃষ্ট ভবে মানবাকারে।
কত বিড়ম্বনা কঠোর নিগ্রহ,
ভোগ-শেষ হয় টুটে যবে গ্রহ,
যায় তবে পেয়ে ঈশ-অনুগ্রহ,
আগ্রহে জীবাত্মা পবিত্রাধারে।"

এই কবিতাটিতে হেমবাবুর অনুকরণের মধ্যে আমরা এই দেখিয়াছি,—ইহার একস্থানে লেখা আছে 'প্রয়োগ',—আর একস্থানে লেখা আছে, 'শাখা' এবং তৃতীয় একস্থানে লেখা আছে

'পূর্ণকোরস্'। অনুকরণ মন্দ নহে।

৪। 'কবিতা প্রসূনমালা। শ্রীরজনীকান্ত বসু প্রণীত।' এখানিতে নানাবিধ নীতি কথা আছে। যথা,—

"হে মানব! যে প্রতিজ্ঞা কর একবার,
দেখ যেন নাহি হয় অন্যথা তাহার।
বাক্যে যা বলিবে তাহা অবশ্য করিবে,
নতুবা বিভুর কাছে অপরাধী হবে।
প্রত্যয় হবে না কারু তোমার বচনে;
অতএব কর যত্ন প্রতিজ্ঞাসাধনে।"

৫। 'ভারত-উদ্ধার। অথবা চারি আনা মাত্র। (ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা) শ্রীরামদাস শর্ম্ম-বিরচিত।' আমরা কবিতা মুকুর এবং কবিতা প্রসূন-মালার সঙ্গে সঙ্গেই যে, ভারত উদ্ধারের নাম করিলাম মান্যবর শ্রীযুক্ত রামদাস শর্ম্মা ইহাতে অবশ্যই পুলকিত হইবেন, এবং বিনা যত্নে, বিনা পরিশ্রমে এবং অত্যল্পমাত্র অর্থ ব্যয়ে কবি সমাজে স্থান পাইলেন বলিয়া অবশ্যই তিনি আনন্দ ভরে অশ্রুপাত করিবেন। কিন্তু তথাপি আমাদিগকে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, ভারত উদ্ধারের অপর নাম 'চারি আনা'—কবিতা মুকুর এবং কবিতা প্রসূন মালার অপর নাম 'ছয় আনা।' বঙ্গে অদ্যাপি গুণাগুণের তারতম্যানুসারে কাব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হয় কি না,—অদ্যাপি লোকে কাঁচ কাঞ্চনের পার্থক্য দেখিয়া আপনা হইতেই আপনার উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লয় কি না, ইহা হইতেই রস-ভাব-বিচার-সক্ষম বিচক্ষণ পাঠকবর্গ তাহা অনুভব করিতে পারিবেন।

মূল্য-গত তারতম্যের কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপে সমালোচনা করিতে হইলে আমাদিগের বলা আবশ্যক, রামদাস শর্ম্মার এই নূতন কাব্য বাঙ্গালা ভাষার এক নূতন সৃষ্টি। ইহার প্রত্যেক বাক্য এবং প্রত্যেক পংক্তিই রচয়িতার অসাধারণ মনস্বিতা এবং অনন্যসাধারণ ব্যঙ্গবর্ণন-শক্তির পরিচয় প্রদান করে। ফলতঃ এই কাব্যখানির আদ্যন্ত পাঠ করিলে মনে সর্ব্বাগ্রেই এই প্রতীতি জন্মে যে, বাঙ্গালার বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য এবং নাম কাটা সিপাহিদিগকে যদি কেহ চিনিয়া থাকে, তবে চিনিয়াছেন রামদাস শর্ম্মা, এবং বাঙ্গালার অন্তঃসারশূন্য অকর্ম্মণ্য বাগ্মী ও লেখকবর্গকে উপদেশ দেওয়ার জন্য যদি কোন ব্যক্তি উপযুক্ত হইয়া থাকেন, সেই ব্যক্তিও আমাদের এই রামদাস শর্ম্মা।

উৎসাহ উপকারজনক, উৎসাহের অনুকরণে বৃথা আস্ফালন যার পর নাই অপকারজনক। স্বদেশবাৎসল্য সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়, কিন্তু স্বদেশবাৎসল্যের নাম লইয়া সময় ও শক্তির অপচয় করা, এবং নট ও নটীর মত রঙ্গভূমিতে নৃত্য করিতে যাওয়া সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। কৃষিকার্য্য পৃথিবীর উপকারি,—পার্থিব প্রয়োজনে অপরিহার্য্য, কিন্তু কৃষিকার্য্যের অনুরোধে মার্জ্জারের দ্বারা হল-

চালনা, মুষিকের দ্বারা ক্ষেত্রোৎকর্ষ-বিধানের চেষ্টা একান্ত উপহাসের বিষয়। সাধনায় স্বর্গ আছে, কিন্তু সিদ্ধির প্রথম সোপান শিক্ষা। ইত্যাদি গভীর তত্ত্বকে অতিরুস্য্যর বিদ্রূপচ্ছলে বর্ণনা করাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্য বিষয়ে গ্রন্থকারের মনোরথ সফল হইয়াছে। যে তাঁহার এই ত্রিচত্বারিংশৎ পৃষ্ঠাত্মক পুস্তকখানি লইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল উপবিষ্ট রহিয়াছে, সেই প্রথমে হাসিয়াছে,—হাসিয়া অন্যকে হাসাইয়াছে, এবং পরিশেষে প্রতপ্তহৃদয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছে।

রামদাস শর্ম্মার অমিত্রাক্ষর পদ্য নিতান্ত প্রীতিপ্রদ। ভাষা লইয়া ক্রীড়া করিতে, ভাষার রস-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া পাঠকের চিত্তে তৃপ্তি জন্মাইতে তাঁহার অণুমাত্রও আয়াস হয় না। তিনি নিরন্তর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং শ্লেষ পরিহাসে ব্যাপৃত রহিয়াও দুই এক স্থলে ভুলিয়া কিরূপে অন্যবিধ উচ্চ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিচয়ে তাহা প্রকাশ পাইবে।

"কে বলে নদীর স্রোত কাল-স্রোত-সম?
ভাসাইয়া জবাফুল গঙ্গার সলিলে—
একটি একটি করি বহুতর ফুল,—
সারি দিয়া ভেসে যেতে দেখেছি বাহার
তীরে দাঁড়াইয়া, শেষে বহুক্ষণ পরে,
সাঁতারিয়া সব গুলি এনেছি ধরিয়া।
কিন্তু রে কালের স্রোতে পারিজাত জিনি
অমূল্য কুসুম কত ভাসিয়া গিয়াছে,
দেখিছি নয়নে হায়! পারি নি ফিরাতে!
সাগরে সাঁতার দিলে ফিরে যদি পাই
সুখের শৈশব তবে চাহি না কি আর?
একবার কালস্রোতে পড়িয়াছে যাহা,
তার তরে হাহাকার ভিন্ন কি উপায়?
কে বলে নদীরস্রোত কালস্রোতসম?'

আমাদিগের সুযোগ্য সহকারী আর্য্যদর্শনসম্পাদক ভারত-উদ্ধারের সমালোচনা করিতে গিয়া অভিনববস্তুদর্শনজন্য আনন্দের উৎসাহে ইহার একার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা যদি অধিকতর আনন্দোৎসাহে ইহার অপরার্দ্ধ উদ্ধৃত করি তাহা হইলে আর রামদাস শর্ম্মার 'চারি আনা' লাভ ঘটিয়া উঠে না। অথচ আমাদিগের বিবেচনায় প্রত্যেক বাঙ্গালিরই ইঁহাকে চারি আনা দক্ষিণা দিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্যালাভ করা কর্ত্তব্য। আমরা এই নিমিত্ত ভারত উদ্ধারের আর কোন স্থল উদ্ধৃত না করিয়া কেবল গ্রন্থকারকে আশীর্ব্বাদ মাত্র দিয়াই বিদায় করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা আশীর্ব্বাদ করি, ব্যাস যেমন ভারত-কাব্য লিখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বরে অমর হইয়াছেন, রামদাস শর্ম্মাও সেইরূপ এই ভারত উদ্ধার কাব্য রচনার জন্য বিপিন কৃষ্ণের বরে কল্পতরুর অক্ষয়-ফল লাভ করুন,—এবং হেম-তুলিকা-চিত্রিত শচীর মত ভার্য্যা ও জয়ন্তের মত পুত্র লাভ করিয়া ইন্দ্রের উজ্জ্বল কান্তিতে সমুজ্জ্বল হউন।

যমুনা তটে।

১

যমুনার কাল জল নাচিতে নাচিতে
দেখিনু ছুটিছে দ্রুত হাসিতে হাসিতে,
করি রঙ্গ মনসাধে,প্রেমিকে ফেলিয়া ফাঁদে
ভাগিরথী-কোলে স্রোত সোহাগেতে
ঢালিতে।
উদিত নবীন রবি, ধরিয়া নবীন ছবি,
তরল রূপের ছটা ঝলমল করিছে।
কি মরি সে কম কান্তি! হৃদয়ে জন্মায় ভ্রান্তি,
তরল তপন হতে রূপধারা ঝরিছে!
কাল জলে ভাসি ভাসি ছড়াইয়া রূপরাশি
হাসিমাখা মুখে মরি জনমন হরিছে!
কেমন রবির ছবি যমুনার খেলিছে।

২

মন্দ মন্দ গন্ধবহ ফুলরেণু উড়ায়ে,
হাসিতে মাখায়ে হাসি সুধাধারা ছড়ায়ে,
ফুলদলে নাচাইয়া, লতা পাতা কাঁপাইয়া,
কুঞ্জবন হাসাইয়া মৃদুরবে বহিল।
কালিন্দীর কালজলে আমরি কি কুতূহলে
রবির কণকছটা ঝলমল করিল!—
তরঙ্গে ঢালিয়া অঙ্গ তালে তালে নাচিল।

৩

কালিন্দীর কালজলে কিবা শোভা হইল!
নব ঘনদলে যেন সৌদামিনী হাসিল।—
লতা পাতা তরুদল সব হল সচঞ্চল,
এঁকে, বেঁকে, থেকে থেকে, ধীরে ধীরে
কাঁপিল!
হলে পয় হিমালয়, সেও হেথা হ'ত লয়।
আমরি কালিন্দী কিবা গঙ্গাজলে মিশিল?
নবদার বক্ষে কেরে মসি-রেখা আঁকিল?

৪

ব্রিটিশের জয়স্তম্ভ সমুন্নত বদনে
ভীমদুর্গ ছুটিতেছে চুম্বিবারে গগনে।
ভীষণ গম্ভীর বেশ, ঊর্দ্ধজটা ব্যোমকেশ,
নিমগ্ন গভীর তপে!—সেও আজ কাঁপিল।
দেখিয়া কেহ না দেখে—দেখিয়া কেহ না
শেখে!—
না দেখিয়া কেহ কিংবা মনে মনে শিখিল—
যমুনার কাল জল কত খেলা খেলিল।

৫

দেখিতে দেখিতে ভানু অস্তগত হইল।
হাসি হাসি মুখশশী শশধর উদিল।
আমরি কি রূপরাশি! সকলি উঠিল হাসি—
রসবতী বসুমতী খল খল হাসিল।
রজতের শুভ্রজলে জলস্থল ভাসিল!
তীরস্থিত পুষ্পোদ্যানে পুষ্পরাজি হাস্যাননে
হাসাইয়া জনমন কিবা মরি ফুটিল।
গুণে বশ দিগ দশ, ঢল ঢল সুধারস,
সুধারসভারবাহী সমীরণ ছুটিল!
গুঞ্জরবে অলি সবে দিবা ভ্রমে। জুটিল

৬

সাগর-অম্বরা মহী শ্বেতাম্বর পরিল!—
একাকার ত্রিসংসার! রূপে মন হরিল।

শুভ্র জল, শুভ্র স্থল, ফল, ফুল, তরু দল,
শুভ্রতর নীলাম্বর।—কমনীয় কোলেতে
নবশিশু শুভ্রমুখ—হৃদয়ে উথলে সুখ,
ভাসে যথা হেরি মাতা সুখ-সিন্ধু-জলেতে।
ভেসেছে সকলি পূত সুখ-সুধা-রসেতে।

৭

হায় পূর্ব্ব কথা সব আজি মনে পড়িল।
সুখের সাগরে অই বাড়বাগ্নি জ্বলিল!
চলিয়াছ চল চল, হে যমুনে! বল বল
সে যমুনা তুমি কিগো, যার কালজলেতে
ভাসিত রাধিকা শ্যাম পূত প্রেমরসেতে।
ফুটিত কণকপদ্ম, বিমল অমৃত পদ্ম—
মধুগন্ধে আমোদিত হত সব ধরণী,—
যমুনে! তুমি কি সেই নবঘনবরণী?

৮

যমুনে! তুমি কি সেই মৃদুকলনাদিনী?
কোথা সে গোপের বালা প্রফুল্ল ফুলের ডালা
অধরে মোহনবাঁশী,—বল গজগামিনি,
কোথা রাধা-মনোহর—পরম পুরুষবর?
কোথা সে পবিত্র প্রেম? সুবর্ণের নলিনী?
সেই নৃত্য সেই গীত; সে বাজনা সুললিত
কোথা সেই মহোৎসব? তপনের গরিমা?
ও পবিত্র তব নীর সত্য কি গো কাল চির
কিংবা ভেবে ভেবে মনে পড়িয়াছে কালিমা?
কালিমা হৃদযে যার, কিসে হাসি হবে তার—
পশিলে কুসুমে কীট সে কুসুম ফুটে না।—
হতাশার চিত্তপটে ইন্দ্রধনু উঠে না।

৯

কাল স্বচ্ছ জল তব, তপন তনয়ে!
নহে কভু, পড়িয়াছে কালিমা হৃদয়ে!
উদ্বেলিত চিত্তোচ্ছ্বাস, অত্যুষ্ণ প্রশ্বাস শ্বাস
হৃদয়-পাবক-শ্বাস—স্ফুলিঙ্গের অবনী!
তোমার এ হাসি নয়!—শশী কি উদিত হয়
অমানিশাগগনেতে?—তুমিই যে কেবলি
বাহিরে শীতল রয়ে, অন্তরে গরল বয়ে,
গুমরে গুমরে সদা জ্বলিতেছ ললনে;—
তা নয় তা নয় নয়; অচল সচল চয়
কাঁদিতেছে—পুড়িতেছে সদা মনোবেদনে।
কাঁদিব না আমি আর, আজিকে পেয়েছি সার,
তব তটস্থিত যথা তরু লতা বল্লরী—
বায়ুবিলোড়িত জলে, উত্তাল তরঙ্গ দলে
হয় বটে লণ্ড ভণ্ড,—ভূধর কি নগরী,—
সেই ধ্বংসে কিন্তু নয় ধ্বংস সেই সমুদয়—
কাঁপে বটে প্রভাকর—প্রতিবিম্ব কেবলি।
সেই মত আজ সতী তরঙ্গিত বসুমতী
নীরবিলে বায়ুবেগ হাসিবেক সকলি;—
ফুটিবে ও কালজলে সরসিজ-আবলী।

১০

কুলুকুলু ধ্বনি করি প্রবাহিনী চলিল।
সেই স্বচ্ছ নীরে কিবা চঞ্চল বিদ্যুৎ বিভা
সুবর্ণ ব্রততী কোলে কুমুদিনী দুলিল।
নিশা হল অবসান, বিহঙ্গ ধরিল গান,
শীতল প্রভাত বায়ু মৃদু মৃদু বহিল।
পূর্ব্বাম্বরে কেবা আসি ঢেলে দিল হাসি-রাশি—
আমরি কি রূপ ছটা!—বসুন্ধরা জানিল!
অতি রমণীয় বেশ, কুসুমে সজ্জিত কেশ
সুধাময়ী ঊষাদেবী হাসি উকি মারিল

আ মরি এ কারুকার্য্য অতুলনা !—অত্যা-
শ্চর্য্য !—
প্রসন্ন সহাস্য আস্য পুনঃ রবি উদিল !
আদরে জগতজন নবরসে মাতিল !

১১

অয়ি উষা সুহাসিনী ! অমৃতের আসারে
হাসি যথা মৃদু মৃদু ভাসাইলে সবারে;—
শীতল শিশির জলে জুড়াইলে ধরাতলে—
সঞ্জিবিলে সমুদায় পুন নব জীবনে;—
এ হৃদয় কবে বল হাসাইবে ? মনানল
জুড়াইবে—পাব কি গো ? মধুরস মি-
লনে ?
হে রবি উঠিলে ভাল মাখিয়া কিরণজাল,
কবে হে উঠিবে হাসি এ হৃদয়-গগনে,—
ফুটিবে পরম পদ্ম দেখে তব বদনে।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

ঝিন্দন।

ঝিন্দন ভারতীয় ইতিহাস পটের এক-খানি প্রধান চিত্র। প্রধান চিত্র বলিয়াই অদ্যাপি বৈদেশিক সমালোচক গণ ইহা লইয়া কৌতুক-প্রিয় জনগণের সমক্ষে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছেন। এই আস্ফালন যাহারা দেখিতেছে, অথবা লোকপরম্পরায় ইহার কাহিনী শুনিতেছে তাহাদের কেহ অট্টহাস্যে করতালির ধ্বনিতে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে,কেহ ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া একটী অসহায় পতিত জাতির দেহে কলঙ্কের দুর্গন্ধ পঙ্ক ঢালিয়া দিতেছে,কেহ দুঃসহ মর্ম্ম বেদনায় অধীর হইয়া উদ্দেশে তর্জ্জনী সঞ্চালন করিতেছে, এবং কেহ বা নির্জ্জনে গম্ভীর ভাবে অতীত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দুঃখে, ক্ষোভে ও অভিমানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে। এই বিচিত্র আস্ফালনের কারণ কি ?

আমরা বলি এই আস্ফালন কিছু মাত্র বিচিত্র নহে। ইহা হৃদয়ের অপরি-বর্ত্তনীয় ধর্ম্ম অথবা প্রকৃতি-তরঙ্গিণীর অব-শ্যম্ভাবী তরঙ্গ-লীলা। যখন যাহা পরি-দৃশ্যমান সংসারের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিস্তার করে, মানব প্রকৃতি তখনই তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হয়, মানব কল্পনা তখনই উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে আরো-হণ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার অন্তর্গত ধর্ম্ম নানাবর্ণে রঞ্জিত করিতে থাকে। এই ধর্ম্ম অথবা এই কল্পনার বলে, সে হয়ত সমাজে পূজনীয় হইয়া অনেকের হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইবার অধি-কারী হয়, অথবা হয়ত কলঙ্ক ও নিন্দার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া ধিক্কারের অদ্বি-তীয় পাত্র হইয়া থাকে। বনান্ত-বিহা-রিণী বিহঙ্গী যখন মানবের অগম্য কাননে থাকিয়া অনন্ত লীলাকাশে মৃদুমধুর সঙ্গীত-

সুধা বর্ষণ করে, এবং আপনার সৌন্দর্য্য-মহিমায় আপনিই মুগ্ধ হইয়া শ্যামল তরুর শাখায় শাখায় নাচিয়া বেড়ায়, তখন কে তাহার বিষয় আলোচনা করে? কোন্ প্রাণিবৃত্তান্তের প্রতিপত্র তাহার স্তুতিগীতিতে পরিপূরিত হয়? কোন্ কঠোর সমালোচকের কঠোর সমালোচনার তীব্রবাণে তাহার অযত্ন-রক্ষিত সুন্দর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকে? কিন্তু এই বিহঙ্গী যখন লোক-লোচনের সম্মুখবর্ত্তিনী হয়, তখন ইহার সম্বন্ধে বত তুমুল আন্দোলন হইতে থকে, বৈজ্ঞানিকের লেখনী ইহার যশ, গুণ প্রভৃতির সম্বন্ধে কত বিষয় অজস্র সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে। তখন কেহ এই বিহঙ্গীকে প্রাণ বিযুক্ত করিয়া উৎকট স্বার্থপরতা চরিতার্থ করে। কেহবা বিরাগে বিতৃষ্ণায় ইহার কোমল-দেহ-বিচ্ছিন্ন কোমল পালক-রাশি দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনার অহঙ্কারের পরিচয় দিতে থাকে।

ঝিন্দন যদি এই বনবিহারিণী বিহঙ্গীর ন্যায় আপনার মহিমায় আপনিই বিমুগ্ধ থাকিতেন; অথবা বিমুগ্ধ হইয়াই আপনার মহিমা বিকাশ আপনিই করিয়া সুখী হইতেন তাহা হইলে তিনি কখন কাহারও বিষাক্ত বাণ বা প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলির লক্ষ্য হইতেন না। অনন্ত-প্রসারিত গগনতলে ক্ষুদ্র নক্ষত্র-বিন্দুর ন্যায় অথবা অনন্ত বিস্তৃত জলধি-হৃদয়ে নগণ্য জল-বিম্বের ন্যায় তিনি নীরবে উত্থিত হইয়া নীরবেই বিলয় পাইতেন। কিন্তু ঝিন্দন এরূপ নীরবে সমুত্থিত হযেন নাই। অনেকে বিস্ময়-স্তিমিত নেত্রে তাঁহার সমুত্থান চাহিয়া দেখিয়াছে; অনেক মন্ত্রণাপর রাজনীতিজ্ঞের হৃদয়ে তাঁহার সমুত্থান আশঙ্কা উৎপাদন করিয়াছে। ওয়াটার্লুর ভীষণ ক্ষেত্রে যাহারা টলে নাই, পলাশির শোণিত স্রোত দর্শনে যাহারা বিচলিত হয় নাই, রাজনীতির রহস্যধারণে যাহারা অসামর্থ্য প্রকাশ করে নাই, যাহারা বারিধি বেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে বাস করিয়া সমগ্র পৃথিবীর নিকট বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতার পূজা পাইয়া আসিয়াছে, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া যাহাদের প্রভুশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে; ঝিন্দন তাহাদিগকেও নিস্তেজ বণিক্-প্রকৃতিক বলিয়া উপহাস করিতেন; তাহাদের বিভীষিকাও ঝিন্দনের তেজস্বি হৃদয়ের কঠিন আবরণ ভেদ করিতে অসমর্থ হইত। এরূপ তেজস্বিনী ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ললনার চরিত্র লইয়া যে বৈদেশিক সমালোচক গণ আস্ফালন করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা এই, ঝিন্দন যাহাদের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছেন, যাহাদিগকে বিকলাঙ্গ করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহারাই ঝিন্দনের চরিত্র-পটের চিত্রকর হইয়া সাধারণের সমক্ষে উপনীত হইয়াছে। সুতরাং এ-

তৎ প্রসঙ্গে তাহাদের আস্ফালন আপনা হইতেই নিয়মিত সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। মানব মন সহজেই দুর্ব্বল, সহজেই চঞ্চল, ও সহজেই তারল্য-বিকাশক। ইহা ধীরতা ও বিবেকের অবলম্বনে না চলিলে এই অপরূপ সংসার-প্রলয় পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে একবারে নিমগ্ন হইয়া যায়। পদ্মপত্রের উপর বারিবিন্দু যতক্ষণ স্থির ভাবে থাকিতে পারে,—ততক্ষণ মন যদি ধীরতা ও বিবেক বিহীন হয়, তাহা হইলে কর্ত্তব্য বুদ্ধি একবারে স্তম্ভিত হইয়া আইসে। এই কর্ত্তব্য বুদ্ধির স্তম্ভীভাবে যদি অকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে ঝিন্দনের চরিত্র অঙ্কনে নিঃসন্দেহ সেই অকার্য্যানুপাতের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

চিত্রকর চিত্রের যথাযথ স্থলে যথাযথ বর্ণ প্রতিফলিত না করিলে চিত্রখানি যেরূপ কদাকার ও অশ্রদ্ধেয় হয়, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে ঝিন্দনের চিত্রও ঠিক সেইরূপ কদাকার ও অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু কলঙ্ক, যত কিছু পঙ্কিল পদার্থ ও যত কিছু অস্পৃশ্য ঘৃণার্হ সামগ্রী আছে, চিত্রকর অম্লানবদনে, অসঙ্কুচিত হৃদয়ে, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া ঝিন্দনের চিত্র আঁকিয়াছেন। কলঙ্কই এই চিত্রের উপাদান এবং একটি নারীকে কলঙ্কিনী করিয়া তৎসংসৃষ্ট একটি প্রবল জাতির উপর সাধারণের বিরাগ উৎপাদনই এই চিত্রের উদ্দেশ্য। চিত্রকর এই উপাদান সঙ্কলনে ও এই উদ্দেশ্য সাধনে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও উদারতার বিশেষ প্রশংসা এই, তিনি এই সমস্ত কলঙ্কের ভার বহনে কিছুমাত্র কাতর হয়েন নাই, ইহার উৎকট দুর্গন্ধে নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া কিছুমাত্র মুখ বিকৃত করেন নাই। সংসার-বিরাগী পরমাত্মনিষ্ঠ পরমহংসের ন্যায় তিনি সকল প্রকার দুর্গন্ধময় দ্রব্যই আদরে অবিকার চিত্তে হস্তে করিয়া আপনার কার্য্য সাধন করিতেছেন। ইহাতে ঘৃণা, লজ্জা অথবা বিরাগ আসিয়া তাঁহার কার্য্যে বাধা জন্মায় নাই। এইরূপ ধীরে ধীরে কলঙ্কের রেখাপাত করাতে চিত্রের সকল স্থানই কলঙ্কময় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কোনও স্থলে কমনীয়তার বিকাশ নাই, কোনও স্থলে সরলতার স্ফূর্ত্তি নাই, এবং কোনও স্থলে পবিত্র সৌন্দর্য্যের মদালসবিভ্রম নাই। অবায়ু-সন্তাড়িত অপার জলধিতে যেমন একই নীলিমা ভাসিয়া বেড়ায়, নিষ্কম্প জলধর পটলে আচ্ছাদিত গগণে যেমন একই কালিমা লীলা করে, এই চিত্রের প্রতি রেখাতে সেইরূপ একই কলঙ্ক বিকাশ পাইতেছে। শবাসনা লোলরসনা রুধিরাক্তদেহা দিগম্বরী ভৈরবীর মূর্ত্তিতে অথবা রোমের বীর চূড়ামণির প্রেম ভিখারিণী মৈশরী রাজবালাতেও মাধুর্য্য ও পবিত্রতার আভাস সম্ভবে, কিন্তু এই চিত্রে অণুমাত্র মাধুর্য্য ও পবিত্রতার

রেখাপাত সম্ভবে না। কালের করাল রাজ্যে তীব্র হলাহলময় যত নরক আছে, তৎসমুদয়ের প্রতিবিম্বই এই চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। ঝিন্দনের ও ঝিন্দনসংসৃষ্ট জাতির সহিত যাহাদের সহানুভূতি নাই; ইহাদের অভ্যুদয়ে যাহাদের লাভের স্পৃহা নাই, তাহারা যে এই কলঙ্কময় চিত্রের কলঙ্কিনী আভা দেখিয়া ঘোরতর করতালি-ধ্বনির সহিত অট্টহাস্যে উপহাস করিবে, তাহাও কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু বৈদেশিক চিত্রকরের সকলেই যে ভারতীয় ইতিহাসপটে এইরূপ কালিমা বিস্তার করিয়াছেন, আমরা প্রাণান্তেও তাহা বলিব না। অনেক বৈদেশিক, ধীরতা ও বিবেকের মন্ত্রণায়, ঝিন্দনের সহিত বিলক্ষণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। এবং ন্যায়ের দিকে চাহিয়া ঝিন্দনের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রতিভাবলে পূর্ব্বোক্ত কালিমা অপসারিত হইয়া ঝিন্দনের চরিত্রে যথাযথ বর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা যদি একথা স্বীকার না করি তাহাহইলে আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন ও অমানুষপ্রকৃতি। দরিদ্র অসহায় ভারতবর্ষ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত এই অপক্ষপাত পুরুষসিংহদিগকে অভিবাদন করিতেছে।

কি কি পাপ কার্য্য দেখাইয়া বৈদেশিকগণ ঝিন্দনকে কলঙ্কিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার কোনও উল্লেখ করিব না। ঝিন্দন ধীরে ধীরে যখন রাজাধিরাজ রণজিৎ সিংহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, ধীরে ধীরে যখন রণজিতের সহধর্ম্মিণীরূপে পরিগৃহীত হইয়া আপনার ভবিষ্য ক্ষমতার অঙ্কপাত করেন, এবং ধীরে ধীরে যখন কোহিনুরের কান্তিতে বিভাসিত হইয়া লাহোরের দরবারে রাজনীতির পর্য্যালোচনা করেন, বৈদেশিকের নেত্রে তখন তাঁহার যেরূপ পাপীয়সী মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, সে মূর্ত্তি ধ্যান করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইহার পর ঝিন্দন যখন স্বীয় নিয়তিনেমির বহুবিধ আবর্ত্তনের পর কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়া বারিধি বেষ্টিত অপরিচিত ও অজ্ঞাতস্থানে আসিয়া উপস্থিত হযেন, এবং এই স্থানে যখন অদৃষ্ট লিপি তাঁহার জীবনস্রোতঃ কালের অনন্ত স্রোতে মিশাইয়া দেয়, তখনও ঝিন্দনকে দয়ার চক্ষে নিরীক্ষণ করা হয় নাই। অধিক কি, অদ্য যে পুরুষসিংহ ইংলণ্ডে থাকিয়া সকলের নিকট আদর ও প্রীতি পাইতেছেন, ভারতের ললাটমণি রাজরাজেশ্বরী বিক্টোরিয়া যাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সম্মানিত করিতেছেন, কলঙ্কিনী ঝিন্দনের সন্তান বলিয়া তিনিও কলঙ্কী হইয়া ইতিহাসের পত্রে পত্রে লীলামর্কটের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। এই সমস্ত কলঙ্কের কাহিনী শুনিলেও কর্ণে হস্তার্পণ করিতে হয়। বৈদেশিকগণ এই পাপ, এই কলঙ্ক, এত স্তূপে স্তূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন যে, ভারত মহাসাগর শতবর্ষ পরিশ্রম ক-

রিয়াও ইহা প্রক্ষালিত করিতে পারিবে না, হিমালয় স্বীয় গগণস্পর্শী শৃঙ্গাবলী পাতিত করিয়াও ইহা ধূলি রাশিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে না।

আমরা ঝিন্দনকে চিরকাল দয়ার চক্ষেই দেখিব; কঠোর আঘাতে কঠোর প্রহারে যে অবলার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে তাহাকে আবার পদাঘাত করা যে মহাপাপ, চিরকাল ইহা আমরা মনে রাখিব। অবলা চিরদিনই প্রীতির পুত্তলী। অবলা চিরদিনই দয়ার পাত্র। ইহার পর যখন দেখিতেছি, বহুলোকে বহুদিক্ হইতে একটি অবলাকে ধরিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব তাড়না করিতেছে, অবাচ্য ভৎসনার সুতীক্ষ্ণ বাণে তাহার হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করিতেছে, এবং মৃত হইলেও নিরস্ত না হইয়া অকথ্য কলঙ্কের মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার পরলোকগত আত্মার তর্পণ করিতেছে; তখন কে কোন্ প্রাণে সেই অবলার মৃতদেহে আঘাত দিতে সমুদ্যত হয়? কে কোন্ প্রাণে তাঁহার শত্রুদের উদ্ঘোষিত নিন্দাবাদের পুনরুদ্ঘোষণা করে? এই জন্যই আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বলিতেছি, বৈদেশিক সমালোচকগণ ঝিন্দনের চরিত্রে যে যে কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া লেখনীকে কলঙ্কিত করিব না। এস্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ঝিন্দনের প্রতি যে যে দোষ আরোপিত হইয়াছে, যদি তৎসমুদয় সত্য হয়, তাহা হইলে প্রকাশ করায় দোষ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে, লোকে ঝিন্দনকে যে যে কলঙ্কে কলঙ্কিনী বলিতেছে, সে সকল প্রকৃত ঘটনার উপর স্থাপিত কি না তাহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। এই মীমাংসা একবারে অসাধ্য নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল বিষয় উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা দৃঢ়তর হয় নাই। সুতরাং তাহার উপর সহজে বিশ্বাস স্থাপিত হইতে পারে না। এদিকে ঝিন্দনের যে অনন্যসাধারণ প্রভাব ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ঘটনাবলীর এইরূপ অসম্পূর্ণতায় একরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিপক্ষ সম্প্রদায় কেবল বিষম অন্তর্দ্দাহে অধীর হইয়া ঝিন্দনকে সাধারণের নিকট অপদস্থ করিয়াছেন। সুতরাং আরোপিত দোষ প্রকাশ করিয়া ফল কি? হইতে পারে ঝিন্দন অবলাসুলভ কমনীয়তার বশীভূত হইয়া একজনের প্রতি অধিক অনুগ্রহ দেখাইতেন, অথবা একজনকে অধিক ভাল বাসিতেন; ন্যায়ের অনুরোধে আমরা ইহা অবশ্যই স্বীকার করি যে, পঞ্চনদের অধিশ্বরীর এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দোষের মধ্যে গণনীয়। ইহার জন্য ঝিন্দনকে অপরাধিনী বলিতে আমরা সঙ্কুচিত নহি। কিন্তু "অপরাধিনী" বলিবার পূর্ব্বে একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিব। অনুগ্রহ প্রদর্শন ও ভালবাসা অবলাহৃদয়ের অনিবার্য্য ধর্ম্ম। ঝিন্দন অবলাহৃদয়ের

অধিকারিণী হওয়াতেই এই অবলাধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। বিচারক জগৎ ইহাতেও তাঁহাকে মার্জ্জনা করিল না। যাঁহারা জগতের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিকাশ করেন, তাহাদের হৃদয়ের প্রতি স্তর এইরূপ কঠোরভাবেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

ঝিন্দনের অন্য শত অপবাদ থাকুক, কিন্তু তিনি পঞ্জাবে আপনার প্রভুত্ব যেরূপ বিস্তার করিয়া সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম ইতিহাসের স্তুতিগীতিতে অনন্তকাল বিঘোষিত হইবে। ঝিন্দন যখন পঞ্জাবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, যখন আপনার অপূর্ব্ব প্রভাব ও অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, তখন সমস্ত পঞ্চনদ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার লোকাতীত তেজোমহিমার নিকট মস্তক অবনত করিল। দরবারের অমাত্যগণ তখন তাঁহাকে তেজস্বী রণজিৎ সিংহের উপযুক্ত তেজস্বিনী মহিষী বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে লাগিল, এবং রাজ্যের প্রজাগণ তখন তাঁহাকে রক্ষাকর্ত্রী মাতা বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণে আমরা ঝিন্দনের এই তেজস্বিতা এবং প্রজাসাধারণের এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিষয় কিছু কিছু বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

দলীপ সিংহ যখন পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন হইতেই ঝিন্দনের ক্ষমতার বিকাশ হইতে থাকে। ঝিন্দন এত দিন খনির অন্ধকারময় গর্ভে থাকিয়া আপনার প্রভায় আপনিই দীপ্তি পাইতেছিলেন, এক্ষণে খনির গর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সেই দীপ্তি বিস্তার করিতে লাগিলেন। রণজিৎ সিংহের পরলোক প্রাপ্তির পর পঞ্জাব রাজ্য যেরূপ অন্তর্বিদ্রোহের ভয়াবহ তরঙ্গে আন্দোলিত হয়, তাহা ইতিহাস পাঠকগণ সবিশেষ অবগত আছেন। দলীপ সিংহ এই সময়ে নাবালক, সুতরাং রাজ্যসংক্রান্ত কোন কার্য্যেই তাঁহার হাত ছিল না। ঝিন্দন এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে লাহোরের সিংহাসনে সমাসীন হইয়া রাজ্যের সুব্যবস্থা করিতে যত্ন করেন। তিনি প্রতিদিনই নিয়মিত সময়ে দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন, এবং প্রতি দিনই স্বীয় শিশু পুত্রের রাজ্য নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব করিবার জন্য রাজনীতির গূঢ়তম মর্ম্ম উদ্ভেদ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেন। যে দুই প্রতীপপ্রবাহ পরস্পরের আঘাতে প্রতিঘাতে হিংসাপরায়ণ হইয়া বেলাভূমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল; ঝিন্দনের প্রভাবে তাহারা একস্রোতে মিশিয়া শান্তভাবে প্রবাহিত হয়। যাহারা দীর্ঘকাল কেশাকেশি, মুষ্টামুষ্টি, শোণিতস্রাবে অধীর হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে পরস্পরে পরস্পরকে রোষকষায়িত নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দর্পের স্পর্দ্ধা করিতেছিল, ঝিন্দনের প্রভাবে তাহারা একছাড়, এক

প্রাণ হইয়া পরস্পরকে প্রীতিভাবে আলিঙ্গন করে। যাঁহার হৃদয় এইরূপ তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ, যাঁহার মন এইরূপ উচ্চতর গ্রামে আরূঢ়, সে কখন অসার বা অপদার্থ হইতে পারে না।

যখন ঝিন্দন পঞ্জাবের শীর্ষস্থানে বর্ত্তমান, রাজা লাল সিংহ তখন উজীরের পদে আরূঢ়। লাল সিংহের কোনও অমাত্যোচিত গুণ ছিল না। পঞ্জাবের সকলেই তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিত। লাল সিংহ পঞ্জাবে থাকিয়া উচ্চতম সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সৌভাগ্যে তাঁহার কোনও গুণ বিকাশ পায় নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্য কেবল দেহ-যষ্টিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, উহা আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে উপগত হইয়া চিত্তের উদারতা সাধন করে নাই; সুশাসনক্ষমতা কেবল অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠেই সীমাবদ্ধ ছিল, উহা বহিঃপ্রদেশে প্রসারিত হইয়া রাজ্যের উন্নতি সাধন করে নাই; রণনিপুণতা কেবল তোষামোদ-প্রিয় কুপোষ্য সম্প্রদায়ের সমক্ষেই প্রকাশিত হইত, উহা রণস্থলে প্রদর্শিত হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ দেয় নাই। ফলে লালসিংহ শিখসমাজে ধূমকেতু স্বরূপ ছিলেন। ঝিন্দন এই ধূমকেতুর প্রতি কিছুমাত্র বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই! প্রত্যুত, নানা প্রকারে উহার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। ঝিন্দনের চরিত্রের এই অংশ নিতান্ত ক্ষীণ ও নিতান্ত দুর্ব্বল। এই ক্ষীণতা ও এই দুর্ব্বলতা ঝিন্দনের অবলাপ্রকৃতির দোষ। ঝিন্দন লাল সিংহের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইতেন এবং তাঁহাকে সাধারণ লোক অপেক্ষা একটুকু অধিক ভাল বাসিতেন; সুতরাং অনুগ্রহ ও ভালবাসার পাত্রের দোষ ঝিন্দনের চক্ষে দোষ বলিয়াই পরিগণিত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি, ঝিন্দনের এই দোষ অবলাহৃদয়ের দোষ বলিয়াই আমরা চিরকাল দয়ার চক্ষেই দেখিব।

রণজিতের মৃত্যুর পর খালসা সৈন্যের বিশৃঙ্খলা ও যথেচ্ছাচারিতা দেখিয়া ইংরেজগণ আপনাদিগের সীমান্তপ্রদেশ (Frontier) রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত করিলেন। এজন্য বহুসংখ্যক সৈন্য ব্রিটীষ রাজ্যের সীমায় উপস্থিত হইল। ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের এই উদ্যোগ দর্শনে খালসাদিগের হৃদয় নানাপ্রকার আশঙ্কিত তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। ঝিন্দনও এই তরঙ্গের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না। ঝিন্দন যখন পঞ্জাবে আধিপত্য করিতেছিলেন, তখন সীমান্ত ভাগে ইংরেজদিগের সৈন্য-শৃঙ্খলা দেখিয়া ভাবিলেন, ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট আপনাদের সীমায় যেরূপ আট ঘাট বাঁধিতেছেন, তাহাতে হঠাৎ পঞ্জাবরাজ্য আক্রান্ত হইতে পারে। পূর্ব্ব-স্মৃতি আসিয়া তাঁহার এই ভাবনার সহায় হইল। ঝিন্দন আবার ভাবিলেন, ইংরেজগণ এইরূপ কৌশলেই ভারতে আপনাদের রাজ্য প্রসারিত ক-

রিয়াছে; এইরূপ কৌশলেই স্বাধীন রাজ্য সমূহে পরাধীনতার দুর্ব্বহ লৌহ নিগড় পরাইয়া দিয়াছে। এই কৌশলের বলেই দক্ষিণে মহারাষ্ট্র দীর্ঘকাল হস্ত সঞ্চালন, পাদসন্তাড়ন ও শোণিত মোক্ষণের পর, কালের বিকট শ্মশানে শয়ন করিয়াছে, এবং এই কৌশলের বলেই মধ্যে মুসলমান যোগরত তপস্বীর ন্যায় ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া আপনার পূর্ব্ব গৌরবের ধ্যান করিতেছে। এইরূপ ভাবনায় অধীর হওয়াতেই ঝিন্দন প্রথম শিখ যুদ্ধানলের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। যে আশঙ্কায় খালসাগণ মদমত্ত বারণের ন্যায় শতদ্রু পার হইয়া ব্রিটীষ রাজ্য আক্রমণ করিল, সেই আশঙ্কায়ই ঝিন্দন তাহাদিগকে নিরস্ত না করিয়া উৎসাহিত করিলেন। ইহাতে ঝিন্দনের যে বিশেষ সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিব না। ঝিন্দন এবিষয়ে যদি তাঁহার পতির অবলম্বিত নীতি অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার সম্মান রক্ষা পাইত।

লালসিংহও তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথম শিখ যুদ্ধে খালসাদিগের পরাজয় হইল। ঝিন্দন এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একপ্রকার ব্রিটীষ-সিংহের করায়ত্ত হইলেন। সুতরাং প্রথম শিখযুদ্ধের পরই ঝিন্দনের অদৃষ্ট-চক্র এক এক গ্রাম নিম্নে যাইতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বিনী ঝিন্দনের তেজস্বি হৃদয় ব্রিটীষ সিংহের দুর্নিবার তেজের নিকট পরাভূত হইল না। ঝিন্দন অটল পর্ব্বতের ন্যায় অটল হইয়া রহিলেন। তাঁহার রাজ্য পরপদানত হইয়াছে, পরজাতি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া তাঁহার রাজ্যে আসিয়া আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে, ইহা তাঁহার অসহনীয় হইল। বিদেশীর এই আস্পর্দ্ধা, এই অনধিকারপ্রিয়তায় ঝিন্দন মর্ম্মে আঘাত পাইলেন। কামিনীর কোমল হৃদয় অপমান-বিষে কালীময় হইয়া উঠিল।

রেসিডেণ্ট্ (হেন্‌রী লরেন্স্) ঝিন্দনের প্রকৃতি বুঝিতে পারিলেন। এরূপ তেজস্বিনী নারী লাহোরে থাকিলে যে আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিবে না, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। এই বিশ্বাসেই রেসিডেণ্ট্ ঝিন্দনকে লাহোর হইতে সেখপুরে নির্ব্বাসিত করিলেন। সেখপুরও দীর্ঘকাল ঝিন্দনের লাবণ্য তরঙ্গে তরঙ্গায়িত রহিল না। পরবর্ত্তী রেসিডেণ্টের (ফেডরিক কারি) মন্ত্রণায় ঝিন্দন সেখপুর হইতে আবার বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইলেন। এইরূপ উপর্য্যুপরি নির্ব্বাসনে ঝিন্দনের কিছুমাত্র বিকার পরিলক্ষিত হইল না। প্রকৃত বীরজায়া ও বীরনারীর ন্যায়, ঝিন্দন অটল ভাবে অবিকার চিত্তে স্বীয় দশা-বিপর্য্যয়কে আলিঙ্গন করিয়া পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ঝিন্দন এক সময়ে যে লাহোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া

চারিদিকে আপনার গৌরব বিকাশ করিয়াছিলেন, যে লাহোরের অমাত্য-সমিতি এক সময়ে ঝিন্দনের অপ্রতিহত প্রভুশক্তির নিকট অবনতমস্তক ছিলেন; সেই লাহোর পরিত্যাগ সময়ে ঝিন্দনের যেরূপ স্থিরতা দৃষ্ট হইয়াছিল, পঞ্জাব পরিত্যাগ সময়ে ও সেইরূপ স্থিরতার কিছুমাত্র হানি হইল না। যে পঞ্জাব এতকাল তাঁহাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় পূজা করিয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে সেই পঞ্জাব তাঁহার নেত্র বিনোদনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। স্থির হৃদয়ে ঝিন্দন পঞ্জাব পরিত্যাগ করিলেন। বৈদেশিকের নিকট ঝিন্দনের চরিত্রগতি যতই নিম্নগামিনী বলিয়া বোধ হউক না কেন, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া ঝিন্দনের চিত্র যতই কালিমায় পরিণত হউক না কেন, ঝিন্দন এই স্থিরতার জন্য নারী সমাজে গরীয়সী বলিয়া পরিগণিতা হইবেন।

এই নির্ব্বাসন-ঘটনাই ঝিন্দনের সৌভাগ্য-অভিনয়ের যবনিকা পতন। এই যবনিকা-পতনের অব্যবহিত পরে পঞ্জাবে যে ভয়াবহকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়; ঝিন্দনের নির্ব্বাসনই তাহার অন্যতম কারণ। এই ভয়াবহকাণ্ড দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শিখদিগের স্বাধীনতা-ইতিহাসের শেষ অধ্যায়; এবং দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শিখদিগের সৌভাগ্য-নেমির শেষ আবর্ত্ত। সাগরের দুটী উত্তুঙ্গ জলোচ্ছ্বাস যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে প্রলয়ের ধ্বজা স্বরূপ আসিয়া পরস্পরের সংঘর্ষে ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত করে, এবং বহুক্ষণ ঘাত প্রতিঘাতের পর শ্রান্ত বিরত হইয়া অনন্ত বারিরাশির সহিত মিশিয়া যায়, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে ও সেইরূপ দুটী প্রবল জাতি ত্রাস গর্জ্জনে বিভিন্ন দিক্ হইতে আসি বহুক্ষণ হস্তাহস্তির পর এক ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ রণজিৎরাজ্যে করাল প্রলয়-কাদম্বিনী। ইহার হৃৎকম্পকারী জল-প্রবাহে শিখদিগের প্রভুত্ব মহত্ত্ব সমস্তই বিধৌত হইয়া গিয়াছে। রণজিৎ সিংহ ইষ্টকের উপর ইষ্টক গ্রথিত করিয়া যে মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধের প্রবল বাত্যাতেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। অপর দিকে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ শিখ দিগের বীর্য্যবহ্নির অসাধারণ বিস্ফুরণকারী। গুরুগোবিন্দ সিংহ যে ফল লক্ষ্য করিয়া শিখদিগকে সাধারণ তন্ত্র-সমাজে একত্রিত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধেই তাহা পরিপক হয়। যে চিনিয়ানওয়ালার নাম ভারত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, যে চিনিয়ান ওয়ালার জন্য ভারতবর্ষ বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়া প্রাণগত শ্রদ্ধার পুজা পাইয়া আসিতেছে, যে চিনিয়ান ওয়ালায় শিখদিগের দুর্দ্দমনীয় তেজের নিকট ওয়াটার্লুজয়ি ব্রিটীষ তেজও পরাভব মানিয়াছে, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধেই সেই চিনিয়ান ওয়ালা পুণ্য-পুঞ্জময় মহাতীর্থ হইয়া সক-

লের রসনায় রসনায় লীলা করিতে থাকে। বৈদেশিকের লিখিত ইতিহাস যাহাই বলুক না কেন, আমরা অসঙ্কুচিত হৃদয়ে ঝিন্দনের নির্ব্বাসনকেই এই প্রলয়-ঘটনার ৩ম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

অনেকে বলিতে পারেন, ঝিন্দনের নির্ব্বাসনের সময় পঞ্জাবে বিপাকের কোন ও চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। কেহই অশ্রুপাত, হাহাকার, শিরে করাঘাত করিয়া এই নির্ব্বাসন-সম্বাদ চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় নাই। পঞ্জাব নিবাত, নিষ্কম্প সমুদ্রের ন্যায় ধীর ভাবে ঝিন্দনের নির্ব্বাসন চাহিয়া দেখিয়াছে; সুতরাং ঝিন্দনের নির্ব্বাসনকে শিখজাতির সমুত্থান ও তন্নিবন্ধন যুদ্ধ-সঙ্ঘটনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। যাহারা এইরূপ বলিয়া পবিত্র ইতিহাসের সম্মান নষ্ট করিতে চাহেন, তাহারা মানব প্রকৃতির তত্ত্বানভিজ্ঞ। আমরা শত হস্ত দূর হইতে তাহাদিগকে অভিবাদন করি। তাহারা যাহাকে আহ্লাদের চিহ্ন মনে করেন, আমরা তাহাকেই বিষম-মর্ম্ম-পীড়ার বিষম দাহন মনে করি;এবং তাহারা যাহাতে সুখ ও শান্তি দেখিয়া সুখী হয়েন, আমরা তাহাতেই গভীর আতঙ্ক ও গভীর মনোবেদনা দেখিয়া দুঃখিত হই।

যে দুঃখ হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে না; তাহা সামান্য বাহ্য বিকারের সহিতই নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই দুঃখ দুঃখের অভিনয় প্রদর্শন মাত্র। যখন দেখি, কেহ দুঃখে অধীর হইয়া দুই হস্তে মস্তকের কেশউৎপাটন করিতেছে, হাহাকারে রোদন করিয়া চারিদিকে জনতা বৃদ্ধি করিতেছে, তখন সদয় ভাবে তাহাকে দুঃখের অভিনয়কারী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিব; কিন্তু যখন দেখিব, কেহ কোন ঘোরতর আকস্মিক বিপৎপাতে ম্রিয়মান হইয়া অবীচিবিক্ষোভিত সাগরের ন্যায় ধীর ভাবে বসিয়া আছে, মস্তকের এক গাছি কেশও নড়িতেছে না, এক বিন্দু অশ্রুও নেত্র হইতে বিচ্যুত হইতেছে না; হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন ধস্, ধস্, করিতেছে, কোন বাহ্য ভঙ্গীর সহিত তাহার তাপ বাহিরে আসিয়া পড়িতেছে না; পরমাত্মসংযত, ধ্যানস্তিমিতনেত্র যোগীর ন্যায় নিঃশব্দ ও নিষ্পন্দ ভাবে সে আপনার জ্বালায় আপনিই পুড়িয়া মরিতেছে; তখন তাহাকে কাতর ভাবে দুঃখের জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়াই উল্লেখ করিব। "অল্প দুঃখ নেত্র বারির সহিতই বিগলিত হয়; অল্প ক্রোধ ভ্রূকুঞ্চন ও দন্ত ঘর্ষণের সহিতই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়; অল্প আশঙ্কা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিতই বিলয় পায়।" কিন্তু যে দুঃখ হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রসারিত হয়, যে ক্রোধ শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে, যে আশঙ্কা মর্ম্মে মর্ম্মে বদ্ধমূল হইয়া অন্তঃকরণকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করিতে থাকে, তাহা কখন ও অশ্রুজল, ভ্রূকুঞ্চনা ও দীর্ঘ

নিঃশ্বাসের সহিত বিলীন হয় না। ঝিন্দনের নির্ব্বাসন সময়ে পঞ্জাবের যে নিশ্চল ভাব লক্ষিত হইয়াছিল,তাহা এইরূপ দুঃখ, ক্রোধ ও আশঙ্কা-মূলক। পঞ্জাবের এই নিস্তব্ধতা শান্তির নিস্তব্ধতা নহে; ইহা গভীর দুঃখ, গভীর ক্রোধ ও গভীর আশঙ্কার নিস্তব্ধতা। এই দুঃখ, ক্রোধ ও আশঙ্কায় দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। গুরু গোবিন্দ সিংহের মহিমা-বলে পঞ্জাবের অন্তর্নিগূঢ় তুষানল এই যুদ্ধের সময়েই প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইয়া বিষম স্ফুলিঙ্গক্রীড়া প্রদর্শন করে। য বীর শ্রেষ্ঠ চিনিবান ওয়ালায বি বৈজয়ন্তীতে পরিশোভিত হইয়াছিলে ন্ধর সময় যাঁহার হস্তে সেনানায়কতা ছিল, সেই পুরুষ-পুঙ্গব সের সিংহও ঝিন্দনের নির্ব্বাসনে মর্ম্মাহত হইয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, "ইহা সকলেই ভালরূপে জানিতে পারিয়াছেন, সমস্ত পঞ্জাববাসী, সমস্ত শিখ, সংক্ষেপতঃ সমস্ত পৃথিবীর বিদিত হইয়াছে, ফিরিঙ্গিগণ কিরূপ দৌরাত্ম্য, অত্যাচার ও বিশ্বাস-ঘাতকতাসহকারে পরলোক-সুখ-ভোগী রণজিৎ সিংহের বিধবা মহিষীর সহিত ব্যবহার করিয়াছে, এবং কিরূপ দৌরাত্ম্যে এই রাজ্যের লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রথমতঃ তাহারা সমস্ত প্রজার মাতা স্বরূপ মহারাণীকে কারারুদ্ধ ও হিন্দুস্থানে নির্ব্বাসিত করিয়া সন্ধিভঙ্গ করিতে ত্রুটী করে নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের দৌরাত্ম্যে শিখগণ এতদূর নিপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং তৃতীয়তঃ, আমাদের রাজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা গৌরব শূন্য হইয়া পড়িয়াছে *।" ইহাতেও কি বলিব ঝিন্দনের নির্ব্বাসনে পঞ্জাব দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয় নাই? ইহাতেও কি বলিব, পঞ্জাব নিরুদ্বেগে ঝিন্দনের নির্ব্বাসন চাহিয়া দেখিয়াছে?

কিন্তু ঝিন্দনের নির্ব্বাসনে কেন পঞ্জাব এইরূপ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইল? কেন পঞ্জাবের প্রতি রোমকূপে ক্রোধের অনলকণা প্রবিষ্ট হইল? কেন পঞ্জাবের শিরায় শিরায় তীব্র বিষ প্রসারিত হইল? ইহার একই উত্তর, ঝিন্দনের প্রতি পঞ্জাবের আন্তরিক ভক্তি, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভালবাসা। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্রের শোচনীয় দশা কখনই শান্তভাবে নিরীক্ষণ করা যায় না। পঞ্জাব যাঁহাকে পরম দেবতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, মাতার ন্যায় সরল হৃদয়ে ভাল বাসিত, তাঁহার নির্ব্বাসনে যে পঞ্জাবের হৃদয় উগ্র হলাহলে কালীময় হইয়া উঠিবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। এক্ষণে এরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভাল বাসার পাত্রকে আমরা কোন্ প্রাণে পাপীয়সী ও কলঙ্কিনী বলিয়া ঘৃণা করিব? কোন প্রাণে

* সের সিংহের এই উক্তির জন্য প্রবন্ধলেখক দায়ী নহেন।

এরূপ উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে কলঙ্কের পঙ্ক লেপিয়া হৃদয় অপবিত্র করিব? যাঁহারা এরূপ পবিত্র ভাবে দেখিয়াও ঝিন্দনকে পাপীয়সী ও কলঙ্কিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা মানব জাতির শত্রু। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া পবিত্র ভক্তির অবমাননা করেন, পবিত্র শ্রদ্ধার মুণ্ডচ্ছেদ করেন, এবং পবিত্র ভালবাসার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের কোনও সহানুভূতি নাই।

এই ঔজ্জ্বল্যেই ঝিন্দন বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে সমস্ত ভারতবর্ষ বিভাসিত করিয়াছিলেন; এই ঔজ্জ্বল্যেই ঝিন্দনের সমস্ত ক্ষীণতা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, এবং এই ঔজ্জ্বল্যেই আমরা ঝিন্দনের এতদূর পক্ষপাতী হইয়াছি। ঝিন্দন তেজস্বিনী নারীর অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তভূমি। তিনি লাবণ্যলীলাময়ী ললনা হইয়াও, দৃঢ়তা ও অটলতার আস্পদ ছিলেন, কোমলতাময় অঙ্গনা হৃদয়ের অধীকারিণী হইয়াও, ধীরতার অবলম্বন ছিলেন, এবং কমনীয় কান্তির আধার হইয়াও ভীম-গুণান্বিত তেজস্বিতার পরিপোষক ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোনও নারী এরূপ হঠাৎ সমুত্থিত হইয়া একটী প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সহিত এরূপ তেজস্বিতা ও শাসন ক্ষমতার স্পর্দ্ধা করে নাই। আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, ঝিন্দনের তরলা প্রকৃতিতে অনেক খুঁত থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে যে সকল অলোক-সামান্য গুণ আছে, তাহার জন্য ঝিন্দনকে আদর না করা কাপুরুষতার কর্ম্ম। কবে কখন ক্লিওপেট্রা আপনার সম্মোহন রূপ-সাগরে সকলকে ডুবাইয়া প্রেমের খেলা খেলিয়াছেন, কবে কখন কুইন মেরী হৃদয়ের গরল ঢালিয়া আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন; ঝিন্দনের একটী খুত দেখিয়াই তাঁহার চরিত্রে সেই ক্লিওপেট্রা বা কুইন মেরীর কলঙ্ক লেপন করা প্রকৃত সামাজিকতার লক্ষণ নহে। দোষকে সকল স্থলেই দোষ বলিয়া ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করা উচিত, এবং গুণকে সকল স্থলেই গুণ বলিয়া আদরের সহিত গ্রহ [illegible] উচিত। কোনও বিশ্বশত্রু পা[illegible] কোনও অলোকসাধারণ গুণ [illegible] তাহার পাষণ্ডত্ব ক্ষণ কাল বিস্মৃত হইয়া তাহার লোকাতীত গুণের পূজা করা কর্ত্তব্য। যখন দেখিতেছি, এক জন নির্দ্দয় দস্যু একদিকে মূর্ত্তিমান পাপের ন্যায় সকলের হৃদয়-বৃন্ত ছিন্ন করিয়া সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠন করিতেছে; অপর দিকে অপরিসীম, ও অনবদ্য ভক্তির সহিত মাতার পদসেবা করিতেছে; এবং অপরিসীম ও অনবদ্য প্রেমের সহিত বনিতার মনোরঞ্জন করিতেছে; তখন তাহার মাতৃভক্তি ও দাম্পত্য-প্রেমের নিকট সহজেই মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। যখন দেখিতেছি, একজন নিষ্ঠুর দুরাশয় এক সময়ে একজন নির্দ্দোষ নিরীহের উপর অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আপনার দুরাশয়তা চরিতার্থ করিয়াছে, পরক্ষণেই আ-

বার পবিত্র ভাবে সংযত চিত্তে স্নান করিয়া আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই যেন্ ভক্তিরসার্দ্র হৃদয়ে স্বীয় অশ্রুজল ভাগীরথীর জল প্রবাহের সহিত মিশাইয়া উর্দ্ধনেত্রে নিস্পন্দ ভাবে পরম দেবতার আরাধনা করিতেছে ; তখন আপনা হইতেই তাহার দেবভক্তির পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। এরূপ নীচাশয় নিষ্ঠুরগণও যখন সময় বিশেষে হৃদয়ের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, তখন ঝিন্দন এক জনের প্রতি একটুকু অধিক মাত্রায় অনুগ্রহ দেখাইতেন অথবা একজনকে একটুকু অধিক মাত্রায় ভাল বাসিতেন বলিয়াই যে তিনি শ্রদ্ধা ও প্রীতির অপাত্র হইবেন,হৃদয় থাকিতে আমরা ইহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

আমরা ঝিন্দনকে আজীবন শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিতই দেখিব ; আজীবন ঝিন্দনের চরিত্র শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিতই স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিব। আমরা কখনও অপরের আরোপিত কলঙ্কের কথায় সায় দিয়া হৃদয়কে কলঙ্কিত করিব না। বৈদেশিক গণ যেরূপ জঘন্য ভাবে ঝিন্দনের চরিত্র আঁকিয়াছেন, যেরূপ জঘন্য ভাবে অসহায় ভারতের একটী অসহায় ললনার উপর কলঙ্কের কালীমাবর্ষণ করিয়াছেন, আমরা চিরকাল তাহার জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিব ; এবং চিরকাল ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত সেই জঘন্য চিত্রের প্রতি তাচ্ছীল্য দেখাইব।

জীবন প্রভাত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শিবজী।

"অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর ?
অসুর পদাঙ্করজঃ ; শোভিত মস্তকে ?
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমরবীর্য্য সমরের স্রোতে,
ভাসিব অনন্তকাল দৈত্যের সংগ্রামে,
দেবরক্ত যতদিন না হবে নিঃশেষ।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখা যাইতেছে, এমন সময় ব্রাহ্মণবেশধারী শিবজী সিংহগড় প্রবেশ করিলেন। উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, উষ্ণীষ ও তুলার কুৰ্ত্তি ফেলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালের আলোকে মস্তকের লৌহ শিরস্ত্রাণ ও শরীরের বর্ম্ম ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, কোষে 'ভবানী' নামক প্রসিদ্ধ খড়্গ। হস্তদ্বয় দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, শরীর ঈষৎ খর্ব্ব বটে, কিন্তু সুবদ্ধ ; সুদৃঢ়বন্ধনী ও পেশীগুলি বর্ম্মের নীচ হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পেশওয়া মুরে-

শ্বর ত্রিমূল পিঙ্গলী সানন্দে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

'ভবানীর জয় হউক! আপনি এতক্ষণ পরে কুশলে ফিরিয়া আসিলেন।'

শিব। 'আপনার আশীর্ব্বাদে কোন্ বিপদ্ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি?'

মুর। 'সমস্ত স্থির হইয়াছে?'

শিব। 'সমস্ত।'

মুর। 'অদ্যরাত্রি বিবাহ?'

শিব। 'অদ্যই।'

মুর। 'শায়েস্তাখাঁ কিছু জানেন না? তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাঁদখাঁ কিছু জানে না?'

শিব। 'শায়েস্তাখাঁ ভীত শিবজীর নিকট সন্ধি প্রার্থনা প্রতীক্ষা করিতেছেন; যোদ্ধা চাঁদখাঁ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, আর যুদ্ধ করিবেন না।' শিবজী সবিশেষ বিবরণ বলিলেন।

মুর। 'যশোবন্ত?'

শিব। 'আপনি পত্রে যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছিল; আমি যাইয়াই দেখিলাম তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন; সুতরাং অনায়াসেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইল।'

মুর। 'ভবানীর জয় হউক! উঃ আপনি এক রাত্রিতে একাকী যে কার্য্যসাধন করিলেন তাহা সহস্রের অসাধ্য। যে অসমসাহসী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ভাবিলে এক্ষণও হৃৎকম্প হয়। শিবজী! শিবজী! এরূপ কার্য্যে আর প্রবৃত্ত হইবেন না, আপনার অমঙ্গল হইলে মহারাষ্ট্রের কি থাকিবে?

শিবজী গম্ভীর ভাবে বলিলেন 'মুরেশ্বর! বিপদে ভয় করিলে অদ্যাবধি জায়গীরদার মাত্র থাকিতাম, বিপদে ভয় করিলে এ মহৎ উদ্দেশ্য কিরূপে সাধন হইবে? চিরজীবন বিপদে আচ্ছন্ন থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী করুন যেন মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হয়।'

মুর। 'বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার জয় অনিবার্য্য, স্বয়ং ভবানী সহায়তা করিবেন। কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে, শত্রুশিবিরে, একাকী ছদ্মবেশে? অঙ্গীকার করুন এরূপ আচরণ করিবেন না, আপনার কি বিশ্বস্ত অনুচর নাই?'

শিবজী দেখিলেন বিশ্বস্ত পেশওয়ার নয়নে একবিন্দু জল। হাস্য করিয়া বলিলেন,—'অদ্য সত্যই একটী মহা বিপদে পতিত হইয়াছিলাম।'

মুর। 'কি?'

শিব। 'এমন মূর্খকেও আপনি সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন। আপন নাম স্বাক্ষর করিতে পারে না, সে সংস্কৃত স্মরণ রাখিবে?'

মুর। 'কেন, কি হইয়াছিল?'

শিব। 'আর কিছু নহে, শায়েস্তাখাঁর সভায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় সমস্ত শ্লোকগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলেন!'

মুর। 'তাহার পর?'

শিব। 'দুই একটী মনে ছিল, তদ্দা-

রাই কার্য্য সিদ্ধ হইল।' সহাস্য বদনে শিবজী শয়নাগারে গেলেন।

শিবজীর সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়; এই স্থলে তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমরা কিছু বলিতে চাই; ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এইটী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।

শিবজী ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর ছিল। তাঁহার পিতার নাম শাহজী ও পিতামহের নাম মল্লজী-ভন্‌স্লে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে ফুল্‌তন দেশের দেশমুখ প্রসিদ্ধ নিম্বলকর বংশের কথা বলিয়াছি; সেই বংশের যোগপাল রাও নায়েকের ভগ্নী দীপাবাইকে মল্লজী বিবাহ করিয়াছিলেন। অনেক দিন অবধি সন্তানাদি না হওয়ায়, আহম্মদনগরনিবাসী শাহশরীফ নামক একজন মুসলমানপীরের নিকট মল্লজী অনেক অনুরোধ করেন, এবং পীরও মল্লজীর সন্তানার্থে প্রার্থনাদি করেন। তাহারই কিছু পরে দীপাবাইয়ের গর্ভে একটী সন্তান হওয়াতে মল্লজী সেই পীরের নামানুসারে পুত্রের নাম শাহজী রাখিলেন।

আহম্মদনগরের প্রসিদ্ধনামা লক্ষজী যাদব রাওয়ের নাম প্রথম অধ্যায়েই উল্লেখ হইয়াছে। ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে হুলির দিনে মল্লজী আপন সন্তান শাহজীকে লইয়া যাদব রাওয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। শাহজীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র, যাদব রাওয়ের কন্যা জীজীর বয়স তিন কি চারি বৎসর, সুতরাং বালক বালিকা বড় আনন্দে একত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যাদব রাও সন্তুষ্ট হইয়া আপন কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন 'কেমন, তুই এই বালকটীকে বিবাহ করিবি?' পরে অন্যান্য লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'দুই জনে কি সুন্দর জোড় মিলিয়াছে।' এই সময়েই শাহজী ও জীজী পরস্পরের দিকে ফাগ নিক্ষেপ করায় সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু মল্লজী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন 'বন্ধুগণ! সাক্ষী থাকিও, যাদব রাও আমার বৈবাহিক হইবেন, অদ্য প্রতিশ্রুত হইলেন।' সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। যাদবরাও উচ্চ বংশজ, শাহজীর সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে কথনই বাসনা করেন নাই; কিন্তু মল্লজীর এই চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

পর দিন যাদব রাও মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু বৈবাহিক বলিয়া স্বীকার না করিলে মল্লজী যাইবেন না বলিয়া পাঠাইলেন। যাদবরাও সেরূপ স্বীকার করিলেন না, সুতরাং মল্লজী আসিলেন না। যাদব রাওয়ের গৃহিণী যাদবরাও হইতেও বংশমর্য্যাদার অভিমানিনী। কথিত আছে যে যাদবরাও রহস্য করিয়াও আপন দুহিতার সহিত শাহজীর বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গৃহিণী

তাঁহাকে বিলক্ষণ দুই এক কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন! মল্লজী সরোষে একটি গ্রামে চলিয়া গেলেন ও প্রকাশ করিলেন যে ভবানী সাক্ষাৎ অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে বিপুল অর্থ দিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে ভবানী এই সময়ে মল্লজীকে বলিয়াছিলেন, 'মল্লজী, তোমার বংশে একজন রাজা হইবেন, তিনি শম্ভুর ন্যায় গুণান্বিত হইবেন, মহারাষ্ট্রদেশে ন্যায়বিচার পুনঃ স্থাপন করিবেন, এবং ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের শক্রদিগকে দূরীভূত করিবেন। তাঁহার সময় হইতে কাল গণনা হইবে ও তাঁহার সন্তানসন্ততি সপ্তবিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত সিংহাসনারূঢ় থাকিবেন।'

যে যাহা হউক, মল্লজী যে এই সময়ে বিপুল অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। সেই অর্থের দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেন ও এ বিষয়ে তাঁহার শ্যালক যোগপালও তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। অচিরে মল্লজী আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি হইলেন, 'রাজা ভনস্লে' খেতাব প্রাপ্ত হইলেন, সুবর্ণী ও চাকান দুর্গ ও তৎপার্শ্বস্থ দেশের ভার প্রাপ্ত হইলেন, ও জায়গীর স্বরূপ পুনা ও সোপানগর পাইলেন। তখন আর যাদবরাওয়ের কোন আপত্তি রহিল না; ১৬০৪ খ্রীঃ অব্দে মহা সমারোহে শাহজীর সহিত জীজীর বিবাহ হইল, ও আহম্মদনগরের সুলতান স্বয়ং সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তখন শাহজীর বয়ঃক্রম ১০ বৎসর মাত্র। কালক্রমে মল্লজীর মৃত্যুর পর শাহজী পৈতৃক জায়গীর ও পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে দিল্লীশ্বর আকবরশাহ আহম্মদনগর রাজ্য দিল্লীর অধীনে আনিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই যুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশৎবর্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। আকবরের পর জাহাঁঙ্গীর ও তৎপর শাহজিহান আহম্মদনগর জয়ের জন্য প্রয়াস পান; পরে শেষোক্ত সম্রাটের সময় ১৬৩৭ খ্রীঃঅব্দে এই রাজ্য সম্পূর্ণরূপে দিল্লীর অধীনে আইসে ও যুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধকালে শাহজী সুষুপ্ত ছিলেন না। ১৬২০ খ্রীঃ অব্দে (জাহাঁঙ্গীরের শাসনকালে) তিনি আহম্মদনগরের প্রধান সেনাপতি মালীক অম্বরের অধীনে ছিলেন ও একটি মহাযুদ্ধে আপন সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। নয় বৎসর পর তিনি দিল্লীশ্বর শাহজহাঁর পক্ষাবলম্বন করিলে, উক্ত সম্রাট তাঁহাকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি করিলেন ও অনেক জায়গীর দান করেন। কিন্তু সম্রাটদিগের অনুগ্রহ আজ আছে কাল থাকে নাই; তিন বৎসর পর শাহজীর কতকগুলি জায়গীর সম্রাট্ কাড়িয়া লইয়া ফতেহখাঁকে দান করেন, তাহাতে শাহজী বিরক্ত হইয়া, সম্রাটের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে বিজয়পুরের সুলতানের

পক্ষ অবলম্বন করিলেন ও আপন মৃত্যু পর্য্যন্ত অর্থাৎ দ্বাত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে কখনও বিজয়পুরের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

পতনোন্মুখ আহম্মদনগর রাজ্য নিজ অসাধারণ বাহুবলে দিল্লীর স্বাধীন রাখিবার জন্য শাহজী দিল্লীর সেনার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন। সুলতান শত্রুহস্তে পতিত হইলে, শাহজী সেই বংশজ আর একজনকে সুলতান বলিয়া সিংহাসনে আরোপিত করিলেন, কতকগুলি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে দেশ শাসনের সুন্দর রীতি স্থাপন করিলেন, বহু সংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন, ও সুলতানের নামে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সম্রাট শাহজিহান এই সমস্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাহজী ও তাঁহার প্রভু বিজয়পুরের সুলতানকে এককালে দমন করিবার জন্য অষ্টচত্বারিংশৎ অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিক প্রেরণ করিলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করা বিজয়পুরের সুলতান বা শাহজীর সাধ্য নহে, কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর সন্ধিস্থাপন হইল, আহম্মদনগর রাজ্য বিলুপ্ত হইল (১৬৩৭) এবং শাহজী বিজয়পুরের অধীনে জায়গীরদার ও সেনাপতি রহিলেন। সুলতানের আদেশানুসারে কর্ণাট দেশের অনেক অংশ জয় করিলেন, সুতরাং বিজয়পুরের উত্তরে পুনার নিকট তাঁহার যেরূপ জায়গীর ছিল, দক্ষিণে কর্ণাট দেশেও সেইরূপ বহু জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন।

জীজীবাই দ্বারা শাহজীর শম্ভুজী ও শিবজী নামে দুই পুত্র হয়। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, জীজীর পিতা লক্ষজী যাদবরাও পুরাতন দেবগড়ের হিন্দুরাজার বংশ হইতে অবতীর্ণ, এরূপ জনশ্রুতি আছে। এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে শিবজী সেই পুরাতন রাজবংশোদ্ভব সন্দেহ নাই। ১৬৩০ খৃঃ অব্দে, শাহজী টুকাবাই নাম্নী আর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; অভিমানিনী জীজীবাই তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করিলেন ও পুত্র শিবজীকে লইয়া পুনার জায়গীরে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন শাহজী টুকাবাইকে লইয়া কর্ণাটেই থাকিতেন, তথায় তাহার গর্ভে বেনকাজী নামে একটি পুত্র হইল।

শাহজীর দুইজন অতিবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী ছিলেন। দাদাজী কানাইদেব পুনার জায়গীর রক্ষা করিতেন এবং জীজী ও শিশু শিবজীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন; নারায়ণপন্ত নামে অন্য কর্ম্মচারী কর্ণাটের জায়গীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে স্বর্ণদুর্গে শিবজীর জন্ম হয়। এই দুর্গ পুনা হইতে অনুমান ২৫ ক্রোশ উত্তরে ও জুনীর নামে খ্যাত। শিবজীর তিন বৎসর বয়সের সময় শাহজী টুকাবাইকে বিবাহ করিলেন, সুতরাং জীজীর সহিত বিচ্ছেদ জন্মিল। শাহজী কর্ণাটাভিমুখে যাইলেন, জীজী সপুত্রা পুনায় আসিয়া দাদাজী কানাই

দেবের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করিতে লাগিলেন।

শিবজীর বাসার্থে দাদাজী পুনানগরে একটি বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে সেই গৃহে শায়েস্তাখাঁকে দেখিয়াছি।

মাতা পুত্রে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, ও বাল্যকালাবধি শিবজী দাদাজীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শিবজী কখনও নাম লিখিতেও শিখেন নাই, কিন্তু অল্প বয়সেই ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার, বর্ষা নিক্ষেপ, নানারূপ মহারাষ্ট্রীয় খড়্গ ও ছুরিকা চালন ও অশ্বারোহণে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় মাত্রেই অশ্বচালনায় তৎপর, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও শিবজী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলেন। এইরূপ ব্যায়াম ও যুদ্ধশিক্ষায় বালকের দেহ শীঘ্রই সুদৃঢ় ও বলবান হইয়া উঠিল।

কিন্তু কেবল অস্ত্রবিদ্যায়ই শিবজী কাল অতিবাহিত করিতেন না। যখন অবসর পাইতেন দাদাজীর চরণোপান্তে বসিয়া মহাভারত ও রামায়ণের অনন্ত বীরত্বের গল্প শ্রবণ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। শুনিতে শুনিতে বালকের হৃদয়ে সাহসের উদ্রেক হইল, হিন্দুধর্ম্মে আস্থা দৃঢ়ীভূত হইল, সেই পূর্ব্বকালীন বীরদিগের বীরত্ব অনুকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল; ধর্ম্মবিদ্বেষী মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল। অচিরাৎ শাস্ত্রানুযায়িক সমুদয় ক্রিয়া কর্ম্ম শিখিলেন, এবং কথা শুনিতে এরূপ আগ্রহ জন্মিল যে অনেক বৎসর পর যখন দেশে খ্যাতি ও রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত কোন স্থানে কথা হইবে শুনিলে বহু বিপদ ও কষ্ট সহ্য করিয়াও তথায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেন।

এইরূপে দাদাজীর যত্নে, শিবজী অল্পকাল মধ্যেই স্বধর্ম্মানুরক্ত ও অতিশয় মুসলমান-বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন, ও ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে স্বাধীন পলীগার হইবার জন্য নানারূপ সংকল্প করিতে লাগিলেন। আপনার ন্যায় উৎসাহী যুবকদিগকে এবং দস্যুগণকেও চারিদিকে জড় করিতে লাগিলেন, ও পর্ব্বতপরিপূর্ণ কঙ্কণদেশে তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। সেই পর্ব্বত কিরূপে উল্লঙ্ঘন করা যায়, কোথায় পথ আছে, কোন্ পথে কোন্ দুর্গে যাওয়া যায়, কোন্ কোন্ দুর্গ অতিশয় দুর্গম, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ বা রক্ষা করা যায়, এ সকল চিন্তায় বালকের দিন অতিবাহিত হইত। কখন কখন কয়েকদিন ক্রমাগত এই পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে যাপন করিতেন; কোন দুর্গ কোন পথ, কোন উপত্যকা শিবজীর অজ্ঞাত ছিল না। শেষে কিরূপে দুই একটি দুর্গ হস্তগত করিবেন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া বৃদ্ধ দাদাজী ভীত হইতে লাগিলেন। তিনি অনেক প্রবোধবাক্য

দ্বারা বালককে সে পথ হইতে আনয়ন করিয়া জায়গীর যাহাতে সুচারুরূপে রক্ষা হয়, তাহাই শিখাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিবজীর হৃদয়ে যে বীরত্বের অঙ্কুর স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আর উৎপাটিত হইল না। শিবজী দাদাজীকে পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন, কিন্তু যে উন্নত পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিলেন না।

মাউলীজাতীয়দিগের কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য শিবজী তাহাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন, ও তাঁহার যৌবন-সুহৃদগণের মধ্যে যশজীকঙ্ক, তন্নজীমালশ্রী ও বাজীফাসলকব নামক তিন জন মাউলীই প্রিয়তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিশেষে ইঁহাদের সহায়তায় ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে তোরণ দুর্গের কিল্লাদারকে কোনরূপে বশবর্ত্তী করিয়া শিবজী সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন। এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই তোরণ দুর্গের বর্ণনা করা হইয়াছে; এই প্রথম বিজয়ের সময় শিবজীর বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র। ইহারই পরবৎসর তোরণ দুর্গের দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি তুঙ্গগিরিশৃঙ্গের উপর শিবজী একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন ও তাহার রাজগড় নাম দিলেন।

বিজয়পুরের সুলতান এই সমস্ত বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন ও এই সমস্ত উপদ্রবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয়পুরের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শাহজী এসমস্ত বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না, তিনি দাদাজীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদাজী কানাইদেব শিবজীকে পুনরায় ডাকাইলেন। এইরূপ আচরণে সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভব তাহা অনেক বুঝাইলেন, ও বিজয়পুরের অধীনে কার্য্য করিয়া শিবজীর পিতা কিরূপ বিপুল অর্থ, জায়গীর, ক্ষমতা ও সম্মান পাইয়াছেন তাহাও দেখাইলেন। শিবজী পিতৃসদৃশ দাদাজীকে আর কি বলিবেন, মিষ্ট বাক্যদ্বারা উত্তর দান করিলেন, কিন্তু আপন কার্য্যে নিরস্ত হইলেন না। ইহার কিছু দিন পরেই দাদাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালেই দাদাজী শিবজীকে আর একবার ডাকাইয়া নিকটে আনেন। বৃদ্ধ পুনরায় ভৎর্সনা করিবেন এই বিবেচনা করিয়া শিবজী তথায় যাইলেন, কিন্তু যাহা শুনিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। মৃত্যুশয্যায় যেন দাদাজীর দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল, তিনি শিবজীকে সস্নেহ ভাবে বলিলেন "বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর; ব্রাহ্মণ, গো-বৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয়-কলুষিতকারীদিগকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর।" বৃদ্ধ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, শিবজীর

হৃদয় এই দিব্য উপদেশ পাইয়া উৎসাহ ও সাহসে দশগুণ স্ফীত হইয়া উঠিল। তখন শিবজীর বয়ঃক্রম বিংশ বৎসর।

সেই বৎসরেই চাকন ও কন্দানা দুর্গের কিল্লাদারগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া শিবজী উভয় দুর্গ হস্তগত করেন, ও কন্দানার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া সিংহগড় রাখেন। আখ্যায়িকায় চাকন ও সিংহগড়ের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শিবজীর বিমাতা টুকাবাইয়ের ভ্রাতা বাজী-মহিতী সোপা দুর্গের ভার প্রাপ্ত ছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহর রজনী সময়ে আপন মাউলী সৈন্য লইয়া শিবজী এই দুর্গ সহসা আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। মাতুলের প্রতি কোনও অত্যাচার না করিয়া তাহাকে কর্ণাটে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরেই পুরন্দর দুর্গের অধীশ্বরের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে ভ্রাতৃকলহ হয়, শিবজী কনিষ্ঠ দুই ভাইয়ের সহায়তা করিবার ছলনায় আপনি সেই দুর্গ হস্তগত করেন। এই অভদ্র আচরণে তিন ভ্রাতাই শিবজীর উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শিবজী যখন দেশের স্বাধীনতা স্বরূপ আপন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন, যখন সেই উদ্দেশ্যসাধন জন্য ভ্রাতৃগণ হইতে সহযতা যাচ্ঞা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের ক্রোধ রহিল না। শিবজীর বাক্‌পটুতার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তাঁহার কথা শুনিয়া ও তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া তিন ভ্রাতাই শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হস্তগত করেন, তাহার নাম লিখিয়া এই আখ্যায়িকা পূর্ণ করিবার আবশ্যকতা নাই। ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে শিবজীর কর্ম্মচারী আবাজী স্বর্ণদেব কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ জয় করিলেন, তখন বিজয়পুরের সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করিলেন ও তাহাকে এক প্রস্তরময় ঘরে রাখিয়া আদেশ করিলেন যে নিযমিত সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা স্বীকার না করিলে সেই গৃহের দ্বার প্রস্তর দ্বারা একেবারে রুদ্ধ হইবে। শিবজী দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিয়া পিতার প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু চারি বৎসরকাল শাহজী বিজয়পুরে বন্দী স্বরূপ রহিলেন।

জোলীর রাজা চন্দ্ররাওকে শিবজী স্বপক্ষে আনিবার জন্য ও মুসলমান অধীনতাশৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য অনেক পরামর্শ দেন। চন্দ্ররাও যখন একেবারে অস্বীকার করিলেন তখন শিবজী নিজ লোকদ্বারা সেই রাজা ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া, সহসা রাত্রিযোগে আক্রমণ করিয়া সেই দুর্গ হস্তগত করেন। শিবজী আপন উদ্দেশ্যসাধনার্থ অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ গর্হিত কার্য্য আর একটী করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সমস্ত জোলী প্রদেশ অধিকার করিলেন

ও সেই বৎসরেই(১৬৫৬)প্রতাপগড নামক একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণকরাইলেন,ও আপন প্রধান মন্ত্রী সত্রাজপন্তকে পেশওয়া খেতাব দিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে সত্রাজ কঙ্কণদেশে ফতেখাঁর নিকট পরাস্ত হওয়ায় শিবজী তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া পদচ্যুত করিলেন ও মুরেশ্বর ত্রিমুল পিঙ্গলীকে পেশওয়া করিলেন। মুরেশ্বরের সহিত পাঠক পূর্ব্বেই পরিচিত হইয়াছেন। সমগ্র কঙ্কণদেশ জয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য জড় হইল।

এবার বিজয়পুরের স্থলতান শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানস করিলেন। আবুল ফাজেল নামক একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ৫০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০০ পদাতিক ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া যাত্রা করিলেন। গর্ব্বিতভাবে প্রকাশ করিলেন যে শীঘ্রই সেই অকিঞ্চিৎকর বিদ্রোহীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া স্থলতানের পায়তখ্তের নিকট উপস্থিত করিবেন। (১৬৫৯ খৃঃ অব্দ)

এ সৈন্যের সহিত সম্মুখযুদ্ধ অসম্ভব; শিবজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আবুল ফাজেল গোপীনাথ নামক একজন ব্রাহ্মণকে শিবজী-সদনে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপগড় দুর্গের নিকট সভামধ্যে সাক্ষাৎ হইল ও নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল, রজনী যাপনার্থ গোপীনাথের জন্য একটি স্থান নির্দ্দেশ করা হইল।

রজনীযোগে শিবজী গোপীনাথের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শিবজীর অসাধারণ বাক্পটুতা ছিল, তিনি গোপীনাথকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া বলিলেন 'আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ করুন। আমি যাহাই করিয়াছি সমস্তই হিন্দুজাতির জন্য, হিন্দুধর্ম্মের জন্য করিয়াছি; স্বয়ং ভবানী আমাকে ব্রাহ্মণ ও গোবৎসাদিকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছেন, হিন্দুদেব ও দেবালয়ের উচ্ছিষ্টকারীদিগকে দণ্ড দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ও স্বধর্ম্মের শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, ভবানীর আদেশ সমর্থন করুন, ও আপন জাতীয় ও দেশীয় লোকের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করুন।' এইরূপ উত্তেজনা বাক্যের পর শিবজী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে জয়লাভ হইলে তিনি গোপীনাথকে হেওরা গ্রাম অর্পণ করিবেন। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সেই গ্রাম তাঁহাদেরই থাকিবে। গোপীনাথ এই সমস্ত বাক্যে তুষ্ট হইয়া শিবজীর সহায়তা করিতে স্বীকার হইলেন; পরামর্শ স্থির হইল যে কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবুল ফাজেলের সহিত শিবজীর কোন স্থানে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক।

কয়েকদিন পর প্রতাপগড় দুর্গের নিকটই সাক্ষাৎ হইল। আবুল ফাজেলের পঞ্চদশ শত সেনা দুর্গ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রহিল, তিনি স্বয়ং একমাত্র সহচরের সহিত শিবিকারোহণে নির্দ্দিষ্ট গৃহে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবজী সেই দিন বহুযত্নে প্রাতে স্নান পূজাদি সমাপন করিলেন; স্নেহময়ী মাতার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ যাচঞা করিলেন; তুলার কুর্ত্তি ও উষ্ণীষের নীচে লৌহবর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করিলেন; দুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, বাল্যসহচর তন্নজীমালশ্রীকে সঙ্গে লইয়া আবুল ফাজেলের নিকট আসিলেন.—আলিঙ্গনচ্ছলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা মুসলমানকে ভূতলশায়ী করিলেন। শিবজীর উদ্দেশ্য সাধন হইল, কিন্তু এই গর্হিত কার্য্যে তাঁহার যশোরাশি চিরকাল কলুষিত থাকিবে। তৎক্ষণাৎ শিবজীর গুপ্তসেনা আবুল ফাজেলের সেনাকে পরাস্ত করিল, অন্নজী দত্ত নামক শিবজীর প্রসিদ্ধ কর্ম্মচারী পানাল্লা ও পবনগড় হস্তগত করিলেন, বিজয়পুরের অন্য সেনাপতি রস্তুম জমানকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয়পুরের দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া দেশ লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন।

বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ আরও তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন পক্ষই বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিল না। অবশেষে ১৬৬২ খৃঃ অব্দে শাহজী মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিজয়পুর ও শিবজীর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন। শাহজী যখন শিবজীকে দেখিতে আসিলেন শিবজী পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আপনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পিতাকে রাজার তুল্য অভিবাদন করিলেন, পিতার শিবিকার সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন, ও পিতা বসিতে আদেশ করিলে ও তিনি পিতার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন না। কয়েকদিন পুত্রের নিকট থাকিয়া শাহজী পরম তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে যাইলেন, ও সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন। শিবজী পিতা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত এই সন্ধির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। শাহজীর জীবদ্দশায় শিবজীর সহিত বিজয়পুরের আর যুদ্ধ হয় নাই, তাহার পরও যখন যুদ্ধ হয় সেই সময়ে শিবজী আক্রমণকারী ছিলেন না।

১৬৬২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধিস্থাপন হয়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই বৎসরই মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। আমাদের আখ্যায়িকাও এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভের সময় সমস্ত কঙ্কণদেশ শিবজী অধিকৃত করিয়াছিলেন, ও তাঁহার সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশৎ পদাতিক সেনা ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শুভকার্য্য সম্পাদন।

"যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর,
জ্বলুক গগন ব্যাপি অনন্ত বহ্নিতে।
জ্বলুক সে দেবতেজ স্বর্ণ সংবেষ্টিয়া,
অহোরাত্রি অবিশ্রান্ত প্রদীপ্ত শিখায়,

দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে
পুত্র পরম্পরা দগ্ধ চির শোকানলে।"

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূর্য্য অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিয়াছেন, সিংহগড় দুর্গের ভিতর সৈন্যগণ নিঃশব্দে সজ্জিত হইতেছে; এত নিঃশব্দে যে দুর্গের বাহিরের লোকও দুর্গের ভিতর কি হইতেছে তাহা জানিতে পারে না।

দুর্গের একটি উন্নত স্থানে কএকজন মহাযোদ্ধা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; সেই দুর্গচূড়া হইতে দৃশ্য অতি মনোহর। দুর্গতলে, পূর্ব্বদিকে সুন্দর নীরা নদী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নদীর উপত্যকা বসন্ত কালের নব পুষ্প পত্র ও দুর্ব্বাদলে সুশোভিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। উত্তরদিকে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র, বহুদূর পর্য্যন্ত সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। বহুদূরে বিস্তীর্ণ পুনা নগরী সুন্দর শোভা পাইতেছে, যোদ্ধাগণ প্রায়ই সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, অদ্য রজনীতে সেই নগরীতে কি বিষম ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। কেহ কেহ বা দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে দেখিতেছিলেন, উন্নত পর্ব্বতের পর উন্নত পর্ব্বত, যতদূর দেখা যায় অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী নীল মেঘমালায় বিজড়িত রহিয়াছে, অথবা অস্তাচলচূড়াবলম্বিসূর্য্যকিরণে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। কিন্তু বোধ করি যোদ্ধাগণ এই চমৎকার পর্ব্বত দৃশ্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন না; অন্য চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছেন।

যে যুদ্ধে বা যে অসমসাহসিক কার্য্যে একবারে বহুকালের বাঞ্ছিত ফল লাভ হইতে পারে বা এককালে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহার প্রাক্কালে মুহূর্ত্তের জন্যও অতিশয় সাহসিক হৃদয়ও চিন্তাপূর্ণ ও স্তম্ভিত হয়। অদ্য শায়েস্তাখাঁ ও মোগল সৈন্য ছিন্নভিন্ন ও পরাভূত হইবে, অথবা অসমসাহসে মহারাষ্ট্র সূর্য্য একবারে চির-অন্ধকারে অস্ত যাইবে, এইরূপ চিন্তা অগত্যা যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে উদ্রেক হইতে লাগিল। কেহ এ চিন্তা ব্যক্ত করিলেন না, ভবানীর আশীর্ব্বাদে অবশ্যই জয় হইবে, সকলেই এইরূপ বলিয়াছিলেন, তথাপি যখন নিঃশব্দে যোদ্ধা যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করিলেন তখন কাহারও মনোগত ভাব লুক্কায়িত রহিল না। কেবল বিংশ বা পঞ্চবিংশ মাত্র সেনা লইয়া শিবজী শত্রুসেনার মধ্যে যাইয়া আক্রমণ করিবেন। এরূপ ভীষণ কার্য্যে শিবজীও কখন লিপ্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ! কেনই বা যোদ্ধাদিগের ললাট মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তামেঘাচ্ছন্ন না হইবে?

সেই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বহুদর্শী পেশওয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি শিবজীর পিতা শাহজীর অধীনে যুদ্ধব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, পরে শিবজীর অধীনে আসিয়া প্রতাপগড়ের চমৎকার দুর্গ তিনিই নির্ম্মাণ করেন। চারি

বৎসরাবধি পেশওয়া পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই পদের যোগ্যতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবুল ফাজেলকে শিবজী হত্যা করিলে পর মুরেশ্বরই তাঁহার সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, পরে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হওয়া অবধি তিনিই পদাতিক সৈন্যের সরনোবৎ অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধকালে সাহসী, বিপদকালে স্থির ও অবিচলিত, পরামর্শে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী, মুরেশ্বর অপেক্ষা কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী ও প্রকৃত বন্ধু শিবজীর আর ছিল না।

আবাজী স্বর্ণদেব নামে তথায় দ্বিতীয় একজন দূরদর্শী ও যুদ্ধপটু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম নীলুপন্ত স্বর্ণদেব, কিন্তু আবাজী নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনিই ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে কল্যাণ দুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ হস্তগত করেন, এবং সম্প্রতি রায়গড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধনামা অন্নজীদত্তও অদ্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনিই পানাল্লা ও পবনগড় হস্তগত করেন, ও শিবজীর কর্ম্মচারীর মধ্যে এক জন প্রধান ও অতিশয় কার্য্যদক্ষ ছিলেন।

অশ্বারোহীর সরনোবৎ অর্থাৎ সেনাপতি নিতাইজী পহলকর সিংহগড়ে ছিলেন না; তিনি কিরূপে মোগল সৈন্যের সম্মুখ দিয়া যাইয়া আরঙ্গাবাদ ও আহম্মদনগর ছারখার করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা আমরা শাঁয়েস্তাখাঁর সভায় চাঁদখাঁর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। সিংহগড়ে সে সময়ে কেবল অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সেনা কর্ত্তাজী গুজ্জরনামক একজন নীচস্থ সেনানীর অধীনে অবস্থিতি করিতেছিল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে শিবজীর তিন জন প্রধান মাউলী বাল-সুহৃদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বাজী ফাসলকরের তিন বৎসর পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল; তন্নজীমালশ্রী ও যশজী কঙ্ক অদ্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। বাল্যকালের সৌহার্দ্দ্য, যৌবনের বিষম সাহস ইহাঁরা এক্ষণও ভুলেন নাই, শিবজীকে প্রাণের ন্যায় ভাল বাসিতেন; শতবার রজনীযোগে মাউলী সৈন্য লইয়া শিবজীর সহিত শত পর্ব্বত দুর্গ নিঃশব্দে আরোহণ করিয়া সহসা অধিকার করিয়াছিলেন।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যার ছায়া যেন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ হইতেছে, তখনও সেই যোদ্ধৃমণ্ডলী দুর্গশৃঙ্গে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান; এমত সময়ে শিবজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। যোদ্ধার নয়ন উজ্জ্বল, বস্ত্রের নীচে তিনি বর্ম্ম ও অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, অদ্য নিশির অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। দৃষ্টি স্থির ও অবিচলিত।

ধীরে ধীরে বলিলেন " সমস্ত প্রস্তুত, বন্ধুগণ। বিদায় দিন।"

ক্ষণেক সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শেষে মুরেশ্বরপন্ত বলিলেন "তবে স্থির করিয়াছেন, অদ্য রজনীতে স্বর্ণদেব কি তন্নজী কি আমাকে সঙ্গে যাইতে দিবেন না? মহাত্মন। বিপৎকালে কবে আমরা আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি?"

শিবজী। "পেশওয়াজী। ক্ষমা করুন, আর অনুরোধ করিবেন না; আপনাদের সাহস, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের বিজ্ঞতা আমার নিকট অবিদিত নাই; কিন্তু অদ্য ক্ষমা করুন। ভবানীর আদেশে আমি অদ্য বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অদ্য আমিই এই কার্য্য সাধন করিব নচেৎ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। আশীর্ব্বাদ করুন জয়লাভ করিব; নচেৎ যদি অমঙ্গল হয়, যদি অদ্যকার কার্য্যে নিধন প্রাপ্ত হই, তথাপি আপনারা তিন জন থাকিলে মহারাষ্ট্রের সকলই রহিল। আপনারা আমার সহিত বিনষ্ট হইলে কাহার দূরদর্শী বুদ্ধিবলে দেশ থাকিবে? কাহার বাহুবলে স্বাধীনতা থাকিবে? হিন্দু-গৌরব কে রক্ষা করিবে? যাত্রাকালে আর অনুরোধ করিবেন না।"

পেশওয়া বুঝিলেন আর অনুরোধ করা বৃথা, সুতরাং আর কিছু বলিলেন না। শিবজী পেশওয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"মুরেশ্বর, আপনি পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছেন, আপনি আমার পিতৃতুল্য, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আজ জয়লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অবশ্যই ফলিবে। আবাজী। তন্নজী। আসুন, আমি কার্য্যে প্রস্থান

সকলেই বাষ্পোৎফুল্ল লোচনে বিদায় দিলেন।

পরে তন্নজী ও যশজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাল্য-সুহৃৎ। বিদায় দাও।"

দুই জনই খেদে নির্ব্বাক্। ক্ষণেক তন্নজী বলিলেন—"প্রভু! কি অপরাধে আমাদিকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতেছেন? কোন দৈশ ব্যাপারে, কোন্ দুর্গ জয়ের সময় আমরা প্রভুর সঙ্গে না ছিলাম? পূর্ব্বকাল স্মরণ করিয়া দেখুন, কঙ্কণদেশে আপনার সহিত কে ভ্রমণ করিত? শৈলচূড়ে, উপত্যকায়, পর্ব্বতগহ্বরে, তরঙ্গিণীতীরে কে আপনার সহিত দিবায় শিকার করিত, রজনীতে একত্র শয়ন করিত, বা দুর্গজয়ের পরামর্শ করিত? যশজী, মৃত বাজী, আর এই দাস তন্নজী। বাজী প্রভুর কার্য্যে হত হইয়াছে, আমাদেরও তাহা ভিন্ন অন্য বাসনা নাই। অনুমতি করুন অদ্য প্রভুর সঙ্গে যাই, জয়লাভ হইলে প্রভুর আনন্দে আনন্দিত হইব, যদি প্রভু বিনষ্ট হন, বিবেচনা করুন আমাদের এস্থানে জীবিত থাকিলে কোন উপকার নাই, আমাদের এরূপ বুদ্ধিবল নাই যে পরে রাজকার্য্যে কোন সাহায্য করি। আপনার বাল-সুহৃদ্‌কে বঞ্চিত করিবেন না।"

শিবজী দেখিলেন তন্নজীর চক্ষে জল, মুগ্ধ হইয়া তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন " ভ্রাতঃ তে ‥দিগকে অদেয় আমার কিছুই নাই ;— সজ্জা করিবা লও।" দুই জনে ‥ তিতে দুর্গের নীচে অবতরণ করিলে তথায় বর্ষাকালের সায়ংকালিক কৃষ্ণ মেঘরাশির ন্যায় রাশি রাশি সৈন্য সজ্জি হইতেছিল। শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ রিলেন।

দুঃখিনী জীজী একাকী একটি ঘরে উপবেশন করিয়া চিন্তা করি‥ ছিলেন, পুত্রের অদ্যকার বিপদে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমত সময় শিবজী আসিয়া বলিলেন—

" মাতঃ, আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই।"

জীজী স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন " বৎস! আইস একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি ; কবে তোমার এ বিপদ্‌রাশি শেষ হইবে, কবে এ দুঃখিনীর শোক ও চিন্তা শেষ হইবে ?"

শিব। " মাতঃ, আপনার আশীর্ব্বাদে কবে কোন্‌ বিপদ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি ? কোন্‌ যুদ্ধে জয়ী না হইয়াছি ?"

জীজী। " বৎস! দীর্ঘ-জয়ী হও, ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন।" সস্নেহে শিবজীর মস্তকে হাত দিলেন, দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুজল শীর্ণ বক্ষঃস্থলের উপর পড়িতে লাগিল।

শিবজী সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন। এতক্ষণ তাঁহার দৃষ্টি স্থির ও স্বর অকম্পিত ছিল, এক্ষণ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চক্ষুর্দ্বয় ছল্‌ ছল্‌ করিতে লাগিল ; উদ্বেগকম্পিতস্বরে বলিলেন—

" স্নেহময়ী জননি! আপনিই আমার ঈশানী, আপনাকে যেন ভক্তিভাবে চিরজীবন পূজা করি, আপনার আশীর্ব্বাদে সকল বিপদ্‌ তুচ্ছজ্ঞান করিব।" বীরশ্রেষ্ঠ মাতার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন, মাতৃস্নেহের পবিত্র অশ্রুবারিতে সেই পবিত্র পদযুগল ধৌত করিলেন।

জীজী পুত্রকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন, ও বহু অশ্রুপাত করিয়া বিদায়কালে বলিলেন " বৎস, হিন্দুধর্ম্মের জয়সাধন কর ; স্বয়ং দেবরাজ শম্ভু তোমার সাহায্য করিবেন।" শিবজী অশ্রুমোচন করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন।

সমস্ত সেনা সজ্জিত। শিবজী নিঃশব্দে অশ্বারোহণ করিলেন ; নিঃশব্দে সৈন্যগণ দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

দুর্গদ্বার অতিক্রম করিবার সময়ে একজন অতি অল্পবয়স্ক যোদ্ধা শিবজীর সম্মুখে আসিয়া শির নামাইল ; শিবজী তাহাকে চিনিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—

" রঘুনাথজী হাবিলদার! তোমার কি প্রার্থনা ?"

রঘু। " প্রভু যে দিন তোরণ দুর্গ হইতে পত্রাদি আনিয়াছিলাম, সে দিন

প্রসন্ন হইয়া পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।”

শিব। “অদ্য এই উৎকট ব্যাপারের প্রারম্ভে কি পুরস্কার চাহিতে আসিয়াছ?”

রঘু। এই পুরস্কার চাই যে ঐ উৎকট ব্যাপারে আমাকে লিপ্ত হইতে দিন; যে পঞ্চবিংশ মাউলী যোদ্ধার সহিত পুনানগরে প্রবেশ করিবেন, দাসকে তাহাদের সহিত আপনার সঙ্গে যাইতে আদেশ করুন।”

শিব। “কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক এ সংকটে আসিতেছ? তোমার এই বিষয়েই বা বিশেষ কি অধিকার আছে?”

রঘু। “রাজন্! আমি ক্ষুদ্রতম সৈনিক, আমার বিশেষ অধিকার কি থাকিবে? এই মাত্র আছে যে আমার এ জগতে কেহ নাই, অন্যে মরিলে লোকে শোক করিবে, আমি এই আহবে মরিলে আক্ষেপ করিবে এরূপ জন মাত্র নাই। আর যদি প্রভুকে কার্য্যদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারি, জীবিত থাকিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি; তবে,—তবে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল।”

রঘুনাথের সেই কৃষ্ণকেশগুচ্ছগুলি ভ্রমরবিনিন্দিত, নয়নের উপর পড়িয়াছে, সেইরূপ বালকের সরল উদার মুখমণ্ডলে যোদ্ধার স্থির প্রতিজ্ঞা বিরাজ করিতেছে। অল্পবয়স্ক যোদ্ধার এইরূপ কথা শুনিয়া ও উদার মুখমণ্ডল দেখিয়া শিবজী সন্তুষ্ট হইলেন, ও সঙ্গে পুনার ভিতরে যাইতে অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ আবার শির নত করিয়া পরে লম্ফ দিয়া অশ্বে অধিরোহণ করিলেন।

সিংহগড় হইতে পুনা পর্য্যন্ত সমস্ত পথে শিবজী নিজ সৈন্য রাখিলেন। সন্ধ্যার ছায়ায় নিঃশব্দে সেই পথের স্থানে স্থানে সেনা সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। একটি দীপ জ্বলিলে, বা সৈন্যেরা শব্দ করিলে পুনায় তাঁহার এই কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে, সুতরাং নিঃশব্দে অন্ধকারে সৈন্য সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন।

সে কার্য্য শেষ হইল, রজনী জগতে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল, শিবজী তন্নজী ও যশজী ২৫ জন মাত্র মাউলী লইয়া পুনার নিকটে একটি বৃহৎ বাগানে পহুছিয়া তথায় লুক্কায়িত রহিলেন। রঘুনাথ ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাৎ রহিলেন।

আরও গাঢ়তর অন্ধকার সেই অন্ত্রকাননকে আবৃত করিল, সন্ধ্যার শীতলবায়ু আসিয়া সেই কাননের মধ্যে মর্ম্মর শব্দ করিতে লাগিল, সন্ধ্যার পথিক একে একে সেই কাননের পার্শ্ব দিয়া পুনাভিমুখে চলিয়া যাইল, নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিল না, পত্রের মর্ম্মর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রবণ করিল না।

ক্রমে পুনার গোলমাল নিস্তব্ধ হইল, দীপাবলি নির্ব্বাণ হইল, নিস্তব্ধ নগরে কেবল প্রহরিগণ এক একবার উচ্চ শব্দ

করিতে লাগিল, ও সময়ে সময়ে শৃগালের শব্দ বায়ুপথে আসিতে লাগিল।

ঢং ঢং ঢং সহসা শব্দ হইয়া উঠিল; শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল; সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গলির মধ্যে শব্দ হইতেছিল, নগরের বাহির হইতে দেখা যায় না।

ঢং ঢং ঢং পুনরায় শব্দ হইল, আবার চাহিয়া দেখিলেন; বহুলোক দীপাবলী লইয়া বাদ্য করিতে করিতে প্রশস্ত পথ দিয়া আসিতেছে;—এই বরযাত্রা!

বরযাত্রা নিকটে আসিল। পুনার চারিদিকে প্রাচীর নাই, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পথ লোকে সমাকীর্ণ, ও নানা বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অতি উচ্চ রব হইতেছে। অনেকে অশ্বারোহী, অধিকাংশ পদাতিক।

শিবজী নিঃশব্দে বাল-সুহৃদ তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিলেন মাত্র। 'হয়ত এই শেষ বিদায়' এই ভাব সকলের মনে জাগরিত হইল ও নয়নে ব্যক্ত হইল, কিন্তু বাক্যে অনাবশ্যক। নিঃশব্দে শিবজী ও তাঁহার লোক সেই যাত্রীদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন।

যাত্রীগণ শায়েস্তাখাঁর বাটির নিকট দিয়া যাইল; বাটীর কামিনীগণ গবাক্ষে আসিয়া সেই বহুলোকসমারোহ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে যাত্রীগণ চলিয়া গেল, কামিনীগণ ও শয়ন করিতে গেলেন; যাত্রীদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিংশৎ জন খাঁসাহেবের গৃহের নিকট লুক্কায়িত রহিলেন। ক্রমে বরযাত্রার গোল থামিয়া গেল। শুভকার্য্য সম্পাদিত হইল।

রজনী আরও গভীর হইল; শায়েস্তাখাঁর রন্ধন গৃহের উপর একটি গবাক্ষ ছিল তথায় অল্প অল্প শব্দ হইতে লাগিল, খাঁ সাহেবের পরিবারের কামিনীগণ সকলে নিদ্রিত অথবা নিদ্রালু, সে শব্দ শুনিয়াও গ্রাহ্য করিলেন না।

একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি, পরে আর একখানি সরিল, ঝুর ঝুর করিয়া বালুকা পড়িল। নারীগণ তখন সন্দিগ্ধ হইয়া সেই স্থান দেখিতে আসিলেন, দেখিলেন ছিদ্রের ভিতর দিয়া একজন, পরে আর একজন, পরে আর একজন যোদ্ধা! পিপীলিকা সারের ন্যায় যোদ্ধৃগণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে! তখন চীৎকার শব্দ করিয়া যাইয়া শায়েস্তাখাঁর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমুদয় অবগত করিলেন।

শিবজী সন্ধি প্রার্থনার মিনতি করিতেছেন, খাঁ সাহেব এইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; সহসা জাগরিত হইয়া শুনিলেন, শিবজী পুনা হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন।

পলায়নার্থে এক দ্বারে আসিলেন, দেখিলেন বর্ম্মধারী মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা! অন্য দ্বারে আসিলেন, তাহাই দেখিলেন। সভয়ে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিলেন, গবাক্ষ দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছিলেন,

এমত সময়ে সভয়ে শুনিলেন 'হর হর মহাদেও' বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ পার্শ্বের গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

তখন রাজপুরী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোল হইল। প্রাসাদের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল, অনেকেই হত বা আহত হইয়াছিল, তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রভুর রক্ষার্থ দৌড়িয়া আসিল ও সেই পঞ্চবিংশজন মাউলীকে চারিদিকে বেস্টন করিল।

শীঘ্রই ভীষণ রবে সেই প্রাসাদ পরিপূরিত হইল; কোন ঘরের দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, অন্ধকারে মাউলীগণ পিশাচের ন্যায় চীৎকার করিয়া হত্যা করিতে লাগিল; কোন ঘরে মশালের আলোকে হিন্দু ও মুসলমান যুদ্ধ করিতেছে, কবাটের ঝন্‌ঝনা শব্দ, আক্রমণকারীদিগের মুহুর্মুহুঃ উল্লাসরব, ও আক্রান্ত ও আহতদিগের চীৎকারে ও আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইল। সেই সময়ে শিবজী বর্শা হস্তে লম্ফ দিয়া যোদ্ধাদিগের মধ্যে পড়িলেন। 'সনাতনধর্ম্মের জয় হউক' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, মোগল প্রহরীগণ পলায়ন করিল, অথবা সমস্ত হত ও আহত হইল। শিবজী ভীষণ বর্শাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া শায়েস্তাখাঁর শয়নঘরে আসিয়া পড়িলেন।

সেনাপতির রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন মোগল সেই ঘরে ধাবমান হইল; শিবজী দেখিলেন সর্ব্বসম্মুখে মৃত চাঁদখাঁর বিক্রমশালী পুত্র শমশের খাঁ! পিতা অপমানিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে; তথাপি পুত্র সেই প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ও অগ্রগণ্য। শিবজী এক মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান হইলেন; কোষে খড়্গ রাখিয়া বলিলেন, 'যুবক, তোমার পিতার রক্তে এক্ষণও আমার হস্ত কলুষিত রহিয়াছে, তোমার জীবন লইব না, পথ ছাড়িয়া দেও।'

'কাফের। হত্যাকারীর এই দণ্ড।' শম্‌শের খাঁর নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলন্ত, শিবজী আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বেই শম্‌শেরের উজ্জ্বল খড়্গ আপন মস্তকোপরি দেখিলেন।

মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতা ভবানীর নাম লইলেন; সহসা দেখিলেন পশ্চাৎ হইতে একটি বর্শা আসিয়া খড়্গধারী শমসেরকে ভূতলশায়ী করিল। পশ্চাতে দেখিলেন রঘুনাথজী হাবিলদার!

'হাবিলদার! এ কার্য্য আমার স্মরণ থাকিবে।' কেবল এই মাত্র বলিয়া শিবজী অগ্রসর হইলেন।

এই অবসরে গবাক্ষ দিয়া রজ্জু অবলম্বন করিয়া শায়েস্তাখাঁ পলাইলেন। কয়েক জন মাওলী সেই গবাক্ষমুখে ধাবমান হইয়াছিল, একজন খড়্গের আঘাত করিয়াছিল তাহা শায়েস্তাখাঁর অঙ্গুলীতে লাগিয়া একটি অঙ্গুলী ছেদন হইল, কিন্তু

শায়েস্তাখাঁ আর পশ্চাতে না ফিরিয়া পলায়ন করিলেন, তাঁহার পুত্র আবদুল ফতেখাঁ ও সমস্ত প্রহরী নিহত হইয়াছিল। তখন শিবজী দেখিলেন ঘর, প্রাঙ্গণ, বারন্দা রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে প্রহরীগণের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, স্ত্রীলোক ও পলাতকগণের আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইতেছে, ও তখনও মাউলীগণ, মোগলদিগের ধ্বংস সাধনার্থ চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। মশালের অস্পষ্ট আলোকে কাহারও মৃতদেহ, কাহারও ছিন্নমুণ্ড, কোথাও বা রক্ত প্রণালী ভীষণ দেখাইতেছিল। তখন শিবজী আপন মাউলীদিগকে নিকটে ডাকিলেন। সকল সময়ে সকল যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করিলে পর বৃথা প্রাণনাশ দেখিলে বিরক্ত হইতেন ও শত্রুর ও সেরূপ প্রাণনাশ যাহাতে না হয় তাহার যথেষ্ট যত্ন করিতেন। আদেশ করিলেন, 'আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে, ভীরু শায়েস্তাখাঁ আর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না; এক্ষণে দ্রুতবেগে সিংহগড়াভিমুখে চল।'

অন্ধকার রজনীতে শিবজী অনায়াসে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন ও সিংহগড়ের দিকে ধাবমান হইলেন, প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়া মশাল জ্বালিবার আদেশ দিলেন। বহুসংখ্যক মশাল জ্বলিল; পুনা হইতে শায়েস্তাখাঁ দেখিতে পাইলেন মহারাষ্ট্রসেনা নিরাপদে সিংহগড়ে উঠিল।

পর দিন প্রাতে ক্রুদ্ধ মোগলগণ সিংহগড় আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু গড়ের কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল. কর্ত্তাজী গুজর ও তাঁহার অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীগণ বহুদূর পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গেল।

অল্প বিপদে সাহসী যোদ্ধার আরও যুদ্ধপিপাসা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শায়েস্তাখাঁ সেরূপ যোদ্ধা ছিলেন না; তিনি আরংজীবকে একখানি পত্র লিখিলেন, তাঁহাতে নিজ সৈন্যের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন ও যশোবন্ত অর্থে বশীভূত হইয়া শিবজীর পক্ষাচরণ করিতেছে এইরূপ জানাইলেন। আরংজীব দুই জনকেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া ডাকাইয়া পাঠাইলেন, ও নিজপুত্র সুলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে পাঠাইলেন, পরে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য যশোবন্তকে পুনর্ব্বার পাঠাইলেন।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন যুদ্ধকার্য্য হইল না। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই শিবজীর পিতা শাহজীর কাল হওয়ায় শিবজী সিংহগড়েই শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া, পরে রায়গড়ে যাইয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন ও নিজনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। আমরা এখন এই নবভূপতির নিকট বিদায় লইব।

পাঠক! বহু দিবস হইল তোরণদুর্গ হইতে আসিয়াছি, চল এই অবসরে একবার সেই দুর্গে যাইয়া কি হইতেছে দেখি।

মৌক্তিক।

পাঠক, অনেক দিন হইল যে মণিকার তোমার সুন্দর গ্রীবায় হীরককণ্ঠি পরাইয়াছিল, অদ্য সেই আবার এই মৌক্তিক হার লইয়া তোমার সমক্ষে উপস্থিত। মুক্তা নানা আকারের ও নানা মূল্যের, বৃহৎ হংসডিম্বের ন্যায় মুক্তাও আছে, এবং সর্ষপ প্রমাণ অতি ক্ষুদ্র মুক্তাও আছে। আবার এক একটি মুক্তার মূল্য একাদশ লক্ষ মুদ্রারও অধিক, আবার দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরা যে মুক্তা ভস্ম করেন, তাহার মূল্য এক পয়সারও কম। আমার এই হারে সুন্দরের কারু-চাতুর্য্য নাই। এবং ইহার গুণ ব্যাখ্যা করিতে "মেলেনী মাসী" ও নাই। কিন্তু মুক্তাগুলি বহুমূল্য—কেন না বহুযত্নে সংগৃহীত। যদি তুমি একবার পরিধান কর তবেই শ্রম সার্থক বোধ করিব।

মুক্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষে একটি কাব্যীয় প্রবাদ আছে। অর্থাৎ বৈশাখ মাসে যখন নূতন জল পতিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন শুক্তি গুলি মুখব্যাদান করিয়া জলের উপরিভাগে বিচরণ করিতে থাকে, পরে যে দিবস স্বাতীনক্ষত্রের যোগ হয়, তখনকার বৃষ্টিজল শুক্তির অভ্যন্তরে পতিত হইলেই মুক্তার উৎপত্তি হয়।

ভেরোনা নগরবাসী রোমীয় পণ্ডিত প্লিনি এই ভারতীয় প্রবাদের সহিত স্বীয় কল্পনা মিশাইয়া মুক্তার উৎপত্তির এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন যে "কস্তুরিকা-গৃহীত নীহারকণার গুণানুসারে মুক্তার গুণের তারতম্য হয়। শিশিরবিন্দু পরিষ্কৃত হইলে মুক্তাও পরিষ্কৃত হয়; এবং উহা অপরিষ্কৃত হইলে মুক্তাও অপরিষ্কৃত হয়। যখন সেই বহুমূল্য বিন্দু শুক্তিগর্ভে পতিত হয়, তখন বায়ু মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে, মুক্তার পাংশুবর্ণ হয়; শুক্তিতে যত শিশির পড়ে তত পড়িলে মুক্তা বৃহৎ হয়। বিদ্যুদুদ্গম হইলে অকস্মাৎ শুক্তির মুখরুদ্ধ হওয়াতে মুক্তা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়। শিশিরবিন্দুগ্রহণ সময়ে বজ্রপাত হইলে মুক্তাও অন্তঃসারশূন্য খোসার ন্যায় হইয়া যায়।"

ইতালি দেশের একজন প্রসিদ্ধ কবিও পূর্ব্বোক্তরূপ কল্পনা করিয়াছেন। মুক্তার কল্পিত উৎপত্তি যত অদ্ভুত না হউক, প্রকৃত উৎপত্তি বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে কস্তূরিকা-জাতীয় অনেকগুলি মৎস্যের এক প্রকার পীড়া হইতে এই বহুমূল্য-পদার্থটি উৎপন্ন।* ডাক্তর বেনার্ড

* ১৭১৭ খৃঃ অঃ রুমার নামা পণ্ডিত বলেন প্রাণীদিগের শরীরে ইহা একপ্রকার পাথরি রোগ।

কহেন, কখন কখন শুক্তি ও তন্মধ্যস্থ মৎস্যদেহের অন্তরে বালুকণা বা অপর কোন পদার্থ প্রবেশ করাতে একপ্রকার বিজাতীয় কণ্ডূয়ণ উপস্থিত হয়। সেই উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্য মৎস্যটি ঐ পদার্থের উপরে একখানি অতি সূক্ষ্মত্বক্ বিস্তার করে, এবং উহাকে স্বীয় শরীরস্থ একপ্রকার স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলে। কখন কখন অপর কোন জন্তু শুক্তিমধ্যস্থ প্রাণীটিকে বহির্গত করিবার জন্য শুক্তি-দেহের কোনস্থল বিদ্ধ করে; কিন্তু উক্ত প্রাণীটি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব কথিত উপায়ে ঐ বিদ্ধস্থল আবরণ করিয়া আত্মরক্ষা করে। এই উভয় কারণ হইতে যে মৌক্তিকের উৎপত্তি তাহা শুক্তির অভ্যন্তরেই দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌বেত্তা লিনিয়স এই শেষোক্ত উপায়ে মুক্তা উৎপাদন করিয়া স্বদেশস্থ রাজার নিকট বহু সম্মান ও গৌরবান্বিত উপাধি প্রাপ্ত হন। চীন দেশীয় লোকদিগের নিকট ইহা অনেক কাল হইতে বিদিত আছে। তাহারা জীবিত কস্তুরা ধরিয়া তাহার গাত্রে নানা পরিমাণের রন্ধ্র করিয়া ছাড়িয়া দেয়, অনেক কস্তুরা এইরূপে বিনষ্ট হয়, কিন্তু অনেকের অভ্যন্তরে এই কৃত্রিম উপায়ে নানা আকারের মুক্তা উৎপন্ন হয়।

ডাক্তর বেয়ার্ডের মতে অপর একপ্রকার মুক্তা শুক্তি মধ্যস্থ প্রাণীতে জন্মে, এবং উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সর এভারার্ড হিউম কহেন যে প্রাণি শরীরে প্রাগুক্তরূপ কণ্ডূয়ণ হইবার কারণ এই উহাতে এরূপ কতকগুলি অণ্ড উৎপন্ন হয়, যাহা হইতে শাবক জন্মে না, অর্থাৎ উহা নষ্ট হইয়া যায়। শুক্তি-মৎস্য যেরূপ অপর ডিম্ব প্রসব করে, ইহাদিগকে তদ্রূপ প্রসব করে না। উহা বীজাধারেই দ্বিতীয় বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। প্রাণিশরীর হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া বীজাধার ক্রমে বৃহৎ করিতে থাকে। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে ঐ বীজকোষের উপরে একটি সূক্ষ্মত্বক্ জন্মে। এবং পূর্ব্বোক্ত পদার্থে সেই অণ্ডগুলি সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া সুন্দর সুগোল মুক্তা উৎপন্ন হয়। শুক্তির অভ্যন্তরস্থ মুক্তাগুলি কখন গোল, কখন বাদামী আকারের হয়। প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা যে অতিক্ষুদ্র মুক্তার উল্লেখ করিয়াছি তাহাদিগকে মুক্তা ঝুরি কহে। ইংরেজীতে উহার নাম বীজ-মুক্তা। এই মুক্তা-ঝুরিগুলির প্রাচীন সময়ে বহুধা ব্যবহারছিল। কারণ প্লিনি এক স্থলে কহেন যে, ‘স্ত্রীলোকেরা পাদুকাতে পর্য্যন্ত মুক্তা পরিধান করিত।’ এদেশীয় স্ত্রীলোকেরাও পূর্ব্বে বেশরের দুলে ইহা ব্যবহার করিতেন, এবং অধুনা সীঁতি ও ঝুমকা প্রভৃতির দুলে ইহা ব্যবহৃত হয়। এস্থলে একটি কথা বলা প্রয়োজন। শুক্তি-মৎস্যের পীড়া নিবন্ধন মুক্তার যে উৎপত্তি হয়, তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। যাহারা মুক্তা সংগ্রহ করে,তাহারা বলে যে মসৃণ অক্ষত শুক্তি-গর্ভে মুক্তা প্রায়ই পাওয়া যায় না;

কিন্তু ভগ্ন ও অসমান শুক্তি-গর্ভে মুক্তা সচরাচরই দেখা যায়।

এসিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকার স্থানে স্থানে মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এসিয়ার সিন্ধুনদের পিলুতী নামক মোহানায়, করাচীনগরে, করমণ্ডল উপকূলস্থ টিউটিকরিন নগরে, লঙ্কার কণ্ডাচী উপসাগরে; মালক্কস্ প্রণালীতে, লোহিত সাগরে, পারস্য উপসাগরস্থ খরকদ্বীপে, এবং জাপান ও ফিলিপাইন দ্বীপের নিকটে মুক্তা পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মুর্সিদাবাদের কোন কোন বিলেও যথেষ্ট মুক্তা পাওয়া যায়। ইউরোপের মধ্যে স্কট্লণ্ডে অধুনা যথেষ্ঠ উৎকৃষ্ট মুক্তা মিলে। কথিত আছে যে দুইশতাব্দী পূর্ব্বে রোমানেরা ইংলণ্ড হইতে প্রভূত পরিমাণে মুক্তা সংগ্রহ করিত। প্লিনি বলেন যুলিয়স্ সিজর ভিনস্ দেবীকে যে কঞ্চুলিকা উপহার দেন, তাহা ব্রীটনীয় মুক্তায় খচিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পার্থ্ সায়রের নদীজাত লক্ষটাকার মুক্তা বর্ষে বর্ষে লণ্ডনে বিক্রীত হইয়াছে, এমন কি এখনও যাহারা কনওয়ে নামক উপকূলে ভ্রমণ করিতে যান, তাহারা এক ঔন্সপরিমিত ব্রীটনীয় মুক্তা ২॥০ টাকা হইতে ৫ টাকা মূল্যে যত ইচ্ছা ক্রয় করিতে পারেন। রুসিয়াতে নবোগরড্, ভাব্, স্কভ, প্রভৃতি প্রদেশে, এবং সাক্সনি, বেভেরিয়া, বোহিমিয়া, এবং সিলিসিয়ার নদীতে অদ্যাপি যথেষ্ঠ মুক্তা জন্মে।

এমেরিকায় মেক্সিকো ও কালিফর্নিয়ার উপকূলে, সেণ্ট টমাস, নবগ্রেণেডা, এবং ব্রীটিস পশ্চিম ইণ্ডিয়া দ্বীপসমূহে বহুল পরিমাণে মুক্তা পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এল্জেবিরা ও সুলুদ্বীপে, মাগ্রেরিটা দ্বীপে, ও পানামা উপসাগর প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট মুক্তা পাওয়া যায়। পারস্য গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ একমাত্র বেহারিণ দ্বীপে বর্ষে বর্ষে ২৪ লক্ষমুদ্রার মুক্তা সংগৃহীত হয়। করাচি নগরের নিকট যে সকল ক্ষুদ্র মুক্তা সংগৃহীত হয়, তজ্জন্য গর্ণমেণ্টকে বর্ষে বর্ষে চল্লিশ সহস্র মুদ্রা কর দিতে হয়। কি প্রণালীতে মুক্তা সংগৃহীত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটন করিলে, বোধহয় পাঠক বর্গের বিরক্তিকর হইবে না।

লঙ্কাদ্বীপই মুক্তার জন্য পৃথিবী মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; অতএব কণ্ডাচি উপসাগরে মুক্তা-সংগ্রহের বিবরণই আমরা নিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রতিবৎসর গবর্ণমেণ্ট হইতে উক্ত উপকূলের জরিপ হয়। জরিপ শেষ হইলে এক বৎসরের নিমিত্ত নিলামে ঐ জমা বিক্রীত হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে আরম্ভ হইয়া এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে মুক্তা সংগ্রহ শেষ হয়। সাকল্যে ছয় সপ্তাহ বা দুইমাস কাল ডুবারুরা মুক্তাসংগ্রহ করিতে পায়। কিন্তু এই সকল ডুবারু মালাবার উপকূলবাসী রোমান কাথলিক খৃষ্টান, ইহাদের এই সময় এতগুলি পর্ব্ব ও উপবাসাদি আছে যে,

মোট ৪০ দিনের অধিককাল কাজ করিতে পারে না। মুক্তাসংগ্রহব্যাপার যে দিন আরম্ভ হইবে, তাহার পূর্ব্ব দিবস রাত্র ১০ ঘটিকার সময় একটি কামানের শব্দ হয়। তৎক্ষণাৎ কণ্ডাচী উপসাগর হইতে সমুদায় নৌকা ছাড়িয়া দেয়। প্রত্যূষের সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে নৌকা পৌঁছে, এবং দিবা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ডুবাকুরা মুক্তা সংগ্রহ করে। দ্বিপ্রহরের পর তথা হইতে নৌকা বোঝাই করিয়া বেলাবেলি কণ্ডাচী উপসাগরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। অমনি শুক্তি গুলি তীরে উঠাইয়া নিলাম করা হয়। প্রত্যেক নৌকায় ১০ জন ডুবাকু ও দশজন নাবিক থাকে। তদ্ব্যতীত নৌকার অধ্যক্ষরূপে একজন কর্ণধার এবং "হাঙ্গড়-দমী" নামে মাল্যবারাস্থ এক এক জন পুরোহিত বা ওঝা থাকে।

একবারে ৫ জন করিয়া ডুবাকু অবগাহন করে, তাহারা উত্থিত হইলে, অবশিষ্ট পাঁচজন অবগাহন করে। কাপ্তান ষ্টুয়ার্ট কহেন ডুবাকুরা সাধারণতঃ প্রতি ডুবে ৫৩ হইতে ৫৭ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত জলের তলে থাকে, কিন্তু অর্থ দিলে ৮৪ হইতে ৮৭ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। অনেক পাঠক বোধ হয় ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। ভরসা করি নিম্ন লিখিত বিবরণ পাঠে বুঝিতে পারিবেন যে, ৮৭ সেকেণ্ড জলের নীচে থাকা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

প্রথমতঃ চিকিৎসকেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে সুস্থ শরীরে প্রৌঢ়াবস্থ পুরুষদিগের নাড়ী প্রতি মিনিটে ৭৫ বার পর্য্যন্ত চলে; সুতরাং ৮৭ সেকেণ্ডে ১০৯ বার নাড়ী চলে। দ্বিতীয়তঃ, ঘটিকা যন্ত্রের দোলদণ্ড প্রতি সেকেণ্ডে একবার করিয়া দোলে, এবং মনুষ্যের শ্বাসও সুস্থাবস্থায় প্রতি সেকেণ্ডে গড়ে একবার করিয়া বহে, সুতরাং ৮৭ বার শ্বাস ত্যাগ করিতে যত সময় লাগে ডুবাকুরা তত সময় জলের নীচে থাকে, একি সাধারণ ক্ষমতা! অধুনা বিজ্ঞানের উন্নতিবশতঃ ডুবাকুরা জলের নীচে ৬। ৭ ঘণ্টা থাকিতে পারে, কিন্তু সে যন্ত্রের সাহায্যে। যাহা হউক, আমরা পুনশ্চ প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

ডুবাকুদিগের কটীদেশে একটি করিয়া জালি থাকে, সংগৃহীত শুক্তিগুলি তাহার মধ্যে রাখে। শীঘ্র শীঘ্র জলের ভিতর অধিরোহণ করিবার জন্য রজ্জু দ্বারা একটি ফাঁস প্রস্তুত থাকে; এবং তাহাতে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর সংলগ্ন থাকে। নীচে নামিবার সময় ঐ ফাঁসের মধ্যে পদস্থাপন করে। আর একগাছি রজ্জুও ডুবাকুদের কটীদেশে সংলগ্ন থাকে। অনেকক্ষণ জলের নীচে থাকিয়া কষ্ট হইলে, তাহারা এই রজ্জুটি নাড়িতে থাকে; তৎক্ষণাৎ নৌকাস্থিত লোকেরা তাহাদিগকে টানিয়া তুলে। উঠিবার সময় পূর্ব্বোক্ত ফাঁস হইতে পা বাহির করিয়া লয়। ডুবাকুরা উভয় কর্ণ তুলা দ্বারা বন্ধ করে,

এবং যতক্ষণ জলের নীচে থাকে, এক হস্তে নাসিকারন্ধ্র চাপিয়া রাখে। তাহারা দিনে ৪০ হইতে ৫০ ডুব পর্য্যন্ত দেয়, এবং প্রতিডুবে প্রায় একশত শুক্তি উত্তোলন করে।

ডুবারুদের পক্ষে হাঙ্গরের ভয়ই অত্যন্ত। যে পর্য্যন্ত হাঙ্গডদমী ওঝারা মন্ত্র দ্বারা হাঙ্গডের মুখ বন্ধ না করে, তাবৎ ডুবারুরা জলে নামে না। যতদিন মুক্তা সংগ্রহব্যাপার চলিতে থাকে, ওঝারা কূলে থাকিয়া পূজা, নানাবিধ অনুষ্ঠান,ও নানা প্রকার শারীরিক কষ্ট করে। কখন কখন ওঝারা নৌকাতেও থাকে। যতক্ষণ ওঝা নৌকায় থাকে, ততক্ষণ ডুবারুরা অকুতোভয়ে অগাধ জলে যাইতেও পরাঙ্মুখ হয় না। মুক্তা সংগ্রাহক বণিকেরা ওঝাদিগকে বেতন দেন। ডুবারুরা মুক্তার কোন অংশ বা তাহার মূল্য স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করে। শুক্তিগুলিকে মৃত্তিকায় গর্ত্ত করিয়া ঢাকিয়া রাখে, এবং তাহার উপরে দড়মার বেড়া দেয়। কিছু দিন পর পচিয়া শুক্তিগুলি দ্বিধা হইয়া যায় ও মুক্তা বাহির হয়। অতঃপর মুক্তাগুলিকে প্রক্ষালিত, পরিষ্কৃত, ও সরন্ধ্র করা হয়। মুক্তা দ্বারাই এই প্রকার চূর্ণ প্রস্তুত হয়, তদ্দ্বারা মাজিয়া মুক্তা পরিষ্কার করে।

শ্বেত,মসৃণ, উজ্জ্বল মৌক্তিকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জেফ্রি নামা একজন প্রসিদ্ধ রত্নজীবী বলেন যে "দুগ্ধবৎ শ্বেত, অত্যুজ্জ্বল, অক্ষত, কলঙ্করহিত মুক্তাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" বর্ণবিশিষ্ট মুক্তা তাঁহার মতে অকর্ম্মণ্য। সম্পূর্ণ গোলাকার মুক্তাই উৎকৃষ্ট, কিন্তু ইয়ারিং প্রভৃতিতে অণ্ডাকৃতি মুক্তাই অধিক ব্যবহৃত হয়। হিন্দুরা ঈষল্লোহিত বা ঈষৎ পীত মুক্তাই অধিক মনোহর জ্ঞান করেন। জেফ্রি এইরূপে মুক্তার মূল্য নিরূপণ করেন;—প্রায় চারিরত্তি পরিমিত মুক্তার মূল্য চারি টাকা; ৮ রত্তি পরিমাণ হইলে ১৬ টাকা; ১২ রত্তি পরিমাণ হইলে ৩৬ টাকা। অর্থাৎ ৪ রত্তিতে এক 'কেরাট' হয়, সুতরাং যত 'কেরাট' হইবে তাহার বর্গ লও, এবং সেই বর্গফল দ্বারা এক কেরাটের মূল্য ৪ টাকাকে গুণ কর। কিন্তু প্রাচীন কালীন অনেক মুক্তার কথা শুনা যায়, যাহার মূল্য এই নিয়মে নিরূপিত হয় নাই। এমন কি, এখনও কোন মুক্তা অতি উৎকৃষ্ট বা সুন্দর হইলে, তাহার মূল্য পরিমাণানুসারে হয় না।

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের মতে কেবল শুক্তিই মুক্তার উৎপত্তি স্থান নহে। ভাব প্রকাশে যথাঃ—

"শঙ্খোগজশ্চ ক্রোড়শ্চ ফণিমৎস্যশ্চ দর্দ্দুরঃ।
বেণুরেতে সমাখ্যাতাস্তজ্জ্ঞৈ মৌক্তিক যোনয়ঃ॥"

অর্থাৎ শঙ্খ, হস্তি, শূকর, ভুজঙ্গ, মৎস্য, কচ্ছপ, বংশ প্রভৃতিতেও মুক্তা জন্মায়। রাজ নির্ঘণ্টে জাতিভেদে অষ্টধা মুক্তার উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

"মাতঙ্গোরোগমীনপোত্রিশিরসস্তুকসার-
শঙ্খাম্বুভৃৎ
শুক্তীনামুদরাচ্চ মৌক্তিক মনিঃ স্পষ্টো
ভবত্যষ্টধা॥"

মুক্তার লক্ষণ সম্বন্ধে রাজ নির্ঘণ্ট বলেন—
"নক্ষত্রাভং শুদ্ধমত্যন্ত মুক্তং স্নিগ্ধং স্থূলং
নির্ম্মলং নির্ব্রণঞ্চ।
ন্যস্তংধত্তে গৌরবং যত্তুলায়াং তন্নি-
র্ম্মাল্যং মৌক্তিকং সৌখ্যদায়ি।"

যে মুক্তা নক্ষত্রের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল, অত্যন্ত বিশুদ্ধ, স্নিগ্ধ, স্থূল, নির্ম্মল ও ব্রণ-রহিত, এবং তুলাতে স্থাপন করিলে যাহার গুরুত্ব অনুভূত হয়, সেই নির্ম্মল মৌক্তিকই সুখদায়ি অর্থাৎ প্রশস্ত।

রাজ নির্ঘণ্টকার পুনশ্চ মুক্তার বিশেষ লক্ষণ কহিয়াছেন। যথা—

"ছায়াপাটলনীলপীতধবলাস্তত্রাপি
সামান্যতঃ।
সপ্তানাং বহুশো ন লব্ধি
রিতি চেচ্ছৌক্তেয়কং তুল্যনং॥"

যদিচ অপর সপ্তবিধ মুক্তা শৌক্তিকেয় অর্থাৎ শুক্তি-গর্ভজাত মুক্তার তুল্য বহু-ছায়াবিশিষ্ট না হউক, তথাপি পাটল, নীল, পীত, ধবল এই কএক প্রকার ছায়া তৎসমুদায়ে সাধারণতঃ আছে।

ভোজ রাজতন্ত্র নামে একখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থে ছায়া দ্বারা নানাবিধ মুক্তার পরীক্ষা করিবার বিবরণ লিখিত আছে। আমরা এস্থলে বহু অন্বেষণ করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হইলাম না। দুঃখের কথা বলিব কি আমরা একখানি হস্তলিখিত রাজনির্ঘণ্টে মুক্তাসম্বন্ধে আরও যে সকল প্রমাণ পাইলাম, তাহা লিপিকরের প্রমাদ-বশতঃ এত অশুদ্ধ হইয়াছে, যে তাহার কোনও অর্থসংগ্রহ হয় না। অধিক কি, আমরা যে কএকটি বচন উদ্ধৃত করিলাম তাহারও স্থানে স্থানে অনেক ভ্রম রহিল।

এতদ্দেশীয় ভিষকদিগের মতে মুক্তার নানাগুণ, এবং উহা তাঁহারা নানাবিধ ঔষধেও ব্যবহার করেন। কিন্তু ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা একথা গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা বলেন যে, সামান্য চুণ এবং মুক্তাভস্মে কোনও প্রভেদ নাই। বস্তুতঃ আমরা স্থলান্তরে মুক্তার যে রাসায়নিক গুণের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এতদুভয়কে একই পদার্থ বলিলিয়া বিশ্বাস হয়। যাহা হউক বৈদ্যক শাস্ত্রমতে মুক্তার গুণ এই।

"সারকত্বং, শীতত্বং, কষায়ত্বং, স্বাদুত্বং, লেখনত্বং, চক্ষুষ্যত্বঞ্চ।" ইতি রাজবল্লভঃ।

অর্থাৎ মুক্তায় সারকত্ব, শৈত্য, কষায়ত্ব ও মুখপ্রিয়ত্ব গুণ আছে। ইহা দ্বারা লেখন অর্থাৎ ক্ষার দ্বারা যে দাগ করিয়া দেওয়া যায়, সেই গুণ এবং চক্ষুরোগের উপশমত্ব গুণও আছে।

"বৃষ্যত্বং বলপুষ্টিদত্বঞ্চ" ইতিভাবপ্রকাশঃ।

ইহাতে পুং শক্তির বৃদ্ধি, বল ও পুষ্টি প্রদান করে।

"মৌক্তিকঞ্চ মধুরং সুশীতলং দৃষ্টিরোগ-
শমনং বিষাপহং।

রাজযক্ষ্মপরিকোপনাশনং ক্ষীণবীর্য্যবল-পুষ্টিবর্দ্ধনং ॥,, ইতি রাজনির্ঘণ্ট—

ইহা মধুর, সুশীতল, দৃষ্টিরোগ ও যক্ষ্মারনাশক, এবং ক্ষীণবীর্য্যদিগের বল-পুষ্টিবর্দ্ধক।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অপর কএকটি পদার্থের সহিত মুক্তার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণ ও তুলনা করিয়াছেন। প্রতিঘন ফুটে যত গুরুত্ব তাহা ঔন্সে দেওয়া যাইতেছে। এক ঔন্স অর্দ্ধ ছটাক।

চীনাবাসন	২৩৮৫	অর্থাৎ	৭৪.১	সের
চকমকি প্রস্তর	২৫৯৪	"	৮১.	"
স্ফটিক	২৬৪০	"	৮২.৩	"
প্রবাল	২৬৮০	"	৮৩.৭	"
মুক্তা	২৬৮৪	"	৮৩.৯	"
হীরক	৩৫৩৬	"	১১০.৫	"
গোমেদক	৩৮০০	"	১১৮.৬	"
নীলকান্তমণি	৩৯৯৪	"	১২৪.৮	"
পদ্মরাগমণি	৪২৮৩	"	১৩৩.৮	"
অয়স্কান্তমণি	৪৯৩০	"	১৫৪.	"

যে দশটি পদার্থের তুলনা করা গেল, তন্মধ্যে মুক্তা পাঁচটি অপেক্ষা ভারী, এবং অবশিষ্ট পাঁচটি অপেক্ষা লঘু। মুক্তা লৌহ অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ লঘু, কিন্তু জল অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ ভারী; অঙ্গারক চূর্ণের স্থায়িত্ব হেতু মুক্তা এত দৃঢ়; অম্ল পদার্থ (এসিড্) মধ্যে মুক্তা নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ দ্রব হইয়া যায়! অর্থাৎ এসিডের সহিত সোডা, মিলিত হইলে যেরূপ বুদ্বুদ উত্পন্ন হইয়া থাকে, মুক্তা দ্রবীকরণ কালেও ঠিক তদ্রূপ হয়। ফলতঃ সোডা যে পদার্থ, মুক্তার রাসায়নিক উপকরণও তাহাই। দ্রব হইয়া গেলে অতি সূক্ষ্ম একটি ত্বক্ মাত্রাবশিষ্ট থাকে। সময়ে সময়ে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিতে অনেকে প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু জেকুইন নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এবিষয়ে যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তত আর কেহই নহে। বাজারে গ্লাসের যে মুক্তা বিক্রয় হয়, উহাই জেকুইনের আবিষ্কৃত। সংপ্রতি কতিপয় প্রসিদ্ধ মুক্তার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিয়া আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

প্রাচীন পুরাবৃত্তে দেখাযায়, একদা মার্কস্ এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা কোন ভোজে বাজি রাখেন। তাহাতে রূপ ও ধনে গর্ব্বিতা রাণী স্বীয় কর্ণভূষা হইতে দুইটি বহুমূল্য মুক্তা লইয়া একটি সের্কায় দ্রব করিয়া পান করেন; অপরটি এণ্টনি কাড়িয়া লইয়া রক্ষা করেন এবং তাহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভিনস্‌দেবীর কর্ণভূষায় প্রদত্ত হয়। উহার মূল্য সম্বন্ধে নানা মত আছে। কেহ বলেন ৮০৭২৯১৫০ টাকা *, কাহারও মতে ৭৬০০০০ টাকা † এবং কাহারও মতে ৮৪০০০০ টাকা। ‡

জুলিয়স সিজর ব্রুটাসের জননী সার্ভিলিয়াকে উপহার স্বরূপ যে একটি মুক্তা

* পেটার্সনকৃত প্রাণিতত্ত্ব। † এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা ১৭ ব। ‡ মণ্ডার্সকৃত অভিধান।

দিয়াছিলেন, তাহার মূল্য কাহার মতে ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ মুদ্রা, * কাহার মতে ৪৮৪১৭৫ মুদ্রা। †

এ, জে, বি, হোপ নামা পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য বিশেষের নিকট একটি মুক্তা ছিল, অত বড় মুক্তার কথা এখন আর বড় শুনা যায় না। উহার ওজন ১৮৫০ আনা, বেড় ৪৷৷ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্য ২ ইঞ্চি। মূল্য প্রায় ১৯০০০০ টাকা। ‡

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে টেবার্নিয়ার নামে একজন পরিব্রাজক পারস্যাধিপতির নিকট একটি মুক্তা দেখেন, ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ ইঞ্চ, বেড় প্রায় ৩৷৷ ইঞ্চ এবং মূল্য ১১০০০০০ একাদশ লক্ষ মুদ্রা। ¶ ইহার আকৃতি অণ্ডাকার, অক্ষত ও অব্রণ। আরব্য দেশস্থ কেটিকা নামক স্থানে ইহা ক্রীত হয়। কেহ অনুমান করেন যে, পারস্যের পূর্ব্বতন সুলতান ফতেআলি সার এই মুক্তাটি ছিল।

* পেনিসাইক্লোপিডিয়া † পেটার্সনকৃত প্রাণিতত্ত্ব।

‡ ব্রেণ্ডিসের বৈজ্ঞানিক অভিধানের বিবরণও প্রায় এইরূপ।

¶ মণ্ডার্স অভিধানমতে এইরূপ এবং বিটনের সার্ব্বভৌমিক অভিধানের মতও এই; কেবল বিটনের মতে দৈর্ঘ্য ২ ইঞ্চি। পেনিসাইক্লোপিডিয়ার মতে মূল্য ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার। হেডেনের সময়নির্ণায়ক অভিধানমতে মূল্য ১ কোটি ১০ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রীটেনিকার মতে ১ লক্ষ।

হংসডিম্বাকার একটি পানামা উপকূলজাত সুন্দর মুক্তা স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপকে ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হয়। উহার আয়তনও একটি কপোতাণ্ডের ন্যায় হইবে। উহার মূল্য পেনি সাইক্লোপিডিয়ার মতে চল্লিশ সহস্র; কিন্তু হেডেনের অভিধানানুসারে ১৩৯৯৬০ মুদ্রা। †

ডি বুটী নামা পণ্ডিত কহেন যে সম্রাট্ দ্বিতীয় রডল্‌ফের মুকুটে হংসাণ্ডবৎ ৩০ কেরাট অর্থাৎ ১৷ ভরি ওজনের একটি মুক্তা ছিল। ইহার মূল্যের নিরূপণ কেহ করেন নাই। সাধারণ নিয়মানুসারে গণনা করিলে ৩৬০০ টাকা হইবে। ইহার নাম "অতুলন।"

ভিনিসের গবর্ণমেণ্ট রুমের বাদসা সোলেমানকে যে মুক্তাটি উপহার দেয়, তাহার মূল্য ১৬০০০০ একলক্ষ ষাট হাজার টাকা।

দশম লিও নামে রোমান কাথলিকদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ (পোপ) কোন ভিনিসিয়ান মণিকারের নিকট এক লক্ষ চারি সহস্র মুদ্রায় একটি মুক্তা ক্রয় করেন।

স্পেনের রাজধানী মেড্রিডনগরবাসিনী একটি মহিলা ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন দেশ হইতে একটি মুক্তা ক্রয় করিয়া আনেন, তাহার মূল্য তিনলক্ষ তের শত মুদ্রা।

† পেনিসাইক্লোপিডিয়ার সন ১৫৭৯।

রুসিয়ার মস্কোনগরের জোসিমা চিত্রশালিকায় পেলিগ্রিনা নামে দুগ্ধনিভ শুভ্র, সম্পূর্ণ গোল, সমুজ্জ্বল একটি মুক্তা আছে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কোন জাহাজের নিকট লেঘহরণ নগরে জোসিম নামা একব্যক্তি উহা ক্রয় করে। উহার ওজন প্রায় ১৯ রতি পরিমাণ, এবং সামান্য হিসাবে মূল্য ১৩৩৬ মুদ্রা। উহা মস্কোনগরস্থ আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে অতি বিখ্যাত।

কতিপয় বর্ষ গত হইল মান্দ্রাজ নগরের কোন প্রদর্শনে একটি অদ্ভুত জড়াও বস্তু প্রদর্শিত হয়। উহা একটি অর্দ্ধমৎস্য-নারীরূপ, মস্তক ও বাহু শ্বেত চুনি প্রস্তরের, হস্ত দ্বারা কেশ বিন্যাস করিতেছে, বক্ষ একটি দীর্ঘাকার জাপান-মুক্তা, উহাও দুগ্ধবৎ শুভ্র ও অতি সুন্দর। মৎস্যার্দ্ধভাগ হরিদ্বর্ণের চুনি প্রস্তরে নির্মিত। এই মুক্তাটিকে অনেকে বহুমূল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। শ্রীগু—

কবি কাঞ্চনাচার্য্য।

এই রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির অনন্ত গর্ভে কত রত্ন অপূর্ব্ব প্রভায় প্রতিভাত হইয়াছে এবং তদনন্তর কালের করাল গ্রাসে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা কাল-গ্রাসে অস্পৃষ্ট রহিয়া অদ্যাপি অতিক্ষীণ আলোকে মনুষ্যের লোচনগোচর হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? দুর্ব্বৃত্ত অনার্য্যজাতির ক্রূরহস্তেই বা কত মহাত্মার যশঃশরীর ভস্মীকৃত হইয়াছে, কে তাহা বলিতে পারে? দুরদৃষ্ট যে কত প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভারতের সর্ব্বাঙ্গে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত মহাত্মার নামমাত্র, কত রসার্দ্রচিত্ত ভাবুকের গ্রন্থের নামমাত্র আমাদের শোকের হেতুভূত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। কোনও গ্রন্থকারের একখানি ক্ষুদ্রতম গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হইলেও আমাদিগের অন্তঃকরণ এই সন্দেহে আকুল হইয়া উঠে, যে ইহাঁর অবশ্য অন্য গ্রন্থ ছিল—এ রসসাগরের অবশ্য অপর প্রবাহ ছিল। বাস্তবিক, সংস্কৃত সাহিত্যসাগরে অবগাহন করিলে ভগ্নপ্রাসাদশ্রেণীদর্শনে তত্ত্বানুসন্ধায়ীর ন্যায়, একরূপ অপূর্ব্ব ব্যাকুলতা আসিয়া হৃদয়ে উপস্থিত হয়। যাহাহউক, সে কথা সময়ান্তরে আলোচ্য। অদ্য যে বিষয় আমাদিগের বিবক্ষিত, তাহার অবতারণা করা যাইতেছে।

এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে যাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি একজন রসার্দ্রচিত্ত সুকবি। ধনঞ্জয় বিজয় নামক অতিক্ষুদ্র একখানি গ্রন্থ তাঁহার কবিত্বের নিদর্শন-স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। এখানি ব্যায়োগ। রূপকের যে দশ প্রকার ভেদ ক-

ল্পিত হইয়াছে, ব্যায়োগ তাহার অন্যতম। অলঙ্কারগ্রন্থে ব্যায়োগের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহা সেই সমস্ত লক্ষণে সংযুক্ত। উত্তরকালরচিত বলিয়াই হউক, বা প্রয়োজনাভাববশতই হউক, সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে ইহার নাম,বা ইহার শ্লোক উল্লিখিত অথবা উদ্ধৃত হয় নাই। দুঃখের বিষয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বরচিত "সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব" নামক যে গ্রন্থে সংস্কৃত কবিমণ্ডলীর গ্রন্থের পরিচয় ও সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ধনঞ্জয়-বিজয়কার কাঞ্চনাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করেন নাই। গ্রন্থের ক্ষুদ্রাঙ্গতা যে তাঁহার উল্লেখ না করিবার কারণ, এরূপ আমরা মনে করিনা। মহামণি ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও তাহা শিরোধার্য্য। অন্যথা অমরু, ময়ূর ভট্টাদির এত সম্মান কেন? যদিও কাঞ্চনাচার্য্য ময়ূরভট্টাদির সম্পূর্ণ তুল্যকক্ষ নহেন, তথাপি সুকবিশ্রেণীতে অবশ্য পরিগণনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা স্বমতসমর্থনার্থ তাঁহার গ্রন্থের বিষয় সঙ্ক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

গ্রন্থের প্রারম্ভে যে নান্দীশ্লোকদ্বয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অতি উদাত্তভাবপূর্ণ। প্রথম শ্লোকটি বিষ্ণুবিষয়ক। যথা;—

হরের্লীলাবরাহস্য দংষ্ট্রাদণ্ডঃ স পাতুবঃ।
হেমাদ্রিকলসা যত্র ধাত্রীচ্ছত্রশ্রিয়ং দধৌ।

প্রলয়কালে নিখিল জগৎ জলপ্লাবিত হইলে ভগবান্ নারায়ণ বিশাল বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দশনদ্বারা ধরণীমণ্ডলকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই সময়কে অধিকার করিয়া কবি মঙ্গলাচরণ করিতেছেন,—লীলাচ্ছলে বরাহমূর্ত্তিধারী ভগবান্ বিষ্ণুর সেই বিশাল দশন তোমাদিগকে রক্ষা করুন, যে দশনের উপরি পৃথিবী ছত্রের শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং যে দশন সেই পৃথিবীরূপ ছত্রের দণ্ড স্বরূপ হইয়াছিল এবং স্বর্ণময় সুমেরু যে উর্দ্ধকৃত পৃথিবীরূপ ছত্রের কলসস্বরূপ (ছত্রের শিরঃস্থিত বস্তুবিশেষ) হইয়াছিল। পাঠকগণ দেখুন, সংক্ষিপ্তবাক্যে কতদূর অলৌকিক ভাবের পরিব্যক্তি হইয়াছে।

নান্দীর দ্বিতীয় শ্লোকটি কালীবিষয়ক। যথা;—

তদ্বঃ প্রমাষ্টু বিপদঃ প্রণতার্ত্তিহন্ত্র্যা
ন্যস্তং পদং মহিষমূর্দ্ধনি চণ্ডিকায়াঃ।
বৈরী যদীয়নখরাংশু-পরীতশৃঙ্গঃ
শক্রায়ুধাঙ্কিতনবাম্বুধরপ্রভোঽভূৎ॥

ভগবতীর মহিষাসুরের সহিত সমর সময় অবলম্বন করিয়া কবি কহিতেছেন,—দেবী চণ্ডিকার প্রণতজনের পীড়াহর সেই চরণ তোমাদিগের বিপত্তিনাশ করুন, যে চরণ মহিষরূপী অসুরের মস্তকে স্থাপিত হইলে সেই চরণের অরুণনখশ্রেণীর প্রভায় মহিষের কুটিল শৃঙ্গদ্বয় সুরঞ্জিত হওয়ায় ঘোরকৃষ্ণবর্ণ মহিষাসুর ইন্দ্রধনুঃশোভিত নবমেঘের শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই শ্লোকে কি অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্যভাব উদ্ভাবিত হইয়াছে!

বিরাট নৃপতির উত্তর গোগৃহ হইতে যে অসংখ্য গো রাজা দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক হৃত হয়, তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সেই সকল গোর প্রত্যানয়ন এ গ্রন্থের বর্ণনীয়। শরৎকাল যুদ্ধাদির অনুকূল বলিয়া গ্রন্থের প্রারম্ভেই শরৎ সূচনা করা হইয়াছে। অনন্তর নায়ক ধনঞ্জয়ের যুদ্ধযাত্রা। যাত্রাকালে নায়কের হৃদয়ভাব দেখুন,—

অর্জ্জুনঃ। (সোৎসাহং) অনুকূলং দৈবং-লক্ষ্যতে যতঃ,

যাংলতান্বিষ্যতে সৈব লগ্না সম্প্রতি পাদয়োঃ।
কুরুরাজোভিযাতব্যঃ স্বয়মেব সমাগতঃ॥

অর্জ্জুন উৎসাহের সহিত বলিতেছেন, দৈব অনুকূল বলিয়া বোধ হইতেছে। যে লতাকে অন্বেষণ করিতেছি, সেই লতা পদদ্বয়ে আসিয়া সংলগ্ন হইল। যে কুরুরাজের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রার্থে উৎসুক ছিলাম, তিনি স্বয়ংই উপস্থিত।

যুদ্ধে প্রবল দায়াদরূপ শত্রু পরাজয়ে যশঃসুখলাভউৎসাহে উৎসাহিত হইলেও তাহাদিগের গোহরণরূপ দুষ্কার্য্য স্মরণ করিয়া নির্ব্বিন্নচিত্তে কহিলেন,— "রে সুযোধন! পূর্ব্বপুরুষ গণ বিপুলভুজবলে যে রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তুই কপটপাশক্রীড়াচ্ছলে সেই রাজ্য হস্তগত করিয়া অদ্য গোহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। হাধিক্! আমাদিগের কুলগুরু ভগবান্ চন্দ্রমা তোর দ্বারা লজ্জাপ্রাপ্ত হইলেন।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই যুদ্ধোপকরণাদিসহ বিরাটকুমার আগমন করিলেন। অর্জ্জুন রথারূঢ় হইলেন ও বিরাটকুমার সারথি হইয়া বেগে রথচালনা করিতে লাগিলেন। কএকটি শ্লোকে সারথিমুখে অশ্ব ও রথের গতি অতিসুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। অবিলম্বেই গোপালক সকল দৃষ্টিগোচর হইল। অর্জ্জুন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

রে রে গোপালা অলংবিষাদেন। তথাহি,

সিঞ্চন্তঃ করুণারসেন হৃদয়ং যাবন্ন বৎসা অমী
মাতুর্মার্গবিলোকনব্যসনিনো মুঞ্চন্তি হম্বারবান্।
যাচন্তে নহি যাবদেব শিশবঃ পাতুং পয়ঃ সোৎসুকা-
স্তাবদ্গাব ইহৈতাবেত ভবতাং চেতোজ্বরঃ শাম্যতু॥

"রে রে গোপসকল। তোমরা বিষাদ দূর কর। এই যে গোবৎস সকল মাতার পথের প্রতি সোৎকণ্ঠ দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক করুণরসে হৃদয় আর্দ্র করিতেছে, ইহারা যাবৎ হম্বারব না করে, আর শিশুগণ উৎসুক হইয়া যাবৎ দুগ্ধপানের জন্য প্রার্থনা না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত গো সকল ঐস্থানে আছে বলিয়া জানিও। তোমাদিগের মনের উদ্বেগশান্তি হউক।"

অনন্তর অনতিদূরে কুরুসৈন্যরাশি সন্নিবেশিত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইল। অবিলম্বে দৃষ্ট হইল অশ্বসমূহের খুরাভিঘাতে উত্থিত ধূলিরাশি 'শ্রীকণ্ঠকচি' ধারণ পূর্ব্বক নভস্তল আচ্ছন্ন ক

রিতেছে, 'ভর-পূর্য্যমাণ' গভীর শঙ্খ-নাদে দিগন্ত প্রতিনাদিত হইতেছে, ঊর্দ্ধে পক্ষিকুল ভয়ে দ্রুত উড্ডয়মান, নিম্নে আরণ্য পশুগণ তাদৃশ সম্ভ্রমচকিত। ক্রমে রথ সৈন্যশ্রেণীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। বিপক্ষবীরগণ অর্জ্জুনকে একাকী উত্তরের সহ প্রতিবলে অবগাহন করিতে দেখিয়া নানাবিতর্ক করিতে লাগিল। এই সময়ে কুরুরাজ সেনানীদিগকে সজ্জিত করিতেছিলেন। পার্থ রাজপুত্র উত্তরকে তাহা দেখাইলেন। উত্তর কহিলেন, দেব, বিপক্ষযোদ্ধৃবর্গের বলবীর্য্য ও স্বরূপ অবগত হওয়া সারথির একান্ত কর্ত্তব্য। পার্থ কহিলেন, ঐ দেখ, রোষকষায়িতলোচন হিড়িম্বঘাতীর সম্মুখেও যে সাহসী বিষধরের অঙ্গ হইতে নির্ম্মোকের ন্যায় দ্রৌপদীর হৃদয়-স্থল হইতে লজ্জাদুকূলাঞ্চল আকর্ষণ করিয়াছিল, সে ঐ দুঃশাসন, কুরুরাজের দক্ষিণভাগে। (১) কুমার কহিলেন, সাহসের পরাকাষ্ঠা বটে! পার্থ কহিলেন, এদিকে দেখ (২) অন্য অঙ্গনাসংসর্গ চিরপরিহার করিয়াছেন বলিয়া প্রণয়বশে ধবলবেশা কীর্ত্তিদেবী পলিতচ্ছলে যাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, যিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে সুবিশ্রুত জামদগ্ন্যের বিজেতা, তিনি ঐ দেবব্রত ভীষ্মদেব, বিপুলযশাঃ আমাদিগের পিতামহ। এই সময়ে বৈমানিকগণ যুদ্ধদর্শনলালসায় নভোমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিলেন, এক দিকে অগণ্য যুদ্ধদুর্ম্মদ কর্ণাদি বীরগণ, অপরদিকে অসহায় রথী পার্থ সমরে প্রবেশ করিয়াছে। দেখিয়া বুঝিলেন, বিপুলতেজোময় সত্ত্ব অপায়ের প্রতি দৃক্‌পাত করে না। এদিকে কুমার উত্তর অগ্রে অবলোকন করিয়া কহিলেন, দেব! কুরুরাজই আসিতেছেন। পার্থ কহিলেন, তবে আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইল। অবিলম্বে রাজা দুর্য্যোধন রথারোহণে পুরোবর্ত্তী হইয়া পার্থের অভিমুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, (৩) অহে সাহসিক! বনবাসের ক্লেশরাশিতে কি জীবনে এমন নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, যে তুমি একাকী এই অসংখ্য যোদ্ধার সহ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ধ-

(১) রোষোৎকর্ষকষায়িতোজ্জ্বলদৃশো প্যগ্রে হিড়িম্বদ্বিষঃ
পাঞ্চালীহৃদয়স্থলাৎ সরভসং লজ্জাদুকূলাঞ্চলঃ।
নির্ম্মোকঃ ফণিনস্তনোরিব বলাৎ যেনাবকৃষ্টঃ পুরা
সোহয়ং সাহসিকাগ্রণীস্তুকুরুবরো দুঃশাসনস্তিষ্ঠতি॥

(২) অন্যাঙ্গনাপরিহৃতিপ্রণয়েন কীর্ত্ত্যা-
বালিঙ্গিতো ধবলয়া পলিতচ্ছলেন।
দ্বন্দ্বাহবপ্রকটনির্জ্জিতজামদগ্ন্যো-
দেবব্রতঃ পৃথুযশাঃ স পিতামহোনঃ॥

(৩) বনবাসপরিক্লেশাৎকিং নির্ব্বিন্নোসি জীবনে
যদভীবেব এব ত্বমনেকৈর্যোদ্ধুমুদ্যতঃ॥

নঞ্জয় সোপহাসে (৪) কহিলেন, পার্থ একাকী কালকেয়ের সহ নিবাতকবচগণকে ভস্মীভূত করিয়াছিল ;, একাকীই বাসুদেবের ভগ্নীকে হরণ করিয়া ছিল, আর সেই একব্যক্তিই খাণ্ডববন অনলে দগ্ধ করিয়াছিল। পার্থের সমরে এ পন্থা নূতন নহে। দুর্য্যোধন কহিলেন, উপহাসে প্রয়োজন কি, পবীক্ষাস্থল সংগ্রামই উপস্থিত হইয়াছে। পার্থ সহাস্যে কহিলেন, কুরুনাথ। এস্থান হইতে অপসরণ কর ; সে অন্যবিধ দ্যূতক্রীড়া, যাহাতে দ্রুপদরাজপুত্রীকে দাসী করিয়াছিলে ; এখানে শরশলাকাপাতপূর্ব্বক প্রতি নৃপতির শররূপ অক্ষে ক্ষত্রিয়দিগের দ্যূতক্রীড়া হইয়া থাকে। দুর্য্যোধন সরোষে বলিলেন, যাহার হস্ত সুচিরকালকার্ম্মুকাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া হস্তিদন্তনির্ম্মিত বলয়ে ভূষিত হইয়া আসিতেছে, তাহার অভ্যস্ত নৃত্যশালায় প্রবেশই উচিত, এস্থানে নহে ; এ সংগ্রামস্থান, প্রবীর পুরুষের উপযুক্ত। বিরাটপুত্র সকটাক্ষে উত্তর করিলেন, (৫) আর্য্য ! আপনি ইহাকে যে চিরপরিত্যক্ত কার্ম্মুকাভ্যাস বলিতেছেন, তাহা যুক্তই বটে। যেহেতু ইন্দ্রপ্রেরিত গন্ধর্ব্বগণ যখন আপনাদিগকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, তখন কৃপাপরবশ নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশক্রমে আপনাদিগের মোচনার্থ ইনি যে শরপঞ্জর রচনা করিয়াছিলেন, অতি বিহ্বলতা প্রযুক্ত আপনি তাহা দেখিতে পান

---

(৪) একোনিবাতকবচান্ সহ কালকেয়ৈর্ভস্মীচকার ভগিনীমহরচ্চ শৌরেঃ। একেন খাণ্ডববনং জুহুবেঽনলে চ পার্থস্য নাভিনব এষ রণেষু পন্থাঃ ॥

দুর্য্যো। অলমেতৈরুপহাসৈঃ উপস্থিতো নিকষোপলোপমঃ সংগ্রামঃ।

নায়কঃ। (সহাসম্।)

অপসর কুরুনাথ দ্যূতমস্মাদৃশং তৎ দ্রুপদনৃপতিপুত্রী যত্র দাসীকৃতাসীৎ। ইহ হি শরশলাকাপাতপূর্ব্বং সগর্ব্বং প্রতিনৃপতিশরাক্ষৈঃ ক্ষত্রিয়দ্যূতকেলিঃ ॥

দুর্য্যো। (সামর্ষং)।

করিরদনবলয়ভূষিতকরশ্চিরত্যক্তকার্ম্মুকাভ্যাসঃ।

নর্ত্তনশালাং প্রবিশ প্রবীরপুরুষোচিতোহি সংগ্রামঃ ॥

(৫) কুমারঃ। (সোপহাসম্) আর্য্যেণ চিরপরিত্যক্তকার্ম্মুকাভ্যাস ইত্যভিধৎসে তদ্‌যুক্তং।

সংক্রন্দনপ্রহিতখেচরবর্গবদ্ধ-
যুষ্মৎকৃপাকুলনিজাগ্রজশাসনেন।
ভীমানুজেন বিহিতা শরপঞ্জরশ্রী-
র্নালোকিতাপি ভবতা নৃপ বিহ্বলেন ॥

দুর্য্যো। সূত অলং বিপ্রজনোচিতবাক্‌কলহেন। বিষমেয়ং ভূমিঃ। রথসঞ্চারোচিতাং ভুবমবতরাম। ইতি নিক্রান্তৌ।

বিদ্যাধরঃ। নাভ্রকরথং নির্দ্দিশ্য। দেব !

জম্ভন্দনস্যন্দনবাজিরাজি-
খুরক্ষতক্ষুণ্ণরজঃপতাকঃ।
বিপক্ষবক্ষোহরণিমন্থনোত্থ
প্রতাপবহ্নেরিব ধূমলেখাঃ ॥

নাই। দুর্য্যোধন কহিলেন, সূত! ব্রাহ্মণের ন্যায় বাক্‌কলহে প্রয়োজন কি? এভূমি অতি বন্ধুর, রথসঞ্চারোপযুক্ত ভূমিতে অবতরণ কর। অনন্তর উভয়ে রণভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। অশ্বসমূহের খুরাহত ধূলিরাশি উত্থিত হইতে লাগিল। আকাশে বিদ্যাধর অর্জ্জুনের রথের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, দেব দেখুন আপনার আত্মজের রথযোজিত অশ্বসমূহের খুরোদ্ধত ধূলিরাশি বিপক্ষদিগের বক্ষঃস্থলরূপ অরবিন্দদগুজাত প্রতাপবহ্নির ধূমরাশি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এদিকে যুদ্ধঘোষণা হওয়ায় অশ্বের হ্রেষারবে হস্তীর বৃংহিতে, বিপুল জ্যাঘাতশব্দে যুদ্ধবাদ্যরাবে ও মদহস্তিনিবহের স্কন্ধলগ্নি ঘণ্টানিনাদে যুদ্ধস্থলে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। অর্জ্জুন অদ্ভুত শিক্ষাবলে অতি লঘুহস্তে বাণবর্ষণে নিমেষমধ্যে কাহাকে খণ্ডিতগণ্ড, কাহাকে ভগ্নকোদণ্ড, কাহাকে শীর্ষকহীন, কাহাকে নির্ভিন্নচক্ষুঃ, কাহাকে ভগ্নভুজ, কাহাকে ক্ষতবক্ষঃস্থল করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রের পার্শ্বচর বিদ্যাধর পার্থের ক্ষিপ্রহস্ততায় নিমেষমধ্যে সংগ্রাম-ক্ষেত্রের অপূর্ব্বদশা দেখিয়া সবিস্ময়ে সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রকে কহিলেন, দেব দেখুন দেখুন, (৬) সৈন্যরাশিতে এই রণভূমি ভাদ্রমাস দুর্দ্দিনের আকার ধারণ করিয়াছে। তথাহি, মদস্রাবী মাতঙ্গযূথ বর্ষুক মেঘজালের ন্যায় আচরণ করিতেছে, এই বিচিত্র কার্ম্মুকগুলি ইন্দ্রধনুঃ বলিয়া বোধ হইতেছে, শ্বেতচ্ছত্র সকল শিলীন্ধ্র পুষ্পের শোভা ধারণ করিয়াছে, আর অস্ত্রসংঘট্টনে সমুদ্ভূত বিক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ খদ্যোত পুঞ্জের ন্যায় আচরণ করিতেছে, এবং জ্বলন্ত-নারাচ সকল অশনির ন্যায় বোধ হইতেছে।

অতঃপর যে ভয়ঙ্কর ও মনোহর যুদ্ধব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে আমরা তাহার প্রদর্শনে বিরত হইলাম। কারণ, সংক্ষেপে পরিচয়-প্রদানই আমাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু নিতান্ত অন্যায় হয় বিবেচনা করিয়া ২টীমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমরা কবির বর্ণনাশক্তির পরিচয় দিব।

প্রাচীনকালে যেরূপ অলৌকিকভাবে যুদ্ধদৃশ্য বর্ণিত হইত, এ কবিও সে প্রণালী পরিত্যাগ করেন নাই। ক্রমে বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি বৈনায়কঅস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন বিমানচারিগণ দেখিলেন,—

সিন্দূরারুণমৌলিভিঃ স্বদশনপ্রোতাম্বুদ শ্রেণিভি

র্নীলোদগ্রকরাগ্রমাক্তভর-প্রোদ্ধূততারাগণৈঃ।

(৬) বিদ্যাধরঃ। দেব পশ্য পশ্য
মুঞ্চদ্ভির্মদবারি বারণগণৈর্মেঘায়িতং কার্ম্মুকৈ
রৈন্দ্রৈঃ শক্রশরাসনায়িতমধঃচ্ছত্রৈঃ শিলীন্ধ্রায়িতং।
খদ্যোতায়িতমস্ত্রঘট্টনসমুদ্ভূতস্ফুলিঙ্গৈঃস্ফুরন্নারাচৈরশনায়িতং রণভুবা সৈন্যৈর্নভস্যায়িতম্‌॥ ৩

পাদাঘাতচলৎকুলক্ষিতিধরৈঃ সঙ্কীর্ণমালক্ষ্যতে
হেরম্বাস্ত্রবিনিঃসৃতৈর্দ্দ্বিপমুখৈঃ শুণ্ডৈরমৈরস্বরম্ ॥

পার্থ অবিলম্বে সিংহাস্ত্রপ্রয়োগে তাহার নিবারণ করিলেন ;—

দংষ্ট্রাজ্যোতিঃ-খচিতগগনৈঃ কেশবাটোপভীমৈ-
কল্লাঙ্গুলৈঃ ক্ষিতিধরগুহাসঙ্করঙ্কারনাদৈঃ ।
সিংহৈরস্ত্রনখরশিখরোৎখাতকুম্ভস্থলাসৃগ্
ধারাস্বাদব্যসনবিবশৈঃকাপিনীতাগজেন্দ্রাঃ॥
ইত্যাদি ।

বিদ্যাধর কহিলেন, দেব! জয়ের আর অপেক্ষা নাই। ভীষ্মের অশ্বসকল হত, দ্রোণাচার্য্যের সারথি নিহত, কর্ণের রথ চূর্ণীকৃত, দ্রোণপুত্রের ধনুর্লতা ছিন্ন হইয়াছে, কৃপাচার্য্য বিচেতন হইয়াছেন ও কুরুনাথ ভয়দ্রুত নিজ সৈন্যগণের সহ পলায়ন করিতেছেন এবং অর্জ্জুন তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছেন। প্রতীহারী নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, দেখুন দেখুন, দুর্য্যোধনের অত্যাহিত উপস্থিত। বিদ্যাধর কহিলেন, ভয় নাই, বিমুখের উপরি "ইন্দ্রতনয়ের" অস্ত্র কখনও নিপতিত হয় না। বাস্তবিক তাহাই হইল। পার্থ নিবৃত্ত হইলেন। সমরও শেষ হইল এবং গোসকল প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া গোরক্ষকদিগকে সমর্পণ পূর্ব্বক পৌরজন কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। অতঃপর ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত তদীয় মিলন, অজ্ঞাতবাস হইতে মুক্তি, বিরাটের অনুনয় ও কন্যাদান সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কবি গ্রন্থসমাপ্তি করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষ শ্লোকটি পাঠে প্রতীত হয়, যে মণ্ডন নামক কবির সহিত তাঁহার প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু হায়! কোথায় মণ্ডন! তাঁহার প্রতিযোগীর কাব্যে তদীয় নামোল্লেখ মাত্রেই পৃথিবীতে এককালীন তাঁহার অস্তিত্ব আমাদিগের বোধবিষয় হইতেছে, অন্যথা তাহারও সম্ভাবনা ছিলনা হায়! মানবেরা যে যশঃ কীর্ত্তিকে অবিনশ্বর বলিয়া অভিমান করেন, তাহারও এইরূপ নশ্বরতা এবং যশোলিপ্সাজনিত পণ্ডিতমণ্ডলীর যে অন্যোন্যবিরোধ সমাজে নিন্দনীয়, তাহারও একপ সুফলপ্রসবিতা!

ধনঞ্জয়বিজয় সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল, ইহাতেই পাঠক গ্রন্থকারের কবিত্ব সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন। তদ্বিষয়ে বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। হৃদয়গত রসভাবোচ্ছ্বাস ভাষায় যথাযথরূপে স্ফুটীকৃত হইলেই কবিতার উৎপত্তি হয়। পাঠমাত্রেই প্রতীতি হয় যেন উহা কবির লেখনী হইতে সচ্ছন্দপ্রবাহে নির্গত হইয়াছে, কবিকে তন্নিমিত্ত সামান্য প্রয়াসপরম্পরাও স্বীকার করিতে হয় নাই। উহা পাষাণোত্থ উৎসধারা, মনুষ্যের হস্তব্যায়ামোৎক্ষিপ্ত জলগণ্ডূষ নহে। কবিতার বাহ্য নিদর্শন স্থূলতঃ এই দেখা যায়, যে উহাতে অনাবশ্যক শব্দমাত্রও লক্ষিত হয় না, সমস্তই প্রকৃতরসের পরিপুষ্টির নিমিত্ত

প্রযুক্ত হয়। বিশেষতঃ সংস্কৃত কবিতার আর এক রীতি এই যে কতিপয় পদ শ্রুতিগোচর হইলেই তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। অলক্ষ্য ব্যবহিত স্থান হইতে বন্ধুজনের স্বর শুনিয়া যেমন প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, অশ্রুতপূর্ব্ব প্রকৃত কবিতা শ্রবণেও তেমনি তৎক্ষণাৎ উহা কবিনির্ম্মিত বলিয়া পরিচয় সঞ্জাত হয়। গ্রন্থারম্ভে শরদারম্ভকালীন প্রভাতবর্ণনাবসরে,—

দারাণাংমুরবৈরিণো রতিপতের্মাতুস্ত্রি-
লোকীজিতঃ
স্মারৎপঙ্কজকোটরোদরজুষো নিদ্রাবি-
রামে শ্রিয়ঃ।
প্রত্যুদ্ধূতমরালপক্ষপটহধ্বনিপ্রবন্ধানুগং
ভৃঙ্গী মঙ্গলগাথিকেব সততং প্রোৎকূ-
জতি প্রাঙ্গণে॥ ৭

এই কবিতা যখনই আমাদিগের কর্ণে প্রবেশ করে, তখনই ইহার রচয়িতাকে—স্বভাবের এই দ্বিগুণবৈচিত্র্যবিধাতাকে কাব্যজগতের অন্যতর বিধাতা বলিয়া আমাদিগের প্রতীতি জন্মে। বাস্তবিক, গায়কের অসম্পূর্ণগীত রাগপ্রবাহ, চিত্রকরের অসম্যক্ অঙ্কিত রেখাময় আলেখ্য এবং কবির ক্ষীণধারায় অভিব্যক্ত বাগমৃত সহজেই স্ববিভবসামগ্র্যের পরিচয় দেয়। যদিও মূল আদর্শের সমক্ষে ইহা অকিঞ্চিৎকর,—মহাভারতকে সহস্রশাখ অক্ষয় বটবৃক্ষ বলিলে ইহা তাহার একটি শাখারও তুলনীয় কি না সন্দেহ, তথাপি ইহা রমণীয়। সেই বিশালমূর্ত্তি পাদপের যেমন এক ভয়বিস্ময়বিমিশ্র অপূর্ব্ব শোভা, সেই বৃক্ষকে বাল্যদশায় কতিপয় ঘনসরসশ্যামলপল্লবশোভিত ক্ষুদ্র একটি শাখারূপে অবলোকন করিলে তাহারও তেমনি আর একরূপ অপূর্ব্ব ললিতকান্তি আমাদিগের হৃদয়কে মুগ্ধ করে। সংসারে একরূপ শোভা গ্রহণ করিতেও হৃদয়ের দ্বার স্বভাবতঃ উদ্ঘাটিত হয় সন্দেহ নাই। শ্রীশা--

(৭) এই বর্ণনায় রাজ্ঞীর নিদ্রাভঙ্গসময়ে বৈতালিকবধূর তালানুগত মাঙ্গলিক গীতপ্রসঙ্গ ব্যঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু ইনি সামান্য রাজ্ঞী নহেন। ইনি জগতের উৎপাতস্বরূপ দৈত্যগণের নিহন্তা বীরশ্রেষ্ঠের মহিষী, ত্রিভুবনবিজয়ী রতিপতির জননী, স্বয়ং ত্রিভুবনসৌন্দর্য্যরূপিণী লক্ষ্মী দেবী। সুকোমল কমলগর্ভ তাঁহার শয়নাগার। প্রভাতে রাজহংসকুল জাগ্রত হইয়া অলস পক্ষপুটের সঞ্চালনশব্দসহকারে সেই কমলময় সরোবরে অবতরণ করিতেছে, মধুকরী অগ্রে অগ্রেই আগমন করিয়া মধুর গুঞ্জন আরম্ভ করিয়াছে। সুখসুপ্তা লক্ষ্মীদেবী সেই স্বরসঙ্গীতে সমুদ্বোধিত হইলেন; অমনি কমলদল উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল, লক্ষ্মীদেবী নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক বহিরাবির্ভূত হইয়া অমৃতনিস্যন্দিনী দৃষ্টিপাতে ত্রিজগৎ সমুল্লাসিত করিলেন। ইহা অপেক্ষা প্রভাতবর্ণন আর কত মধুর হইতে পারে?

ডেস্‌ডিমোনা।

১

নিশীথ রজনী, ঘোর অন্ধকার
ঘেরেছে সাইপ্রস্‌ শত প্রসরণে,
কুসুম-কোমল শান্তির আধার
মার অঙ্কে যথা চিন্তাশূন্য মনে

২

নিদ্রা যায় শিশু, তেমতি সুন্দর
সাইপ্রস্‌ শু'য়ে ভূমধ্য সাগরে
বীচিরবচ্ছলে মনোমুগ্ধকর
ধীরে ধীরে ধীরে শ্রবণ বিবরে

৩

ঘুমের অস্ফুট সংগীত ঢালিয়া
হরিছে চেতনা; সাগরে আঁধারে,
আঁধারে সাগরে দেহ মিশাইয়া
রাজত্ব করিছে আজ চারি ধারে।

৪

ধীরে ধীরে ধীরে অতি ধীরে ধীরে
ক্ষুদ্র বীচিমালা খেলিছে পুলিনে,
যথা নিদ্রাগত শিশুর শরীরে
সঞ্চালেন কর জননী যতনে।

৫

এ দিগন্ত ব্যাপী আঁধার ভেদিয়া
ভয়ে ভয়ে যেন তারকা জ্বলিছে,
লোহিত বিভায় দিশি উজলিয়া
সুদূরে আগ্নেয় তরঙ্গ খেলিছে।

৬

নির্জ্জন-নিস্তব্ধ-সাগরসৈকতে
ধূম্রবর্ণ-গণ্ড-শৈলের প্রমাণ
শোভিতেছে দুর্গ, নিদ্রিত জগতে
দাঁড়াইয়া যেন রুদ্র নিদ্রা যান।

৭

আঁধারে ডুবিয়া উচ্চ দুর্গচূড়ে
কাদম্বিনী-কোলে ফট্‌ ফট্‌ করি
সুন্দর বিচিত্র বৈজয়ন্তী উড়ে
নিঃশব্দে ভ্রমিছে সশস্ত্র প্রহরী।

৮

নিদ্রিত জগত গভীর নিদ্রায়
দুর্গকক্ষে এক সতী ডেস্‌ডিমোনা
কুসুম-কোমল ধবল শয্যায়
নিদ্রা যান;—যেন বিশদ-বসনা

৯

ভিক্টোরিয়া লিলি রূপে আলোকরি
সরসীর জলে রয়েছে ফুটিয়া
কিম্বা জ্যোতির্ম্ময়ী তারকা আমরি!
যেন সে কক্ষেতে পড়েছে খসিয়া—

১০

জ্বলিতেছে দীপ যেন ম্লান-জ্যোতিঃ
ভবিষ্যৎ স্মরি; কিছুই জানেনা
সোণার প্রতিমা প্রেম-মূর্ত্তিমতী
নিদ্রা যায় সুখে সতী ডেস্‌ডিমোনা!

১১

ঊর্দ্ধমুখী হয়ে নিদ্রিতা সুন্দরী ;
দক্ষিণ মৃণাল-ভুজ সুগঠিত
স্থাপিত কোমল স্ফীত বক্ষোপরি,
বাম বাহু নিম্নে হেলায় লম্বিত।

১২

সুন্দর শৃঙ্খলা বিহীন হইয়া
লাবণ্য মাখান ললাটে কেমন
চূর্ণ কুন্তলের লহরী পড়িয়া
নয়ন নাসাগ্রে করিছে চুম্বন।

১৩

প্রশান্ত ললাটে, মুদিত নয়নে,
কোমল কপোলে, সূক্ষ্ম নাসাশিরে
অলকাবলীতে, কর্ণ-আভরণে,
ক্ষীণ দীপালোক খেলে ধীরে ধীরে।

১৪

"—অকারণ নহে, নহে অকারণ,
কিন্তু সে কারণ—নিশার কুন্তলে
মুকুতা-রূপিণী স্ফটিক হৃদয়
হাস যে তোমরা, লো তারা কুন্তলে,

১৫

"সে কারণ, হায়,—সে পাপ-কারণ
বলিব না আমি শু'নোনা তোমরা,
শুনিলে সে কথা রোধিবে শ্রবণ,
অঙ্গ শিহরিবে হবে জ্যোতিঃ হারা।

১৬

"—কিন্তু রক্ত-পাত,—তার রক্ত-পাত
করিবনা ; তার সোণার শরীরে,
করিব না আমি কভু অস্ত্রাঘাত
কিন্তু তথাপিও বধিব তাহারে।

১৭

"যদি নাহি বধি, যদি এ ধরায়
এ কাল-সাপিনী আরও কিছু দিন
ধরে পাপ-দেহ, নাহি জানি হায় !
কত হতভাগা কত জ্ঞানহীন

১৮

"ব্যক্তিরে সে বিষে করিবে জর্জ্জর !
তার বাগুড়ায় আমারি মতন
রূপে মুগ্ধ হয়ে কত মূর্খ নর
পতঙ্গের মত হইবে পতন।

১৯

"নিবাইব এই প্রদীপ এখনি।
—তার পর ?—এই ঘোর পাপিষ্ঠার
জীবনপ্রদীপ। কণকবরনি
লো জ্বলন্ত-শিখা তোরে একবার

২০

"নিবাইয়া পুনঃ দীপ্ত করা যায়,
কিন্তু সুধামুখী কলো বিষধরি,
জীবনপ্রদীপ জ্বালাইতে হায়
পারিবি কি যদি নির্ব্বাপিত করি ?

২১

"এই হস্তে যদি প্রাণ-পুষ্প তোর
ছিঁড়ি একবার, জীবন্ত রাখিতে,
অভাগিনি, আর নহে সাধ্য তোর ;
শুকাইবে এক দিবসে নিশিতে।

২২

"এ সুরভি পুষ্প পূর্ব্বে ছিঁড়িবার
একবার আমি দেখিব ঘ্রাণিয়া"
এই বলি সেই প্রেমপ্রতিমার
বিম্বাধরে স্বীয় অধর স্থাপিয়া

২৩

করিল চুম্বন, সতী শিহরিলা।
"আর একবার—এই শেষ বার"
সহসা ললনা জাগ্রত হইলা।
পরাজিয়া মৃদু-বীণার ঝঙ্কার

২৪

কহিলা সুন্দরী,—"ওকে প্রাণেশ্বর?
"আমি, ডেসডিমোনা" কহিলা ওথেলো
"হইল রজনী দ্বিতীয় প্রহর
শোও এসে কেন জাগিতেছ বল?"

২৫

যথা অগ্ন্যুৎপাৎ আশঙ্কা না করি
আগ্নেয় গিরির নিকটে আসিযা
নিত্য কর্ম্ম যত দিবস শর্ব্বরী
করিতেছে লোক নিশ্চিন্ত হইযা;

২৫

কিন্তু অচলের উচ্চ চূড ফুটি
শিলা, ভস্ম, ধাতু, উত্তপ্ত-অঙ্গার
সহসা যেমন অন্তরীক্ষে উঠি
মুহূর্ত্তেকে ধ্বংস করে চারি ধার।

২৭

সেই রূপ হায় শুদ্ধা ডেস্‌ডিমোনা
ওথেলোর হৃদে রৌরব অনল
গর্জ্জিছে যে তার কিছুই জানেনা;
যেন নিরমল ঊষার কমল।

২৮

"ঈশ্বরোপাসনা করেছ কি আজ?
যদি এখনও নাহি করে থাক,
করি কোন মহা গরহিত কাজ
চাও যদি ক্ষমা, শীঘ্র তাঁকে ডাক"

২৯

সুগম্ভীর স্বরে ওথেলো কহিলা।
"একি কথা আজ কহিছ প্রাণেশ?"
বিস্মিত হইয়া সতী উত্তরিলা।
ওথেলোর মুখে দৃষ্টি অনিমেষ

৩০

স্থাপিযা সুন্দরী দেখিলা সভয়ে
ওথেলোব আজি ভীষণ মূরতি;—
চক্ষু দুটি ক্রোধে বিস্ফারিত হয়ে
বৈদ্যুতিক তেজে পাইছে স্ফূরতি;

৩১

দেহের দ্রাঘিমা হয় অনুমান
বাড়িয়াছে যেন, অধরে রুধির,
কটিবন্ধে জ্বলে অস্ত্র খরশাণ,
স্নেহ মাখা নহে স্বর সুগম্ভীর।

৩২

তীব্রতর স্বরে কহিলা ওথেলো
"কহিলাম যাহা কর শীঘ্র করি;
এইস্থানে আমি ভ্রমি ক্ষণ কাল
অপ্রস্তুত ভাবে তোমারে, সুন্দরী

৩৩

বধিবনা আমি; অন্তিম সময
অন্তর্য্যামী যিনি সম্মুখে তাঁহার
খুলেদেও পাপ কুটিল-হৃদয;
বধিবনা আমি আত্মাকে তোমার।"

৩৪

যেন ডেস্‌ডিমোনা নেশায় বিহ্বল
কিছুই দেখেনা, কিছুই বোঝেনা;
চক্ষে ঘোরে যেন কক্ষ-ধরাতল,
বলি বলি করি বচন সরেনা

৩৫

অবশেষে ধীরে কহিলা সরলা,
"বধিবে আমারে কহিছ কি তাই ?"
"তাই কহিতেছি" দুষ্ট উত্তরিলা ;
"তবে এ দাসীরে তাঁর পদে চাই

৩৬

"দিউন ঈশ্বর" এতেক কহিয়া
অশ্রু-পূর্ণ দুটি কমল-নয়ন
আকাশের পানে ধীরে উঠাইয়া
নীরবিলা সতী ; নীরবে তখন

৩৭

দুইটি মুকুতা খসিয়া পড়িল !
ক্রোধান্ধ ওথেলো তাহা দেখিলনা;
জানিস্ দুর্ম্মতি জানিস্ ওথেলো,
এ মুক্তার দুটি নাহিক তুলনা।

৩৮

নিরদয় মূঢ় কহিল অমনি ;—
"তবে তাই হোক্" নম্রতম স্বরে
কহিলা সুন্দরী "অধিক রজনী
হয়েছে প্রাণেশ, ঘোর নিদ্রাভরে

৩৯

"আঁখি দুটি তব লোহিত বরণ,
পরিহাস ছাড়, আইস শয্যায় !"
জাননা অভাগি নিদ্রিত এখন
হইবে আপনি অনন্ত-নিদ্রায়।

৪০

কহিল ওথেলো ; "নিজ ব্যভিচার,
পাপীষ্ঠা বারেক কর লো স্মরণ।"
মুছিয়া রুমালে মুকুতার ধার
ভগ্নস্বরে সতী কহিলা তখন ;

৪১

"—ওথেলো প্রাণেশ ! মুক্তকণ্ঠে আজ
কহিতেছি আমি ধর্ম্মে সাক্ষী করি
তোমারই মূরতি সতত বিরাজ
করে এ হৃদয়ে দিবস শর্ব্বরী।

৪২

"একদেবে আমি ভজি ভক্তিভরে ;
সেদেব ওথেলো ! তুমিই আমার
এই উর্ম্মিময় সংসারসাগরে
জীবন-তরীর তুমি কর্ণধার।

৪৩

"অপর পুরুষে অপবিত্র ভাবে
একবার যদি নিরখিয়া থাকি,
যবে দেহ হতে প্রাণ উড়ে যাবে
হে ঈশ্বর ! তুমি ডুবাইয়া রাখি

৪৪

"অতল-অনন্ত রৌরব-অনলে
দিও অভাগীর অনন্ত যাতন।"
এতেক কহিয়া ভাসি অশ্রুজলে
ছিন্নতন্ত্রিসম থামিলা তখন ;

৪৫

কিন্তু ভয়ে ভয়ে দেখিলা চাহিয়া
ক্রোধী ওথেলোর শরীর কাঁপিছে,
চক্ষু রক্তবর্ণ, অধর বহিয়া
ফোটে ফোটে লাল রুধির পড়িছে !

৪৬

"চুপ্ ডেস্‌ডিমোনা !" কহিল ওথেলো
মেঘমন্দ্রসম সুগম্ভীর স্বরে।
"করিলাম চুপ্ কি হয়েছে বল ?"
ডেস্‌ডিমোনা সতী কহিলা কাতরে।

৪৭

"কি হয়েছে হায়, কি হয়েছে বল ?"
কহিলা ওথেলো,—"কি হইবে আর
বাছি বাছি যেই শুভ্র শতদলে
যতনে তুলিয়া হৃদয়ে আমার

৪৮

"করিনু স্থাপন, এক বিষধরী
তাহা হতে হায়, বাহির হইয়া
মর্ম্ম স্থানে মোর দংশেছে সুন্দরি !
কি যে হইয়াছে, কাজ কি কহিয়া !

৪৯

"দেখ ডেস্‌ডিমোনা শুন কথা মোর
আসন্ন সময় তব সন্নিকটে,
জীবন-যামিনী শীঘ্র হবে ভোর
নিজ অপরাধ কও অকপটে।

৫০

"কৃত পাপ কেন করি অস্বীকার
পাপের উপরে পাপ চাপাইবে !
কেমনে বহিবে এত পাপভার
পরকালে তব কি গতি হইবে ?,,

৫১

"প্রাণনাথ ! "চুপ্ চুপ্ ! পাপিয়সি !
ওথেলো কাহারো প্রাণনাথ নয়,"
তথাপি কাতরে কহিল রূপসী
"তুমিই আমার আছ প্রাণময়।

৫২

কেশিওকে আমি—ধর্ম্মে সাক্ষী করি
কহি বার বার—কেশিওকে আমি,
ওথেলো তোমাকে তিলার্দ্ধ পাসরি,
ভজি নাই কভু, তুমি মোর স্বামী !"

৫৩

"ভজ নাই তুমি ? পিশাচি, পাপিনি !
ভজ নাই তুমি"—ওথেলো গর্জ্জিল ;
"কেমনে লো তবে কহলো সাপিনি !
আমার রুমাল কেশিও পাইল ?"

৫৪

"আমি দেই নাই !" "তুমি দেও নাই ?"
"আমি দেই নাই ওথেলো প্রাণেশ।
আমি দেই নাই জানেন গোসাঁই
বুঝি সে কোথাও পড়িয়া পাইল !'

৫৫

"ডাক কেশিও রে, সুধাও তাহারে
সে যা সত্য জানে করুক স্বীকার।"
"প্রতারণা আর করিতে আমারে
নারিবে পাপিনি ! সব দোষ তার

৫৬

স্বীকার করেছে ; ডেস্‌ডিমোনার,
ওথেলোর পত্নী—না না তাহা নয় ;
ডেসডিমোনার সহ ব্যভিচার
করেছে কেশিও অনেক সময়। "

৫৭

কহিলা সুন্দরী কাঁদিতে কাঁদিতে
"ওথেলো, এমন অসত্য বচন
পারেনা কেশিও কখন কহিতে।
'সত্য' বিষ হাসি হাসিয়া তখন

৫৮

ওথেলো কহিল ;—"কহিতে পারেনা ;
দুষ্ট কেশিওর চিরদিন তরে
দৃঢ় বদ্ধ মুখ, নীরব রসনা।"
'তবে' ডেস্‌ডিমোনা কহিলা কাতরে

৫৯

"তবে কি কেশিও হয়েছে নিহত ?"
"দেখ ডেস্‌ডিমোনা" উত্তরিল মূঢ়,
"এই শিরোদেশে কেশ সংখ্যা যত
কেশিওর এত সংখ্যক প্রচুর

৬০

"যদি—শুনিছ ত ?—থাকিত জীবন,
ক্ষুধার্ত্ত দুরন্ত শার্দ্দূলের প্রায়
করিতাম আমি একত্রে চর্ব্বণ !
তার সদ্য উষ্ণ শোণিত-ধারায়

৬১

দাবানলসম যে মহা অনল
দহিতেছে হায় ! মরম আমার,
নিবাইয়া তাহা হ'তাম শীতল !
তার পরে—না না কহিবনা আর"—

৬২

"মরেছে কেশিও বিনা দোষে হায় !"
এতেক কহিয়া কাঁদিলা সুন্দরী
"হায় ! হায় ! আজ্ আমি নিরুপায়"
"কেশিওর তরে, কিলো বিষধরি !"

৬৩

গর্জ্জিল ওথেলো—"কেশিওর তরে
করিস্ আক্ষেপ সম্মুখে আমার ?"
এতেক কহিয়া মহাক্রোধভরে
অগ্রসর হল মূঢ় দুরাচার।

৬৪

"ওথেলো, প্রাণেশ !" সজল নয়নে
পতিপ্রাণা সতী কহিল কাতরে
"রেখে এস মোরে গহন কাননে
ভয়াল ভল্লুক যথায় বিচরে।

৬৫

"সেইখানে আমি চিরদিন রব
বিরক্ত তোমারে কভু করিব না ;
যত কষ্ট হয় মনে মনে সব
ব'ধোনা আমারে পরাণে ব'ধোনা !"

৬৬

"বধিবনা তোরে ? পিশাচি ! পাপিনি !
বধিবনা তোরে ?" ঘোর সিংহরবে
গরজিল মূঢ় ;—"একাল সাপিনী
থাকিলে সংসারে সর্ব্বনাশ হবে।"

৬৭

অশ্রুজলে ভাসি, কর যোড় করি
কহিলা সাবিত্রী শোক-ভগ্ন-স্বরে,—
"পোহাইলে এই কাল বিভাবরী
বধো অভাগীরে ! আজি দয়া করে

৬৮

"প্রাণেশ ওথেলো ! আজি দয়া করে
জীবিত থাকিতে দেও এ ধরায় !
তব চিরদাসী অন্তিমে কাতরে
তব পদে মাত্র এই ভিক্ষা চায় !"

৬৯

"না না তা হবে না—কখনই হবে না,
—দ্যাখ্ পলাইতে পুনঃ চাস্ যদি,
অস্ত্রাঘাতে ঘাতে দ্যাখ্ ডেস্‌ডিমোনা
বহাইব তোর শোণিত নদী !"

৭০

পতিপদতলে লুণ্ঠিত হইয়া
কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তরিলা সতী,
"তবে মুহূর্ত্তেক দাঁড়াও ডাকিয়া
লই দয়াময়ে—অগতির গতি।"

৭১

"না না না আর না"—এতেক কহিয়া
রুদ্র-রূপী মূঢ় অৰ্দ্ধ-লম্ফ দিল,
দৃঢ় লৌহ জিনি বজ্রাঙ্গুলি দিয়া
দয়িতার গলা চাপিয়া ধরিল ।

৭২

"দ্বার খোল, প্রভু, খোল খোল দ্বার, „
"কে তুমি ?" চমকি ওথেলো কহিল ;
"দ্বার খোল আগে" সঙ্গে সঙ্গে তার
বারংবার দ্বারে আঘাত পড়িল ।

৭৩

খুলিল দুয়ার । দাসী এমিলিয়া
ঊৰ্দ্ধশ্বাসে আসি পশিল কোঠায় ;
"যাও যাও প্রভু, যাও দেখ গিয়া
রডারিগো হত হইয়াছে হায় ! „

৭৪

"পড়িয়াছে কিসে রডারিগো মারা ?
নহে সে কেশিও—কখন ?—এখন ?
হইয়াছে যম আজ মাতওয়ারা
একের বদলে অন্যের নিধন ! „

৭৫

"হায় অকারণে মোর প্রাণ যায় !
জানাইও নাথে প্রণাম আমার,
চলিলাম এমি বিদায় ! বিদায় ! „
"—ওযে গলা কর্ত্রী ডেসডিমোনার !„

৭৬

"উঠ উঠ সবে ! হায় ! হায় ! হায় !
কহ ঠাকুরাণী " কাঁদি এমিলিয়া
শুধাইল দাসী ডেসডিমোনায়,—
"কাহার একাজ কহনা ভাঙ্গিয়া ? „

৭৭

"আমি নিজে মরি কারো দোষ নয় !„
ক্ষীণ-ভগ্ন-স্বরে কহিলা ললনা,
"পতি-পদে মোর প্রণাম নিশ্চয়
জানাইও এমি ! ভুলোনা ! ভুলোনা !„

৭৮

কহিতে কহিতে নীরব-রসনা
চক্ষু জ্যোতিঃ-হীন স্পন্দহীন কায়,
স্ফটিক হৃদয়া সতী ডেস্‌ডিমোনা
হইলা মগন অনন্ত নিদ্রায় ! শ্রীদ—

পাণিনি ।

সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তিভূমি এক্ষণে কোথায় ? ইহার নির্ম্মাতা কে ? কোন্ সময়ে ইহার সূত্রপাত হয়, এবং কোন্ সময়েই বা কোন্ দেশের লোকেরা ইহার প্রচার করিয়াছিল ? কে কে ইহার উন্নতি করিয়াছিল ? ইহা কি আদিমতম ভারতবাসীদিগের মাতৃভাষা ছিল ? না তাঁহাদের অন্যবিধ ভাষা ছিল, তাহাই সংস্কার পূৰ্ব্বক নিয়মবদ্ধ করিয়া, সংস্কৃত নাম দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন ? এ সকল নির্ণয় করে কাহার সাধ্য ? এই বর্ষীয়সী ভাষার উৎপত্তিকাল নির্ণয় করে কাহার সাধ্য । উ-

পরে যে "পাণিনি" মুকুটার্পণ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম, উনি এই বর্ষীয়সী ভাষার কত নিম্নের বালক তাহা বলা যায় না। এমনি শুনিতে পাণিনি বৃদ্ধতম, কিন্তু এই ভাষার ক্রোড়ে বসাইয়া দেখিলে উহাঁকে সদ্যঃপ্রসূত শিশু বলিয়া বোধ হইবে।

এই ভাষার উৎপত্তিকাল চিন্তার পরপারে লুক্কায়িত আছে। বুদ্ধির অগম্য পথে প্রোথিত আছে—আর তাহা পাওয়া যাইবে না।

যাহাঁরা সংস্কারক বা উন্নতি করেন তাঁহাদিগকেও পাওয়া যাইবে না, তাঁহারা ইহলোকে নাই—অনেক শতবর্ষ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আর তাঁহাদিগকে পাওয়া যাইবে না। তবে আমাদেরই দু পাঁচ জন পূর্ব্ব পুরুষ, যাঁহারা সংস্কৃত লইয়া কিঞ্চিৎকাল মাত্র ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুই একজনের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করিব মানস করিয়াছি। তন্মধ্যে পাণিনি, শীর্ষকে যাঁহার নাম অঙ্কিত করিয়াছি, তাঁহারই বিষয় যথাসাধ্য বলিবার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সংস্কৃত ভাষা এদেশীয়দিগের যত্নের ধন। এক সময়ে এদেশীয়েরা ইহার দ্বারা স্বর্গীয় সুধা পানের ক্ষোভ নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। ভাগুরি, ঔপমন্যব, যাস্ক, গালব, শাকল্য, জৈমিনী প্রভৃতি ঋষিকুলের নিকট ইনি দেবভাষা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা যত্নের সহিত ইহার পুষ্টি সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতঃপর এই সংস্কৃত ভাষা ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃষ্ণ, আপিশালী, শাকটায়ন, ব্যাড়ি, পাণিনি, কাত্যায়ন, ও পতঞ্জলি প্রভৃতি আচার্য্যকুলের নিকট বিশেষ সমাদৃতা ছিলেন, তাঁহারাও যথাসাধ্য ইহাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মার্জনা করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত আচার্য্যদিগের মধ্যে পাণিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। এখন আর পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত চলে না, সর্ব্বকনিষ্ঠ পাণিনির মতই এক্ষণে প্রবল। যদিও দুই একটা মত প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ চলে না, সে সকল গ্রন্থ লোপ হইয়াছে।

পাণিনির মত এত প্রবল কেন? তাঁহারই বা [illegible] কেন? তিনি কোন্ দেশের লোক? কোন্ সময়ের লোক? কাহার পুত্র? এসকল জানিবার জন্য অনেকেরই কুতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ইতঃপূর্ব্বে অনেক মহাত্মাকে সেই কুতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমিও তৎপথে পাদার্পণ করিতেছি। যদি বল প্রয়োজন কি?—প্রয়োজন না থাকিলে অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিরও বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না। পাণিনির সময়াদি বিনির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতা দোষে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং নির্মূল কল্পনার আশ্রয়ে থাকিয়া জিজ্ঞাসুদিগকে অভুল বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই জন্যেই আমি তাঁহাদের সিদ্ধান্তে স-

স্তুষ্ট না থাকিয়া, স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছি।

আমারও যে ভুল হইবে না, ইহাও প্রত্যাশা করা যায় না; কেন না, অতীত বস্তুর যথার্থ নির্ণয় দুঃসাধ্য। অতীত বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষের প্রভুতা নাই। প্রত্যক্ষ কেবল বর্ত্তমান লইয়াই থাকেন। অনুমানও কখন কখন ভ্রম বুঝাইয়া দিয়া থাকে, যেহেতু অনুমান-প্রমাণটি প্রত্যক্ষ-সংস্থ্ষ্ট। ভ্রান্ত অনুমান বস্তুর দোষেও হয়, দেখিবার দোষেও হয়। আর একটি প্রমাণ আছে তাহার নাম 'ঐতিহ্য।' ঐতিহ্য কি, তাহা বলিতেছি। যাহা বৃদ্ধপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে তাহাই ঐতিহ্য। যদি কোন প্রবাদ বহুকাল হইতে অবিচ্ছেদে চলিয়া আইসে, তবে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করার রীতি আছে, কিন্তু তাহা সত্য না হইতেও পারে। অতএব অতীত বস্তুর যাথার্থ্য-নির্ণযপক্ষে যখন এত বাধা আছে, তখন আমিও যে অভ্রান্ত নির্ণয় করিতে পারিব ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে পদ্ধতিতে অতীত বস্তুর নির্ণয় হওয়া সুসম্ভব,সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা দোষ ত্যাগ করিয়া, নির্ম্মূল কল্পনা বর্জন করিয়া অতি সাবধানে নির্ণয় করিব, ইহাতে যতটুকু সত্যের আকর্ষণ সম্ভব, পাঠকগণ তাহাই পাইবেন।

• পুরাতত্ত্ব জানিবার দুইটি মাত্র উপায় আছে, যুক্তি ও ঐতিহ্য। অবিচ্ছেদে ও ধারাবাহিকরূপে সমাগত বিশ্বাসযোগ্য জনপ্রবাদ, তৎকালের কি তৎপরবর্ত্তী কালের লিপি, ঘটনাবিশেষের লুপ্তাবশেষ, প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য, এই সকল উহার আলম্বন। এই সকল অবলম্বন করিয়াই যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রাচীন বস্তু অনুসন্ধান করিতে হয়। যে যুক্তির কোন মূল নাই, যে যুক্তি পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ, একদিকে সংলগ্ন, একদিকে অসংলগ্ন, এমন যুক্তি পরিত্যাজ্য। ঐতিহ্য পক্ষেও এই রীতি। এই রীতির অনুগত থাকিয়াই পাণিনির জীবনী নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

আচার্য্য হেমচন্দ্র স্বকৃত অভিধানচিন্তামণির মর্ত্যকাণ্ডে পাণিনির নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"অথ পাণিনৌ,শালাতুরীয়দাক্ষেয়ৌ।"

শালাতুরীয় ও দাক্ষেয় এই দুইটি শব্দ পাণিনি নামক মুনিবোধক। এই লিপির দ্বারা ৭৫০ বৎসরের সংবাদ পাওয়া গেল। বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রচারক শঙ্করাচার্য্যকেও পাণিনির নামোল্লেখ করিতে দেখা যায়। যথা—

"নচ পাণিনিস্মৃতিবিরোধঃ —"

(১ম অং)

এই লিপি অনুসারে নির্ণয় হইতেছে যে, পাণিনি ১০৮৯ বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, কেন না শঙ্করাচার্য্য উক্ত পরিমিত কালের লোক। যথা "নিধিনাগেহভবহ্নাব্দে"

ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

জৈমিনীসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা বহুপ্রাচীন। কেননা শঙ্করাচার্য্য স্বকৃত বেদান্ত ভাষ্যের ১ম অধ্যায়ে " যত্নশাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদামনুক্রমণম্ " এই উক্তি করিয়া, শবরস্বামীর বাক্য উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বৃদ্ধোচিত পূজা করিয়াছেন। এই বৃদ্ধতম শবরস্বামীও পাণিনির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

" নহি বৃদ্ধিশব্দেন আপাণিনের্ব্যবহারতঃ আদৈবঃ প্রতীয়েরন্ পাণিনিকৃতিমননুমন্য।"

(১ অং, ১ পাদ)

অতএব, ইহার দ্বারা স্থির হইতেছে যে পাণিনি অন্যূন ১২। ১৩ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। যেহেতুক শবরস্বামীর কাল এক্ষণে উহার ন্যূন নহে। অমর সিংহকেও পাণিনির অনুসরণ করিতে দেখা যায়, সুতরাং পাণিনি ৫০০ খৃষ্টাব্দের বহুকাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা নিশ্চিত হইতে পারে।

মগধেশ্বর শেষনন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের সমকালিক চাণক্য মুনিকেও পাণিনির উল্লেখ করিতে দেখাযায়। যথা—' অন্তের্ভূঃ ' ' ক্রবোবাচি ' ' আধারোঽধি করণম্ ' ' ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্ ' এই সকল পাণিনিসূত্র তিনি স্বকৃত ন্যায়ভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন। চাণক্য যখন পাণিনির উল্লেখ করিয়াছেন তখন নিশ্চয় হইতেছে যে, তিনি অবশ্য ২৩ শত বৎসরের কোন এক অনির্দ্দিষ্ট কালের লোক।

এস্থলে ন্যায়ভাষ্যজ্ঞ পাঠকের একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। সে সংশয এই যে, ন্যায়ভাষ্যে লেখা আছে তাহা বাৎস্যায়নকৃত ; কিন্তু আমি বলিলাম চাণক্যকৃত। এই সংশয়-ভঞ্জনের জন্য, চাণক্য ও বাৎস্যায়ন যে একব্যক্তি, এস্থলে তাহাও প্রমাণ করা যাইতেছে।

চাণক্যের একটি নাম নহে। পূর্ব্বকালে গুণ, বংশ, কার্য্য, ইত্যাদি বহু কারণবশতঃ এক ব্যক্তির বহু নাম থাকিত, সুতরাং চাণক্যেরও বহু নাম ছিল দেখা যাইতেছে। তাঁহার বাৎস্যাযন, মল্লনাগ, কৌটিল্য, চাণক্য, দ্রামিল, পক্ষিলস্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত, ও অঙ্গুল এতগুলি নাম ছিল। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র স্বকৃত অভিধানচিন্তামণিতে এই সমস্ত নামগুলিই পর্য্যায়বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

" বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কৌটিলশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চসঃ। " (মর্ত্যকাণ্ড)

ন্যায়ভাষ্য যে চাণক্য-বাৎস্যায়নের কৃত তাহারও প্রমাণ আছে। উদ্যোতকর মিশ্রকৃত বার্ত্তিক, এবং বাচস্পতি মিশ্রকৃত তাৎপর্য্য-টীকায় এই গ্রন্থ পক্ষিল স্বামী-কৃত বলিয়া উল্লেখ আছে। ন্যায়শাস্ত্রে যে পক্ষিল স্বামীর একটি স্বতন্ত্র মত আছে তাহা আধুনিক নৈয়ায়িকগণও স্বীকার করেন। পক্ষিল স্বামী বাৎস্যায়নকে চাণক্য ভিন্ন অন্য কোন বাৎস্যায়ন কল্পনা

করা যায় না। সুতরাং এই চাণক্যের নীতিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্রে আছে। শব্দশাস্ত্রে ইনি কোটিল্য-নামে বিখ্যাত। এসকল আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, এ-জন্য এ সম্বন্ধের বিশেষ বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ করিলাম না।

চাণক্য পণ্ডিত যখন পাণিনির উল্লেখ করিতেছেন, তখন অবশ্য তিনি চন্দ্রগুপ্তের বা শেষনন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহার দ্বারা তদীয় কালসংখ্যাস্থলে অন্যূন ২৫০০ শত বৎসর গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতঃপর আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা কোন একটা নির্দ্দিষ্টকাল স্থির করা যাইতে পারে। আরোহ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ২৫০০ শত বৎসরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। এক্ষণে অবরোহ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখা যাউক তাহাতেই বা কোথায় দাঁড়াইতে হয়।

কোন একটি নির্দ্দিষ্টকাল কেন্দ্র করিয়া অবরোহ প্রণালীতে ক্রমে অবতরণ করিয়া আসিতে হয়।

কোন্ কালটিকে কেন্দ্র করা যাইবে? সর্ব্বসংহারক কাল যে সময়ে এই ভারতবর্ষে ভীষণ সংক্ষয় উপস্থিত করিয়াছিল, যে দিনটির অবসানে কালরাত্রিতুল্য করালরাত্রের মধ্যভাগে বটবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া দ্রোণপুত্র কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য জীবশূন্য পৃথিবী দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, যে সংক্ষয়ের পর ভারত আর জাগ্রত হইল না, সেই সময়টিকে কেন্দ্র করিয়া নিম্নে আগমন করা যাইতেছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালটির উল্লেখ মহাভারতে আছে; কিন্তু তাহাতে একটি নির্দ্দিষ্টকাল-সংখ্যা পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থের অনুসরণ করা যাইতেছে। বরাহসংহিতানামক জ্যোতির্গ্রন্থে এই কালটির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রাজতরঙ্গিণী নামক প্রাচীন ইতিবৃত্তগ্রন্থে ও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা—"গতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষুচ বৎসরে। অভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ।"

কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়। উক্ত গ্রন্থকারেরা জনশ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়া উক্ত কাল সংখ্যা লেখেন নাই। জ্যোতির্গণনা ও অব্দব্যবহার তাহাতে প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের সময়েও যৌধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত হইল। বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ আরম্ভের সময় যৌধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ ছিল। এইরূপ আর্য্যভট্টীয় গ্রন্থেও যৌধিষ্ঠিরাব্দ বর্ত্তমান থাকার উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের বৃত্তান্তঘটিত মহাভারত, ভগবৎ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল (সাত ভেয়ে তারা) মঘা নক্ষত্রে ছিল। ইহা অবলম্বন করিয়া উক্ত জ্যোতির্বেত্তারা বলিয়াছেন, যে উক্ত সপ্তর্ষি মণ্ডল শত বৎসর করিয়া এক এক নক্ষত্রভোগ করে। শত বৎসরান্তে প-

রিবর্ত্তিত হইয়া অন্য নক্ষত্রে গতি হয়। সূর্য্যের যেমন এক মাসে এক রাশি ভোগ হয়, সেইরূপ সপ্তর্ষিমণ্ডলের ২২৫ বৎসরে এক রাশি ভোগ হয়। এতাদৃশ সপ্তর্ষিমণ্ডল যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে মঘা নক্ষত্রে ছিল, এক্ষণে আমরা উহাকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে দেখিতেছি। এই কালে প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় হইয়াছে, যে কলির ৬৫৩ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইযাছিল। তাহার পরেও যুধিষ্ঠিরেরা অনেক বৎসব জীবিত ছিলেন। তাহাতে অনধিক ৭০০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। এই যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ অর্জ্জুন, তৎপুত্র অভিমন্যু, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, তৎপুত্র জনমেজয়; এই জনমেজয়ের পরে নৈমিষারণ্যীয় ঋষিদিগের দ্বারা মহাভারত প্রচার হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আর মহাভারত প্রচার, এতন্মধ্যে অন্যূন ৩০০ শত বৎসর ব্যবধান আছে, ইহা বলিলে বোধ হয় সমধিক দোষ হয় না, এবং তাহা হইলে কলির সহস্র বৎসরান্তে মহাভারত প্রচার হইয়াছে ইহাও বলা যাইতে পারে। এই ভারত পুরাণকালেব এবং তৎ-সমকালের যে কোন মহাত্মা, সকলেই সন্নিবিষ্ট আছেন, কিন্তু ইহাতে যাস্ক, পারস্কব, শাকটাযনাদির উল্লেখ নাই। কেবল মহাভারত নহে, মহাভারতের পরবর্ত্তি অন্যান্য পুরাণেও নাই। যখন মহাভারতের পরবর্ত্তী বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণসমূহের উৎপত্তিকালে যাস্ক পারস্করাদির অসত্তা নির্ণীত হইতেছে, তখন তাঁহারা নিশ্চিত তদপেক্ষা অন্যূন ৫০০ শত বৎসরের পরভাবিক। পাণিনি মুনি স্বীয় সূত্রে ঐ সকল ব্যক্তি অর্থাৎ যাস্ক, পারস্কর, শাকটাযন, এবং ভারতীয় ব্যাস, তৎশিষ্য ও তৎপ্রশিষ্যাদির উল্লেখ করিয়া নিজের অনেক নিম্নবর্ত্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে, অবরোহ প্রণালীতে, কলির দুই সহস্র বৎসর বাদ দেওয়া যাইতে পারে। এখন পাঠক দেখুন, পাণিনি মুনি কালপ্রাসাদের কোন্ সোপানটিতে বসিয়া ব্যাকরণসূত্র রচনা করিতেছেন? বর্ত্তমান সময় হইতে অন্যূন ২৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে এবং কলির প্রবৃত্তির ২০০০ বৎসর পরে তিনি এই সন্ধি-স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।

যুক্তি অবলম্বন কবিলে পাণিনির সময় নির্ণয় সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত সত্তালাভ হইতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাউক, ঐহিত্য অবলম্বন করিলে কি হয়।

ঐতিহ্য অবলম্বন করিলেও উপরোক্ত নির্ণয়ই স্থির থাকে এবং তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং যুক্তিলভ্য সত্যটি দৃঢ় হয়। ঐতিহ্য গ্রহণ করিবার অবলম্বন অধিক নাই, বৃহৎ কথা এবং তাহারই সঙ্কলন কথাসরিৎসাগর ও বৃহৎ কথামঞ্জরী, এই গ্রন্থত্রয মাত্র আছে। এই গ্রন্থত্রয়েই পাণিনির জীবনীর ঐক্য আছে। অতএব বৃহৎ কথার উল্লেখমাত্র করিয়া

তাহা হইতে ঐতিহাসিক সার কথা কএকটি উল্লেখ করিতেছি। পাঠকগণ ইহা মিলাইয়া দেখিলে যুক্তিলভ্য সত্যের সহিত বড় অধিক ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন না।

বৃহৎকথা বলেন, পাণিনি উপবর্ষ পণ্ডিতের ছাত্র। উপবর্ষ নামক একজন শব্দশাস্ত্রের আচার্য্য ছিলেন, তাহা আমরা গ্রন্থান্তরেও পাইয়াছি। যথা ;—

" যদাহ ভগবানুপবর্ষঃ
বর্ণা এবহিশব্দাঃ " (সূত্রভাষ্য ২অং)

বৃহৎকথা বলেন, পাণিনি মধ্যদেশে ছিলেন। পাণিনিনিজেই 'শালাতুরীয়' নাম দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সালাতুর নামক প্রদেশ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বাসভূমি ছিল, কিন্তু তিনি নিজে তদ্দেশবাসী নহেন।

বৃহৎকথা বলিয়াছেন যে, পাণিনি নন্দের সমসাময়িক, পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তিতেও প্রায় তাহাই পাওয়া গিয়াছে।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৃহৎকথার মধ্যেও ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত আছে। কেবল বৃহৎকথা কেন, কথাগ্রন্থমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে সত্য আছে। কোন এক সত্যভিত্তির উপর কথারচকেরা অলঙ্কার দিয়া বাহুল্য রচনা করিয়া থাকেন, ইহাই কথারচকদিগের স্বভাব। তদ্ভিন্ন আকাশকুসুমের ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলে উহা কথাগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত না, যেহেতু কথাগ্রন্থের লক্ষণই ঐরূপ। যথা ;—

"প্রবন্ধ-কল্পনাং স্তোক সত্যাং প্রাজ্ঞাঃ কথাংবিদুঃ।
পরম্পরাশ্রয়া যা স্যাৎ সা মতাখ্যায়িকা বুধৈঃ॥"

অতএব যুক্তি-লভ্য অর্থের সহিত বৃহৎ কথার যে যে অংশের সামঞ্জস্য আছে, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? বৃহৎকথা পাণিনিকে নন্দের সমকালিক বলিয়াছেন, তাহা শেষ নন্দ না হইয়া নবনন্দের তৃতীয় কি চতুর্থ নন্দ হউক। বৃহৎ কথা বলিয়াছেন পাণিনি ও ব্যাড়ি তুল্যকালিক, যুক্তি ও পাণিনি নিজে তাহাই বলিতেছেন।

আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। ইউরোপীয় অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতে তিনি খৃস্টজন্মের ৪০০ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তি ছিলেন। তিব্বতদেশীয় লামা তারানাথ তাঁহাকে নন্দের সমকালিক এই মাত্র বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন্ নন্দের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। যদি শেষ নন্দ হয় তবে তিনি তদীয় মতে খৃষ্টজন্মের ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। বঙ্গদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাচস্পতি তারানাথও এইরূপস্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে নন্দের তুল্যকালজন্মা চাণক্য-পণ্ডিত অপেক্ষা পাণিনি বহুল প্রাচীন এবং যাস্ক পারস্করাদির বহু অর্বাচীন। তখন তিনি কোন প্রকারেই শেষনন্দের

সমকালিক হইতে পারেন না। আমাদিগের মতে তিনি দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দের সমকালিক। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারি না, কেন না, তাহা হইলে তিনি ব্যাসের অধস্তন পঞ্চমশিষ্য এবং যাস্ক প্রভৃতিকে চিনিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বকৃত ব্যাকরণসূত্রে আনিতে পারিতেন না।

পাণিনি কোন্ দেশীয় লোক? তাঁহার বাসভূমি কোথায় ছিল? এবিষয়েরও অন্বেষণ করা যাউক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পাণিনির আর দুইটি নাম আছে, শালাতুরীয় এবং দাক্ষেয়। শালাতুরীয় নামটি দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শালাতুর নামক গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি বা বাসভূমি নির্ণয় করিয়াছেন। শালাতুর গ্রামটি গান্ধার (কান্দাহার) প্রদেশের অন্তর্গত, আধুনিক 'অটক' নামক স্থানের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে তিনি জন্মিয়াছিলেন বা এই স্থানে বাস করিতেন, ইহার কোন কথাটিতেই আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ, পাণিনি নিজেই শালাতুরগ্রাম তাঁহার বাসভূমি বলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা--চতুর্থ অধ্যায়ে ৯০ সূত্রে 'অভিজনশ্চ।' এই সূত্র আর তাঁহার শালাতুরীয় নাম, এই দুই একত্র হইয়া একটি গূঢ় সত্য প্রকাশ করিতেছে। সেইটি এই যে, শালাতুর গ্রাম তাঁহার বাস-ভূমিও নহে এবং জন্মভূমিও নহে; তবে কি? উহা তাঁহার কুল-পুরুষদিগের জন্মভূমি এবং বাসভূমি। যথা—

পাণিনি 'অভিজনশ্চ' সূত্রের পূর্ব্বে 'তদস্য নিবাসঃ' এই একটি সূত্র করিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, নিবাস ও অভিজন এই দুয়ের মধ্যে অবশ্য কিছু প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদটি বৃত্তিকার দেখাইয়া দিয়াছেন। যথা, "যত্র সংপ্রত্যুষ্যতে স নিবাসঃ যত্র পূর্ব্বপুরুষৈ রুষিতং সোঽভিজনঃ" যে স্থানে পূর্ব্ব পুরুষের বাস ছিল তাহা অভিজন এবং যাহা বর্ত্তমান বাসস্থান তাহা নিবাস। এতাদৃশ অভিজন অর্থে পাণিনি নিজে 'শালাতুরীয়' নামটি নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেন না,—'অভিজনশ্চ' এই সূত্রের পরে, অভিজন অর্থটির আকর্ষণ করিয়া, 'তূদী শলাতুর বর্ম্মতী কুচবারাড্ঢক্ (৪।৩।৯৪) এই সূত্রটি নির্ম্মাণ করিয়া, শলাতুর শব্দের উপরে ঢক্ প্রত্যয় করিয়া 'শালাতুরীয়' রূপনির্ম্মাণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। অতএব পাণিনি নিজে যখন "শালাতুর" গ্রাম আপনার অভিজন বলিয়া জানিতেন, তখন আমরা তাঁহাকে শালাতুরবাসী বলিতে পারি না। সুতরাং পাণিনিকে বৃহৎকথার লিখিত মগধদেশবাসী বলিতে হইল। কেননা 'অভিজনশ্চ' এই অর্থে নিষ্পন্ন শালাতুরীয় নামের দ্বারা বৃহৎকথার ঐতিহাসিক সত্যতা সপ্রমাণ হইতেছে।

বৃহৎকথার ইতিহাসাংশ যে কিয়ৎ-পরিমাণ সত্য, এবং পাণিনি যে এদেশীয় তাহা পাণিনির 'দাক্ষেয়' এই তৃতীয় নাম দ্বারা ও প্রকাশ পাইতেছে। যথা— "জীবতিতুবংশ্যে তদপত্যং যুবা" এবং "অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতি গোত্রম্" এই দুই সূত্রে, বংশ্য-পুরুষ জীবিত থাকিলে তদীয় প্রপৌত্র প্রভৃতি অতি দূর বংশীয়েরা 'যুবন্' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে বলিয়াছেন। এতদনুসারে 'দাক্ষি' নামক ব্যক্তির জীবিত কালের মধ্যে, তৎপৌত্র বি প্রপৌত্র দাক্ষায়ণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দাক্ষায়ণ ও ব্যাড়ি এক ব্যক্তি। কেন না, পতঞ্জলি ব্যাড়িকৃত লক্ষশ্লোকাত্মক সংগ্রহ নামক গ্রন্থকে দাক্ষায়ণের কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা— 'শোভনাখলু দাক্ষায়ণস্য সংগ্রহস্যাকৃতিঃ' ইত্যাদি। অতএব, ব্যাড়ি বা দাক্ষায়ণের পিতামহ কি প্রপিতামহের নাম দাক্ষি এবং এই দাক্ষির কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম দাক্ষী। "দক্ষস্যাপত্যং পুমান্ দাক্ষি,দক্ষস্যাপত্যং স্ত্রী দাক্ষী।" এই নির্ব্বচনলভ্য অর্থের অপ্রামাণ্য আশঙ্কা কস্মিন্ কালেও নাই। পাণিনি এই দাক্ষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাও তদীয় 'দাক্ষায়ণ , নাম দ্বারা লক্ষ্য হয় এবং 'দাক্ষী-পুত্রেণ ধীমতা' ইত্যাদি স্পষ্ট প্রমাণ-বাক্যও আছে। এতদনুসারে, দাক্ষায়ণ বা ব্যাড়ির পিতামহ বা প্রপিতামহ দাক্ষির সহিত দাক্ষেয় বা পাণিনির মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধ দাড়াইতেছে। দাক্ষির জীবদ্দশাতেই ব্যাড়ির পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল, এবং ব্যাড়ির জীবৎ কালেও তদীয় পিতামহ বা প্রপিতামহ দাক্ষি নিশ্চিত জীবিত ছিলেন, তাহা না থাকিলে ব্যাড়ির 'দাক্ষায়ণ' নাম হইতে পারিত না। অতএব ব্যাড়ির নাম দাক্ষায়ণ *। আর পাণিনির নাম দাক্ষেয়, এই নাম দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, ব্যাড়ি ও পাণিনির বয়োগত ন্যূনাধিক্য থাকিলেও উঁহারা পরস্পরকে দেখিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু ব্যাড়ি অপেক্ষা পাণিনি বয়োবৃদ্ধ হওয়াই অধিক সম্ভব। ইহা নিম্ন প্রদর্শিত চিত্র দেখিলেই প্রতীত হইবে।—

(বংশ পুরুষ)

দক্ষ।

দাক্ষি (পুত্র)　　দাক্ষী (কন্যা)

পাণিনি বা দাক্ষেয়

ব্যাড়ি বা দাক্ষায়ণ

* ব্যাড়ির মাতার দাক্ষী নামটি গোত্রানুসারে হইয়াছে। নচেৎ তাঁহার প্রকৃত নাম নন্দিনী। এতদনুসারে ইহাঁর 'নন্দিনী-তনয়' একটি নাম। দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন বলিয়া 'বিন্ধ্যবাসী' নামও ছিল। আচার্য্য হেমচন্দ্র "অথ ব্যাড়ি বিন্ধ্যবাসী নন্দিনীতনয়শ্চ সঃ।" নামমালায় গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

" জীবতিতু বংশ্যে তদপত্যং যুবা ,,
পাণিনির এই লিপি অনুসারে দাক্ষির জীবদ্দশায় সন্তান ভিন্ন যে দাক্ষেয় ও দাক্ষায়ণ নাম নিষ্পন্ন হয় না, সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ আচার্য্য গোল্ডষ্টুকরের দৃষ্টিতে তাহা পতিত হয় নাই। সেই জন্যই তিনি পাণিনি ও ব্যাডিকে তুল্য-কালিক বলিতে পারেন নাই এবং ঐভুলটি তাঁহার সকল সিদ্ধান্তের মূল শিথিল করিয়া রাখিয়াছে।

যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, পাণিনি অন্যূন সার্দ্ধদ্বি সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; নবনন্দের দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দকে তিনি জানিতেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা গান্ধার প্রদেশের শালাতুর গ্রামে বাস করিত, এবং তিনি স্বয়ং মগধাদি প্রদেশের কোনও একস্থানে বাস করিতেন। তিনি দক্ষ গোত্রের ও পাণিন্ উপাধি-প্রাপ্ত কোন এক বিখ্যাত বংশের সন্তান, তাঁহার মাতার নাম দাক্ষী এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যবাসী ব্যাডির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল এবং দেখা সাক্ষাৎও ছিল। ইহাঁর পিতার নাম ঠিক্ জ্ঞাত হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম দেবল। কোন্ দেবল তাহা জানা যায় না। ফল মহাভারতীয় ঋষি দেবল নহেন। ইনি ব্যাকরণাচার্য্যগণের শিরোভূষণ। এক্ষণে আচার্য্য গোল্ডষ্টুকরের মত সমালোচিত হইতেছে।

গোল্ডষ্টুকরের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৬০০বৎসরের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু নন্দের তুল্যকালিক, ন্যায়-ভাষ্যে পাণিনি সূত্র উদ্ধৃত হওয়াতে এই মতের মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে। এইরূপ অন্যান্য বহুবিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদিগের মতের অনৈক্য হওয়ায় আমারা দুঃখিত হইতেছি। কি করি, ঐতিহ্য ও যুক্তির বলে যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হয় তাহার অপমান করিতে পারি না। অতএব, সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ এবিষয়ে আমাদের প্রগল্ভতা মার্জনা করিবেন।

আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর কেবল মাত্র ব্যাকরণ সূত্রের কতকগুলি কথা লইয়া তদীয় কাল, দেশ, এবং তদানীন্তন গ্রন্থাবলীর যে সত্ত্বা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক। বৈয়াকরণিক সঙ্কেত কেবল প্রচলিত সাধুশব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ দেখিয়া, তাহার সাধুতা সপ্রমাণ করিয়া দেয় মাত্র। এতদ্ভিন্ন কোন ইতিহাস নির্ণয় করিয়া, দেয় না। প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগ ও সাধন-প্রণলী প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশেষ শব্দকে অর্থ বিশেষে ব্যবস্থাপনা করাই ব্যাকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু পারিভাষিক বা নিরূঢ় সঙ্কেতযুক্ত শব্দের উপর ব্যাকরণের কিছু মাত্র প্রভুতা নাই, সুতরাং ব্যাকরণের সহিত তাদৃশ শব্দের কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। ইহা সত্য কি অসত্য নিদর্শন দেখাইতেছি। পুরাণে একটি শব্দ আছে " পঞ্চাত্র "

"পঞ্চাম্ররোপী নরকং ন যাতি" যে পঞ্চাম্র রোপণ করে তাহার নরকে গতি হয় না। এই পঞ্চাম্র শব্দটির অর্থ পাণিনি বলিবেন, পাঁচটি আম্রবৃক্ষ, বস্তুতঃ তাহা নহে। নিম্ব, অশ্বত্থ, বট, জাতিপুষ্প, দাড়িম্ব, এই সকল বৃক্ষ একত্র রোপণ করিলে তৎসমুদায়কে পঞ্চাম্র বলে, ইহাতে আম্রের নাম গন্ধও নাই, অথচ ইহা পঞ্চাম্র হইল।

যদিও পঞ্চাম্র শব্দটির উৎপত্তি পাণিনির পরে হইয়া থাকে এমতও হয়, তথাপি তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যেরা বা বৈয়াকরণিকেরা তাহা ত্যাগ করিবেন কেন? ইহাতে বুঝিতে হইবে যে তাদৃশ শব্দের সমাবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই এবং তজ্জন্যই ব্যাকরণে তাদৃশ শব্দের বর্জন আছে।

আর একটি শব্দ আছে "ষোড়শী"। এই শব্দের অর্থ পাণিনি বলিবেন, ষোল সংখ্যার পূর্ত্তি। কাব্য লেখকেরা বলিয়াছেন "যুবতী" স্ত্রী। পুরাণে আছে, তীর্থস্থলে প্রদত্ত ঊনবিংশপিণ্ড, আবার বেদে বলে একটি যজ্ঞপাত্র অর্থাৎ সোমরস গ্রহণের পাত্র। এই ষোড়শী শব্দটি পাণিনি কি অন্য কোন ব্যাকরণের মতে যজ্ঞপাত্র বুঝা যায় না। ইহা পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলে ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বস্বধন সোমের পাত্র বিস্মৃত হইয়া ষোল সংখ্যার পূরণ মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন না!! কিন্তু পাঠকগণ, বলিয়া দিতেছি, ইহা পাণিনির চিরপরিচিত যজুর্ব্বেদের সহস্র স্থানে আছে। "অতি রাত্রে ষোড়শীং গৃহ্লাতি নাতিরাত্রে ষোড়শীং গৃহ্লাতি" ইত্যাদি। অতএব, কেবল মাত্র ব্যাকরণ সূত্রের দ্বারা কোন ইতিবৃত্তি নির্ণয় হইতে পারে না। যেমন একমাত্র ব্যাকরণের দ্বারা কোন ইতিহাস নির্ণয় হয় না সেই রূপ, এক শব্দকে দুই ব্যক্তি দুই অর্থে ব্যবহার কবিল বলিয়া সেই দুইজনের মধ্যে একটা লম্বমান কালনিবেশ করাও যায় না।

এইরূপ শিথিল মূলযুক্তির আশ্রয় লইয়া আচার্য্য গোল্‌ড্‌ষ্টুকর ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, উপনিষদ, আরণ্যক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদয় আর্ষ গ্রন্থকে পাণিনির পরভাবী বলিয়া লোকে বৃথা মোহ জন্মাইয়া দিয়াছেন। উল্লিখিত সমস্ত শব্দই পারিভাষিক। পারিভাষিক শব্দের দ্বারা যে ব্যাকরণের কাল নির্ণয় হয় না তাহা তিনি কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই।

পাণিনির একটি সূত্র আছে "অরণ্যান্ মনুষ্যে" মনুষ্য অভিধেয়ে "আরণ্যকঃ" এই পদ নিষ্পন্ন হইবে। যথা— আরণ্যকো মনুষ্যঃ অর্থাৎ অরণ্যবাসী মনুষ্য। ইহা দেখিয়াই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পাণিনির পূর্ব্বে বা সময়ে আরণ্যক নামক বেদাংশ ছিল না, কিন্তু উহা মনুপ্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের সময়ে ছিল? ইহাতে তাঁহার সিদ্ধান্তের ভ্রম হইয়াছে।

ন্যায় দর্শন ও সাঙ্খ্যদর্শন ও পারিভা-

ষিক শব্দ। এই পরিভাষা গুলি শিষ্যসম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণ আমরা যাহাকে যোগদর্শন ও পাতঞ্জলদর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম "সাঙ্খ্যপ্রবচন"। আমরা যাহাকে উত্তর মীমাংসা ও বেদান্তদর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম "উত্তরকাণ্ড"। এইরূপ উপনিষদ শব্দ সাঙ্কেতিক। পাণিনি মুনি ব্যাস ও তাঁহার ক্রমানুসারে নিম্নবর্ত্তী পাঁচজন শিষ্যকে অর্থাৎ শিষ্য প্রশিষ্য প্রভৃতিকে চিনিতেন, যুধিষ্ঠিরাদি রাজন্যবর্গকে চিনিতেন, ইহা তদীয় সূত্রে প্রকাশ আছে। ন্যায়, সাঙ্খ্য, আরণ্যক প্রভৃতি পাণিনির জ্ঞাত ছিলনা, কিন্তু তাঁহার অনেক পুর্ব্ববর্ত্তী উল্লিখিত ব্যক্তিদের জ্ঞাত ছিল? ইহা কিরূপ ... বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করুন। উল্লিখিত ব্যক্তিরা যে উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় জ্ঞাত ছিলেন, তাহা সকল আর্ষ গ্রন্থেই প্রকাশ আছে। একটি নহে, দুইটি নহে, বহু পরিমাণ বচন আছে। একদেশে নহে, দুইদেশে নহে, সকল দেশের পুস্তকেই তুল্য পাঠ আছে। অতএব সেই শ্লোকগুলি আধুনিক বলাও অল্প সাহসের কার্য্য নহে।

"নির্ব্বাণোঽবাতে" "আশ্চর্য্যমনিত্যে", এই সকল সূত্র দেখিয়া এবং ইহার "অদ্ভুত ইতিবক্তব্যম্" ইত্যাদি বৃত্তি ও ভাষ্য দেখিয়া গোল্ডস্টুকর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির পূর্ব্বে নির্ব্বাণ শব্দের মুক্তিবাচকতা দূরে থাকুক, সামান্য নিবিয়া যাওয়া অর্থও ছিলনা। আশ্চর্য্য শব্দেরও অদ্ভুতার্থদ্যোতকতাছিলনা। আমরা এবিষয়ে তর্ক করিতে ইচ্ছা করিব না; যেহেতু তাহা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলি যে তিনি কি জন্য "পানংদেশে" এই সূত্র লইয়া বিচার করেন নাই? তিনি, পান শব্দে তরল খাদ্য বুঝাইত কিনা তাহা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই বলিয়া, ঐ সূত্রটির আর উল্লেখ করেন নাই। পাঠকগণ কি "পানং দেশে" সূত্রআছে বলিয়া বলিতে পারেন যে পাণিনির পূর্ব্বে বা পাণিনির সময়ে পান শব্দে দেশ বা স্থান বুঝাইত—তরলখাদ্য বুঝাইত না? ফলতঃ মহামহোপাধ্যায় গোল্ডস্টুকর এই সকল স্থানে যে যে তর্ক উদ্ভাবন করিয়াছেন সমস্তই অমূলক। কেননা, পাণিনি সূত্রস্থান মাত্র রচনা করিয়া ছিলেন, বৃত্তি কি ভাষ্য তাঁহার নহে। অতএব অন্যের প্রদত্ত উদাহরণ দ্বারা পাণিনির সাময়িক ব্যবহার নির্ণীত হইতে পারেনা।

আর একটি গুরুতর বিচার উত্থাপিত হইতেছে। পণ্ডিতবর গোল্ডস্টুকর পাণিনি সূত্রের মধ্যে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ দেখিতে পান নাই বলিয়া অনুমান করিয়াছেন যে পাণিনি অথর্ব্ববেদ অবগত ছিলেন না। অথর্ব্ববেদটি তাঁহার পর রচিত হইয়াছে। এইরূপ বাক্য ব্যক্ত করাতে তাঁহার বিলক্ষণ ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন—"আথার্বণিকস্যেক লোপশ্চ" (৪।৩)

" কপি বোধাদাঙ্গিরসে " " দাণ্ডিনায়ন হাস্তিনায়নথর্ব্বর্ণিক—" (৬ । ৪) এই সকল সূত্রে যে অথর্ব্ব-শব্দ আছে এবং আঙ্গিরস শব্দ আছে, তাহার অর্থ তৎকালে কি ছিল ? আমরা দেখিতেছি অথর্ব্ব শব্দের চতুর্থবেদবোধকভিন্ন অন্য অর্থ ছিল না । অথর্ব্ব শব্দের যদি চতুর্থ বেদ কি তৎপ্রণেতা মুনি ভিন্ন অন্য অর্থ থাকিত,তবে তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই কেন ? এবিষয়ে তাঁহার অনুমান এই যে পাণিনি যখন অথর্ব্ববেদ বা অথর্ব্বাঙ্গিরস এইরূপ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই তখন তিনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন না । তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের এই অনুমানকৌশল দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি । এই পাণিনি কেবল " ছন্দসি " " ছন্দসি " বলিয়া গিয়াছেন । " দৃষ্টংসায় " বলিয়া গিয়াছেন । বেদ বা সামবেদ, যজুর্বেদ, ঋগ্বেদ, কি কোথাও এরূপ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই । অতএব পাণিনির সময়ে যদি কোন বেদই না থাকে তবে অথর্ব্ব বেদও থাকিবে না ইহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই ।

ঋগ্বেদে যে যে স্থানে অথর্ব্বন্ শব্দ আছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । প্রথমতঃ ৬, ১৬, ১৪ । পুনশ্চ ১০, ১৮, ২ তৎপরে ১০, ২১ ৫ । ৮, ৯৭ । পুনশ্চ ১০ । ৮৭ । ১২ ।—৯ । ১১ । ২ । পুনশ্চ ১০, ১৪, ৬ । ১ । ৮০ । ১৬ । ৮৩ । ৫ । ৬ । ১৬ । ১৩ । পুনরায় । ১০ । ১২০ । ৯ । ১ । ১১২ । ১০ । ঋগ্বেদ সংহিতা ।

অনেকের ভ্রম আছে অথর্ব্বাঙ্গিরস মুনি অথর্ববেদের রচক । কিন্তু অথর্ব্বাঙ্গিরস ব্যক্তিটি কে ? তাহা অধিকাংশ ব্যক্তি জানেনন। । মহাব্যাস উদ্যোগপর্ব্বে ইহাঁর পরিচয় দিয়াছেন । ইনি বৃহস্পতি । দেবতাদিগের গুরু এবং অঙ্গিরা ঋষির পুত্র । পৌরাণিক মতে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে অথর্ব্বাঙ্গিরস উপাধি প্রদান করেন, কারণ ইনি অথর্ব্ব-বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রের স্তুতি করিয়াছিলেন এবং এই বেদে ইহাঁর বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল ।

পাণিনিসূত্রে যাস্কের উল্লেখ থাকায় আচার্য্য গোল্‌ডস্টুকর তাঁহাকে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । এইক্ষণে সেই যাস্কপ্রণীত নিরুক্ত মধ্যে অথর্ব্বাঙ্গিরস মুনির অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে । ইত্যাদি ।

এইরূপ পণ্ডিতবর গোল্‌ডস্টুকর যে সিদ্ধান্তে পাণিনিবিচার করিয়াছেন,তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে না । কিন্তু তিনি যে পাণিনি সম্বন্ধে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছি । এই গ্রন্থ তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্বরূপ চিরকাল সাহিত্য সংসার উজ্জ্বল করিয়া থাকিবে ।

আমরা পাণিনি সম্বন্ধে অন্য স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিব । শ্রীর'

উকীলের প্রজানীতিসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা।

জ্যৈষ্ঠমাসের বান্ধবে ভারতের প্রজানীতি-নির্ণক যে প্রবন্ধ প্রকটিত হয়, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে ক্ষুব্ধ, কেহ বিরক্ত, কেহ বা ক্রোধান্বিত হইয়াছেন। বাস্তবিক উহাতে সত্য মিথ্যা যে প্রকারে জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রবন্ধের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় এবং লেখকের মতনিশ্চয় নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, লেখক শ্লেষ-চতুর; এবং মনোদুঃখে দগ্ধ-হৃদয় হইয়া গরলরূপে অমৃত উদ্গীর্ণ করিয়াছেন। আমাদের এ প্রকার বিশ্বাস করিবার কারণ আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

প্রবন্ধলেখক 'উকীল' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন; তাহাতেই যথেষ্ট ঈঙ্গিত করা হইয়াছে যে, তাঁহার প্রত্যেক কথাই বিতর্ক করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, প্রতিচিত্রের ওকালতীর আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিতে হইবে। বস্তুতঃ সে ভাবে দৃষ্টি করিলে বিতর্কাধীন প্রবন্ধলেখকের হৃদয়তা, স্বদেশবৎসলতা, এবং কর্ত্তব্যসত্তার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। [আ]মরা যাহা মনে করিয়াছি, লেখ[কের] [য]দ্য সত্যই সেইরূপ অভিপ্রায় [হয়, তবে] [তাহা]র তাঁহার লেখনভঙ্গী অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। দিনকাল বিবেচনা করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করাতেই বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশল-বত্তা প্রদর্শিত হয়।

দুর্ব্বলপক্ষ প্রবলরূপে প্রতীয়মান করিতে হইলে যে পন্থা অবলম্বন করিতে হয়, আমাদের উকীল তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন। তাহার পর, যাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হইতেছে, তাহার মন ভুলাইবার জন্য যে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, উকীল তাহাও করিয়াছেন। তথাপি যাহাদের বুদ্ধি জড়পদার্থ নহে, যাহারা সর্ব্ববিষয়ের অন্তস্তলপ্রবেশী, তাহাদের চক্ষে উকীল ধূলা দিতে পারেন নাই, কেহই পারে না, কারণ পারিবার উপায় নাই। প্রকৃতপক্ষে ভাবিয়া দেখিতে গেলে উকীল ব্যবসায়ানুচিত কার্য্য করিয়াছেন বলিলেও বলা যায়; যাহার উকীল তাহারই ক্ষতি করিয়াছেন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তবে নথীতে যে বৃত্তান্ত সকল সপ্রমাণ, তাহার ব্যতিক্রম বা বিপরীত গমন করিবার অধিকার তাঁহার নাই বলিয়াই, বোধ হয়, তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া মু[দ্রা]ণশাসনীব্যবস্থা

অনুচিত প্রবর্ত্তন নহে, এবং আবশ্যক, উকীল এই প্রতিজ্ঞার উপপত্তি সাধন জন্য যে কএকটি পদার্থে আমাদিগকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলিয়াছেন, তাহা এই—

"প্রথমতঃ, ভারতবর্ষ কখনও এক সাম্রাজ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ নাই। ইংরেজ যে সূত্র অবলম্বন করিয়া রাজ্য করিতেছেন, তাহাতে ভারতের একতা সম্পাদন সম্ভবপর, একতা সংসাধিত হইলে মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের রাজত্বে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিলক্ষণ রূপ হইয়াছে। এখনও ভারতবর্ষে যে সকল স্বাধীন উপরাজ্য আছে, সেখানকার প্রজাদের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বিশেষরূপে ইহা উপলব্ধ হইবে।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এক্ষণ যেরূপ প্রসার, পূর্ব্বে এমন ছিল না।

চতুর্থতঃ রাজনীতি সম্পর্কে আমরা এখনও বালক, আমাদের রাজনৈতিক পুষ্টিসাধন আবশ্যক, এবং ইংরেজের দ্বারা তাহা সাধিত হইতেছে। সুতরাং ইংরেজের অধীনতা আমাদের বাঞ্ছনীয়।"

তাহার পরেই উকীল বলিতেছেন, ইংরেজ আমাদের রাজনীতি বিষয়ের গুরু,—ইংরেজ দেবতা! এবং ইহা হইতে যে কথা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা উকীলের ভাষাতেই ব্যক্ত হউক;—

অতএব, ইংরেজ যখন আমাদের গুরুস্থানীয়, ভারতবর্ষে ইংরেজের স্থায়িত্ব যখন সর্ব্বথা আমাদের কাম্য, তখন যাহাতে আমাদের ভক্তিভাব অবিচলিত থাকিতে পারে, আমাদের প্রেমভাব দিন দিন প্রবলতর হয়, আমাদের মাধুর্য্য-মিশ্রিত মমতার ভাব ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তদ্‌বিষয়ে সর্ব্বথা আমাদের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। সকল লোকের বিদ্যা বুদ্ধি কখনই সমান হইতে পারে না; সেই জন্য সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল বলিয়া যাহারা পরিচিত সেই উপরিতন দশের কথায় নিম্নতর স্তরের ব্যক্তি-বৃন্দ বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়া কার্য্য করে। সুতরাং যাহাতে রাজপুরুষদিগের সাধু এবং অকৃত্রিম সারল্যপূর্ণ অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দেহ আরোপিত হয়, তাহা করা সেই দশের পক্ষে মহাপাপ, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি এবং অনিষ্টের সম্ভাবনা।"

পরিশেষে উকীল সিদ্ধান্ত করিলেন যে "যদি প্রজাবর্গকে উত্তেজিত, ভক্তিশূন্য এবং বিপ্লব-প্রিয় করিবার জন্য ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক পন্থা প্রদর্শন করি, তবে ইংরেজের হস্তক্ষেপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অঙ্কুরেই উপদ্রবের বিনাশ সাধন ইংরেজের একান্তই উচিত। না করিলে রাজধর্ম্মের অপলাপ হইবে, আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে।"

যিনি রাজ্যেশ্বর তিনি রাজ্যের শান্তি রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, 'শান্তি র তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম—এই সামান্য

সংবাদিত তত্ত্বের সংস্থাপন জন্য চতুর উকীল এত বাগাড়ম্বর করিতেছেন, ইহা মনে হইলে হাস্য-সংবরণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু মুদ্রণশাসনীব্যবহার-সমর্থন পক্ষে ইহার অধিক কিছু বলিবারও নাই। প্রবন্ধলেখক উকীল সাজিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন, যে কটূক্তি কর, কটাক্ষ কর, যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাও কিন্তু লম্ফ ঝম্পের অবসান এই খানেই হইবে। সেই জন্য ইহার পরেই 'উকীল' নীরব, আর সে তর্কের গাঁথনি নাই, বিচার-প্রবৃত্তির বেগ-শালীতা নাই। ফল স্থির হইল যে, যে কথার জন্য ওকালতী, তাহা প্রতিপন্ন হইবার নহে। "জোর যার, মুলুক তার" এই নীতিই মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার একমাত্র অবলম্বন। যদি তাহা না হইত, তবে কথা বার্ত্তা না কহিয়া, প্রমাণ প্রয়োগ না দেখাইয়া 'উকীল' সহসা গর্জ্জন করিয়া বলিতে পারিতেন না যে "ইহার সূত্র লইযা বিবাদ করিবার অধিকার নাই, গণ্ডগোল করা অন্যায়।"

কেন? শান্তি রক্ষাই কি ব্যবস্থার সূত্র? তবে দণ্ডবিধি আছে কেন? বষ্টি সহস্র বিলাতী সঙ্গিন ভারতে ঝক্ মক্ করিতেছে কেন? রাজ্যের শস্য ধ্বংস করিয়া পঙ্গপালের মত এত লাল পাগড়ি, নীলজামা ভারতের বুকের উপর অহোরাত্র দাপট করিয়া বেড়াইতেছে কেন? ভারতবাসীর হৃদয়-শোষিত শোণিতকে রক্ততরূপে পরিণত করিয়া এই অযুত রাজকর্ম্মচারী আর অকর্ম্মচারী কি কেবল বল্মীক স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছেন?

ফলকথা, মুদ্রণশাসনীব্যবস্থার সূত্র শান্তি রক্ষা নহে, ইহার অপর সূত্র আছে। ন্যায়ভীতি, স্বপ্রবর্ত্তিত পক্ষপাতশূন্য বিচারপ্রণালীর মূলোচ্ছেদ, এই ব্যবস্থার মূল সূত্র। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ চালনাই এ ব্যবস্থার প্রাণ। অপ্রিয় প্রকৃত কথা শুনিবার অনিচ্ছাই এ ব্যবস্থার নিদান।

কিন্তু উকীল একথা স্বীকার করিতে পারেন না, সেই জন্য এস্থলে নীরব। এই আত্ম-ঘাতক তর্ক পরিবর্জ্জন না করিলে ওকালতী চলে না, সেই জন্য অন্তঃশূন্য এক হুঙ্কার ছাড়িয়া উকীলকে এই স্থল উল্লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে।

তথাপি শ্লেষবিশারদ প্রবন্ধলেখক উকীলের মুখে যে কথা স্বীকার করাইয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহাই পর্য্যাপ্ত। উকীলকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, যে "ব্যবস্থার সম্পাদন যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, তাহার কোনও অংশে দোষ নাই, অভাব নাই বা বাহুল্য নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না।" যাঁহারা এ ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট, বিরক্ত বা ভীত, তাঁহারা ইহার অধিক কি বলেন? বঙ্গবাসী কাঁদিবে, কিন্তু "মা গো!" বলিয়া কাঁদিতে পাইবে না;—ভারতবর্ষের ভাষার প্রতি এই নিষ্ঠুরাচরণ, মুদ্রণ শাসনী ব্যবস্থার দোষ। বর্ণ-ভেদ জাতি-ভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ মনে না করিয়া ইংরেজ

বিচারক অপক্ষপাতে ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধরিয়া রহিয়াছেন; সে বিচারক ইংরেজ রাজেরই নিয়োজিত, কিন্তু ভারতবর্ষের মুদ্রাকরের বিচার তিনি করিতে পাইবেন না—ব্যবস্থার এই স্থলে অভাব। রাজার বুকে বসিয়া রাজার বাড়ীতে রাজার স্বজাতি ভারতের জন্য মুদ্রিতাক্ষরে অশ্রুপাত করিলেন, ভারতের ক্ষুদ্রতম পুস্তক-বিক্রেতা সেই লিপি আনাইয়া বিপণির গৌরব বাড়াইল, মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থা তাহাকে দণ্ড দিবে—ব্যবস্থার এই বাহুল্য।

উকীল স্পষ্ট করিয়া, এ কথা গুলি বলিলেন না, বলিতে পারিলেন না। বলিতে হইলে তাঁহাকে এই কথাই বলিতে হইত। প্রবন্ধ-লেখক এস্থলে উকীলকে এই কথাগুলি বলিবার জন্য উৎপীড়ন করেন নাই, কিন্তু যাহা বলিতে হইত তাহার আভাস দিয়াছেন। ইহার অপেক্ষা কঠোরতর বা অধিকতর অন্তর্ভেদী শ্লেষ আর কি হইতে পারে?

ব্যবস্থার পক্ষ সমর্থন জন্য উকীলকে নথীর বিপরীত প্রসঙ্গ করিতে হইয়াছে, ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষকে উপলক্ষ করিয়া আজি কালি রাজনীতিসঙ্কট উপস্থিত, এই এক অতিরিক্ত কথা ব্যবস্থার হেতুবাদের পোষক বলিতে হইয়াছে। কিন্তু ব্যবস্থার প্রবর্ত্তয়িতা একথার উল্লেখ করেন না, সুতরাং আমরা ইহার যৌক্তিকতার বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য নহি। তবে সংক্ষেপে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি,যে ১৮৫৭। ৫৮ অব্দের সহিত তুলনা করিলে, বর্ত্তমান কালকে শান্তি এবং নিশ্চিন্ততার মূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত করা যায়। মনে রাখিতে হইবে যে নীরবে, নির্ব্বিরোধে, নিরুপদ্রবে বরদার গায়েকবাড়ের রাজ্যচ্যুতি এবং কারাদণ্ড অধিক দিনের কথা নহে, মনে রাখিতে হইবে যে, যে নিজাম বেরার রাজ্য পুনঃ-প্রাপ্তির জন্য ইংরেজরাজের সঙ্গে বহুদিন ধরিয়া বচসা করিয়া আসিতেছেন, তিনিই আবার ইউরোপে ইংরেজের সাহায্য কামনায় নিজ সৈন্য সামন্ত দিবার জন্য ব্যাগ্র; মনে রাখিতে হইবে—না, ভারতেশ্বরীর জয় হউক! তাঁহার প্রতিনিধি এবং মন্ত্রিবর্গ যে কথার উল্লেখ করেন নাই, তাহার প্রতিবাদ জন্য কেন সময় নষ্ট করিব?

তথাপি আমাদের বোধ হইতেছে যে প্রবন্ধলেখক একথার উত্থাপন করিয়া ইংরেজরাজপুরুষগণের উপর কঠোর ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার লিখনভঙ্গীতে মনে হয় যেন রাজপুরুষগণ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন জন্য যে সকল কারণে চালিত হইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিতে তাঁহাদের সাহস নাই, অথবা সত্যের প্রতি তাঁহাদের আজি কালি অশ্রদ্ধা বা অপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। ভারতবর্ষের ইংরেজ এতাদৃশ হীনভাবাপন্ন হইয়াছেন,ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করি না। নথীতে যাহা নাই,উকীলের সে কথা আমরা গ্রাহ্য করিলাম না।

এখন পূর্ব্বকথার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখা যাইতেছে যে, উকীল যে সকল প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা মানিয়া লইলেও মূল প্রতিজ্ঞার পূরণ হয় না ; মূল প্রতিজ্ঞার সহিত তাহাদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কিছুমাত্র নাই এবং এই সম্বন্ধ সংস্থাপনজন্য উকীলও প্রয়াস পান নাই। প্রবন্ধলেখকের চতুরতা—বুঝিবার বস্তু, আস্বাদনেব বস্তু, সরস এবং সুমিষ্ট। দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইয়া দিই।

১ম ;—ভারতবর্ষ কখনও এক সাম্রাজ্য ছিলনা, সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ নাই। যদি ইহার পরেই বলা যায়—অতএব মুদ্রণশাসনীব্যবস্থা আবশ্যক, তাহা হইলে বক্তাকে বাতুল বলিতে কেহই সঙ্কোচ করিবেনা।

২য় ;—ইংরেজরাজ্যে আমাদের বিলক্ষণ উন্নতি—অতএব ব্যবস্থার প্রয়োজন। একথা বলিলে হাসিতেও লজ্জা বোধ হয়।

৩ ;—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার এক্ষণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উত্তম কথা, কিন্তু তাই বলিয়া কি মুদ্রণশাসন ?

৪র্থ ;—রাজনীতি বিষয়ে আমরা বালক, ইংরেজ আমাদের গুরু, ইংরেজ দেবতা। তাহাতেই কোন্ বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থার "মহীপালের গীত" ভাব অপসারিত হইতেছে ? বয়োবৃদ্ধি সহকারে কি বালকত্বারও বৃদ্ধি হয় ? আজি চল্লিশ বৎসর আমরা মুদ্রণ-স্বাধীনতা পাইয়াছি ; এ চল্লিশ বৎসর কি আমাদের বয়স বাড়ে নাই, না কি বয়স কমিয়াছে ? আর "দেবতার মত" ইংরেজ এতকাল আমাদের গুরুগিরি করিয়া যদি এই ফল ফলাইয়া থাকেন, তবে সে গুরুর কলঙ্কের কি সীমা আছে ? তাহাহইলে সে গুরুকেও ধিক্ ! আমাদের মত শিষ্যকে শতবার ধিক্ ! যদি সপাদ শত বৎসর এহেন গুরুর চরণোপান্তে বসিয়া শেষ কালের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি হইয়া থাকে, তবে উচিত যে, হয় এই গুরুমহাশয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া আপন বাস্তুভিটায় বসিয়া মুদিখানা খুলিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা দূর করেন ;—নয় এই শিষ্য বৃন্দ স্ব স্ব গলদেশে রজ্জুবন্ধন পূর্ব্বক সাভিনিবেশচিত্তে বিচালি চর্ব্বন আরম্ভ করেন। প্রবন্ধলেখক রসিক, আমরাও কম নহি। কিন্তু লোকে সহজে বুঝেনা, এ ক্ষোভ আমাদের উভয়েরই রহিয়া গেল।

যাহারা স্বাধীনতা প্রয়াসী হইয়া ভারতবর্ষে বিদ্রোহভাব উত্তেজিত করে, তাহাদেরই জন্য মুদ্রণ-ব্যবস্থা বিধি-বদ্ধ হইয়াছে, উকীল অন্তঃসলিলা নদীর মত এই কথা তাহার প্রবন্ধের ভিতরে ভিতরে অর্দ্ধ আবরিত রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তিনটী কথা উত্থাপিত হইতেছে।

১ম ;—বিদ্রোহভাবের উত্তেজনকারী কেহ আছে কিনা ? যদি থাকে তবে কেন আছে ?

২য়;—স্বাধীনতাপ্রিয়তার সহিত রাজভক্তির নিত্য বৈরভাব কি না?

৩য়;—মুদ্রণব্যবস্থার বিদ্রোহভাবের দমন সম্ভবপর কি না?

ভারতীয় প্রজার অন্তরে বিদ্রোহ-ভাবের অস্তিত্ব আমরা একেবারে অস্বীকার করি। ভারতের কৃষক, বণিক, ভূ-স্বামী—যাহাদিগকে লইয়া ভারতবর্ষ,—তাহারা ইংরেজ-রাজ্যের স্থায়িত্ব-কামনা ভিন্ন অন্য কিছু জানে না। উকীলও একথার সূচনা দিয়াছেন; তবে এবিদ্রোহভাবের জন্য কোথায় অন্বেষণ করিতে হইবে? উকীল ইহার উত্তর দেন নাই, উত্তর দিতে অক্ষম।

উকীল এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই বটে, কিন্তু "অসন্তুষ্ট" আখ্যাদিয়া এক শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে তাহাদেরই স্কন্ধে দোষারোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি উকীল যে সমুদয় বিশেষণের দ্বারা ইহাদিগকে পরিচায়িত করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাদের গৌরবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; প্রবন্ধলেখক এই স্থলেই শ্লেষ-দক্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

উকীল স্বয়ং বলিতেছেন,—"পাশ্চাত্য শিক্ষায় যাহাদের হৃদয়-বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, যাঁহাদের চিত্তবলের বিকাশ হইয়াছে, জন্মভূমি ও মাতৃভাষার নামে যাঁহাদের অন্তঃকরণ তরঙ্গায়িত হয়—তাঁহারাই—"অসন্তুষ্ট"। ইহাঁদের "সংখ্যা অল্প নয়" তাহাও উকীল স্বীকার করিতেছেন। ইহাঁদের "অসন্তোষের" কারণ নির্দ্দেশ করিতেও উকীল সংকোচ করেন নাই; কারণ "তাঁহারা ভারতবর্ষের দুঃখে নিরন্তর ব্যথিত। ভারতবর্ষে বিজাতীয়, বিদেশীয় রাজা আধিপত্য করিতেছে, ভারতবর্ষের রাজস্বে বিদেশীয় দেহ পুষ্ট হইতেছে, ভারতবর্ষে বিজাতীয় রীতিনীতি, ভারতবাসীর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবর্ত্তিত হইতেছে"। তদুপরি—ভারতবর্ষের দুঃখের কাহিনী "ঈর্ষা, দাম্ভিকতা বা অসদভিসন্ধি-বিজৃম্ভিত নহে।"

এইবার সারসংগ্রহ করিয়া দেখ, যাহারা স্বদেশ-বৎসল, যাহারা সুশিক্ষিত, যাহারা সহৃদয়, তাহারাই উকীলের মতে অসন্তুষ্ট; অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রদর্শী, যাহারা ইতিহাসের অনুশীলন করে, যাহারা কাল-ধর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম, তাহারাই অসন্তুষ্ট! ভয়ঙ্কর কথা! আমরা ইহার অনুমোদন করি না, কারণ তাহাহইলে রাজার দোষ আছে, এবং রাজার স্বকার্য্যে দোষ প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই বলিতে হইবে। আমাদের শঙ্কা হইতেছে, প্রবন্ধলেখক এই স্থলে মর্ম্ম-দুঃখে অধীর হইয়া আত্ম-বিস্মৃতির পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি বলিয়া রাখি, যাহারা রাজার কার্য্যে ত্রুটি দেখিয়া ব্যথিত হয়, আর সেই ত্রুটি রাজ-গোচরে জ্ঞাপন করে, তাহাদের রাজ-ভক্তি নিতান্তই প্রবল; নহিলে এত্রুটি তাহারা দেখাইয়া দিত না, ব্রণ লুকাইয়া

রাখিত; যত দিনে অভ্যন্তর দূরিত হইয়া অঙ্গচ্ছেদের প্রয়োজন না উপস্থিত হইত, ততদিন নীরব থাকিত। ইহারা কখনই রাজদ্রোহী হইবার ব্যক্তি নহে; ইহারা কাহাকেও রাজদ্রোহিতা শিখাইবে না।

তথাপি মনে করা যাউক যে, ইহারা ভারতীয় প্রজাপুঞ্জকে বিদ্রোহী এবং বিপ্লবপ্রিয় করিবার জন্য যত্ন করিতেছে। সে যত্ন কি মুদ্রিতাক্ষরে রাজার নয়নোপরি করিবে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিতে পারে? তবে একথা লইয়া মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা কেন? দিনে ডাকাইতি করা যাহাদের অভ্যাস, তাহারাই গৃহস্থকে কখন কখন পত্র লিখিয়া জানায় বটে। পরাধীনতাই আমাদের অভ্যস্ত; অপহৃত স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতে আমরা কখনও শিখি নাই; কখনও উদ্যোগ করি নাই, কখন চেষ্টাও করি নাই। তবে এ "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" কেন?

স্বাধীনতা ভালবাসিলেই যে কাহাকেও রাজদ্রোহী হইতে হইবে, ইহার অর্থ নাই, " উকীলই ইহার হেতুবাদ করিয়াছেন, এবং সুন্দর দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন। মোটামুটি বলা যায়, ইউরোপ এবং আমেরিকা স্বাধীন; অথচ তথাকার লোক স্বদেশের রাজার অধীন। উকীলের পরিভাষা অনুসারেই, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অধীনতার রূপান্তর মাত্র। ইংরেজ-রাজ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; এবং ব্যবস্থা-প্রণয়ন, ও আয় ব্যয়ের বিধানাদি বিষয়েও ভারতবাসী ক্রমে ক্রমে অধিকতর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং রাজপ্রসাদানুসারেই ভারতবাসী স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। স্বাধীনতা কামনা রাজার অনুমোদিত এবং রাজার অনুগ্রহে পরিপুষ্ট হইতেছে। তবে কেন ভারতবর্ষের প্রজাবৃন্দ স্বাধীনতা ভালবাসিবে না? এতদ্ভিন্ন ইংরেজরাজ আমাদিগকে নিত্য নিত্য বলিতেছেন, তোমরা স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য হইলেই আমরা তাহা প্রত্যর্পণ করিব, ভারতের উপকার-জন্যই ভারতে আমরা আসিয়াছি। ইহাতে এই বুঝা যায় যে, স্বাধীনতার দিকে দৃষ্টি না রাখিলেই বরং ভারতবাসী প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবে, রাজেচ্ছার প্রতীপ-গমন চেষ্টার দোষে দোষী হইবে। এত যে অমূল্য শিক্ষা ইংরেজ আমাদিগকে দিতেছেন, ইহা কি কেবল আমাদিগকে দাসত্ব এবং পশুত্বে অবনীত করিবার জন্য? উকীল বলেন, তাহা নহে; আমরাও বলি তাহা কখনই নহে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে আমাদের চরমলক্ষ্য হওয়া উচিত, তাহা যেমন আমাদের রাজার অভিপ্রেত, তেমনি উকীলেরও বাঞ্ছনীয়। ভারতের একতা যে অভিলষিতব্য, উকীল তাহা একাধিকবার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; সে একতার পরিণামে মঙ্গল হইবে, উকীল তাহাও বলিয়াছেন। সে মঙ্গল যদি স্বা-

ধীনতা না হয়, তবে কি ? মুদ্রণগুণে যদি স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তবে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা যে কেবল নিষ্প্রয়োজন, তাহা নহে, প্রত্যুত, নিতান্ত অব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া তিরস্করণীয়।

প্রসঙ্গাধীন ব্যবস্থার দ্বারা বিদ্রোহভাবের দমন যে অসাধ্য এবং অসম্ভব, ইহা বলাই বাহুল্য। যদি প্রকৃত পক্ষে ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধাচরণ করা কাহারও অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে মুদ্রিতাক্ষরের আশ্রয় গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে আদৌ অতিযত্নে তাহা পরিবর্জ্জন করিবে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহবিবর্ত হিন্দুপেট্রিয়ট্ পত্রে প্রবন্ধ প্রচার করে নাই, এইরূপ শুনা আছে। চর্ব্বিত চর্ব্বণে প্রবৃত্তি থাকিলে, এই স্থলে বলিতাম যে ভারতবাসীর হৃদয়ে সত্য সত্যই যদি বিদ্রোহ-প্রবৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে সংবাদ পত্রাদির প্রচারে অপসারিত হইবারই কথা। বাষ্প-যন্ত্রের রক্ষণ-রন্ধ্র নিত্য উপকারই করিয়া থাকে ; তাহাতে অনিষ্ট হয় না।

অতএব, উকীলের কথা যথাবৎ বিন্যাস করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইতেছে যে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা সমর্থন করিবার চেষ্টা বৃথা, সে চেষ্টা কৃতকার্য্য হইবার নহে। ইহাও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা গর্হিত নহে, বরং ইংরেজরাজ সর্ব্বথা তাহার আনুকূল্য করিতেছেন। তবে এই সৎপ্রবৃত্তির সুপ্রয়োগ এবং পুষ্টি সাধন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা একবার দেখা যাউক।

উকীল যথার্থই বলিয়াছেন, যে ইংরেজ আমাদের গুরু। সাত শত বৎসর স্বার্থপর দস্যুর অধীনে থাকিয়া আমরা যে প্রকারে দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি, এই গুরুর অনুগ্রহে এখন আমরা তাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি। নিস্বার্থ ইংরেজরাজের কৃপাবলে মহাবেগে আমরা উন্নতিপথে সঞ্চালিত হইতেছি। প্রগাঢ় অন্ধকার হইতে এখন আমরা তীব্র আলোকে আনীত হইয়াছি, এখন বিস্ময়ে, শুদ্ধভাবে, সংকুচিত নেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, এবং পূর্ব্বতন দুর্দ্দশার স্বরূপ চিন্তা করিতেছি। এই মহোপকারের জন্য, জন্ম জন্ম আমরা ইংরেজসমীপে কৃতজ্ঞ রহিব।

অধিকন্তু ইংরেজ আমাদিগকে এক্ষণ একপ অবস্থায় উপস্থাপিত করিয়াছেন, যে এখন আমরা মার্শমেনের কথায় ভুলিয়া তদীয় গ্রন্থকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করি না। অতিপূর্ব্বে আমরা কি ছিলাম, স্বচক্ষে তাহা দেখিতে পাই ; এখন সামান্যা "সাধারণী" ও আমাদিগকে অশোকের জয়স্তম্ভ দেখাইয়া দেয়, প্রাচীন তাপস-কুলের আশ্রমে—আমাদিগকে লইয়া যায়, এবং তীর্থস্থলের মহিমা গান করিয়া, আর্য্যসন্তানের চিরন্তন সম্বন্ধ—একধর্ম্মতা, একপ্রাণতা মনে করিয়া, দেয়। উকীল এই সত্যের পথাবরোধ করিতেছিলেন, নহিলে তাঁহার ওকালতী

চলে না। কিন্তু ইংরেজ-গুরুর প্রসাদে আমরা তত্ত্বানুসন্ধান করিতে শিখিয়াছি, তত্ত্ব জানিয়াছি। আর আমরা বাক্‌ছলে ভুলি না। ইংরেজরাজ আজিও মন্বাদি ঋষির সম্মান রক্ষা করিয়া, আর্য্য জাতির একতা প্রতি মুহুর্ত্তে আমাদিগের হৃদয়ে জাগরুক করিয়া দিতেছেন। বাস্তবিক ভারতবর্ষের আদিম সভ্যতা, স্বাধীনতা—এবং উন্নতাবস্থার চিত্র নিয়ত আমাদের নয়ন-সমক্ষে না ধরিলে, আমরা এত সত্বর অমূল্য গুরূপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না, ইংরেজ-বাঞ্ছিত আমাদের স্বাধীনতা প্রবৃত্তির পুষ্টি সাধন হইত না।

এ সমুদয়ই উকীল আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। উকীলের প্রজানীতিকে আমরা রত্নাকর বলিয়া অভিহিত করিব। খুঁজিলেই ইহাতে রত্ন পাওয়া যাইবে। ইহাতে উত্তাল-তরঙ্গ আছে, বাড়বানলের শঙ্কা আছে, কুম্ভীর হাঙ্গরের ভয় আছে,—সত্য; তথাপি ইহা—রত্নাকর। জল দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। মন্থন-দোষে ইহাতে গরল উঠিতে পারে, কিন্তু অমৃতও ইহাতে পাওয়া যায়।

আর প্রস্তাব বাহুল্য করিব না; উকীলকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা এই স্থলে ক্ষান্ত হইব।

বঙ্গবিধবা।

(জ্ঞানদাসের ছন্দানুকৃতি)

১

সখিরে কি কব মনের দুখ;
কি সুধাও সই কি কহিব তোরে,
ভাবিতে বিদরে বুক।
(সখিরে) বিধাতা করিলা জনম দুখিনী,
যুবতি বিধবা বালা;
(হায়) অনুদিন সই, নয়নের জলে,
ঘুচাই মনের জ্বালা।

২

সখিরে, আমি হেন অভাগিনী,
নাহি জানি পতি, কিবা সে মুরতি,
বিবাহ কি নাহি জানি।
(সখি) মা বাপ নিদয়, শৈশব সময়ে,
পর হাতে সঁপি দিলা,
(আমি) অনিচ্ছাতে সই, খেলিনু তখন,
সে এক দুঃখের খেলা।

৩

সখিরে, কি কব প্রাণের জ্বালা;
ছিড়িয়া কলিকা, কণ্টক লতায়,
বিঁধিয়া গাঁথিল মালা।
(সখি) তাতেও আবার, বিধাতা বিমুখ;
সেও মালা ছিঁড়ে গেল;

(আমি) ধুলায় পড়িয়া, যাই গড়াগড়ি,
এ মোর কপালে ছিল!

৪

সখিরে, বিধাতা নিঠুর অতি;
দুঃখের অনলে, দহিতে নিয়ত,
গড়েছিলা এমূরতি।
(সই) হেন যদি বিধি, করিলা অবিধি,
কেন না হরিলা স্মৃতি;
লো স্বজনি, বাসনা কামনা
(প দয়ে ন্দ্রি

কব রূপের কথা;
তে, ঝড়ে দুনয়ন,
উপজে ব্যথা!
(হায়) নুপম, সে শ্যাম মুরতি,
ব ন প্রীতির ভার;
(সই) চাহিতে চাহিতে, দেখিতে দেখিতে,
হ নিল মন আমার!

৭

সখিরে, কিবা সে মধুর ভাষা;
শুনিতে শুনিতে বাড়িল পিয়াস,
না পুরিল মন আশা!
(জিনি) বংশীর সুরব, কোকিল কাকলি,
কহিলা করুণ স্বরে;
"(বড়) ভাল বাসি আমি, তোমারে সুন্দরি,
এসেছি তোমার তরে।"

৮

সখিরে, আমি হেন অভাগিনী;
"ভাল বাসি তোরে" এমধুর কথা,
জনমে নাহিক শুনি!
(হল) আলু থালু প্রাণ, হারাইনু জ্ঞান,
হইনু পাগল পারা;
(তখন) খসিল বসন, ঘন বহে শ্বাস,
স্থির দুনয়ন তারা!

৯

সখিরে, কি কব এ পোড়া মুখে,
মনে হল সাধ, কণ্ঠহার করি,
পরি সে রতনে বুকে।
(আমার) মনে হল সাধ, পড়িনু প্রমাদে,
দুরু দুরু হিয়া কাঁপে;
(তখন) চারিদিকে চাই, দেখে যদি কেহ,
পুড়িব কলঙ্ক তাপে!

১০

সখিরে, বলিতে বিদরে হিয়ে!
নেহারিনু আমি, সেইরূপ রাশি,
নয়নে নয়ন দিয়ে।
(তখন) সেই সুধাকর, কোমল দুকর,
কণ্ঠেতে করিল দান;
(অমনি) সাপটিয়া সই, ধরিনু উরসে,
পরশে অবশপ্রাণ!

* স্থিতি করিলা সকর্ম্মকরূপে ব্যবহৃত।

১১

সখিরে, আচম্বিতে এ কি হল ;
অধরে চুম্বিতে, পূর্ণিমার চাঁদ,
আকাশে মিশিয়া গেল।
(সখি) হইতাম যদি, বন বিহঙ্গিনী,
উড়িতাম তার তরে ;
(আমি) হইতাম সুখী, বারেক নিরখি,
সেই পূর্ণ শশধরে।

১২

সখিরে, আমি হেন অভাগিনী,
এ পাপ পরশ, সহেনা সে দেহে,
হায় আগে নাহি জানি!
(আহা!) পাই যদি পুনঃ সেই সুধাকরে,
দেখিয়া ঘুচাই ক্ষুধা ;
(আমি) দূর হতে সই, চকোরের মত,
খাই সে মুখের সুধা!

১৩

সখিরে, পাসরিয়া ভয় লাজে ;
যোগিনী হইয়া বেড়াইব সখি,
গহন কানন মাঝে।
(সখি) কখন কাঁদিব, কখন হাসিব,
কভু পড়ি ধরাতলে ;
(আমি) নখরে কাটিয়া, সরোবর সই,
ভরিব নয়ন জলে!

১৪

সখিরে, সেই সরোবর মাঝে ;
কুমুদিনী হয়ে, বেড়াব ভাসিয়ে,
দেখিতে সে দ্বিজরাজে ?
(আমি) আকাশের পানে, থাকিব চাহিয়া,
ঐরূপ করিব ধ্যান ;
(সখি) না পাইলে তারে, অগাধ সলিলে,
ডুবিয়া ত্যজিব প্রাণ।

১৫

অশোক বকুল,
রোপিস্ যত
(যখন) পথিক আসিয়ে
বসিবে সে তরু
(তখন) কহিস "এখানে, ...র বিধবা,
পুড়িয়াছে চিতা ...ল!" (পথিক

জীবনপ্রভাত।

দশম পরিচ্ছেদ।

আশা।

"মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে,
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া দুরু দুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ"

মধুসূদন দত্ত।

যেদিন রঘুনাথ তোরণদুর্গে আসিয়াছিলেন, যেদিন তাঁহার হৃদয় [illegible] ক্ষুপ্ত হয়, সেইদিন প্রথমপ্রেমের আনন্দময়ী লহরীতে আর একটি বালিকা-হৃদয় ভাসিয়া গিয়াছিল। ছাদে সন্ধ্যার সময় যখন সয়যুর দৃষ্টি সহসা সেই তরুণ যোদ্ধার উপর পতিত হইল, বালিকার হৃদয় যেন সহসা অজ্ঞাতপূর্ব্ব উদ্বেগে চমকিল ও স্তম্ভিত হইল। আবার চাহিলেন, আবার সেই উদার বদন মণ্ডল, সেই উন্নত তরুণ যুদ্ধবেশধারী অবয়ব দেখিলেন, প্রথমপ্রেমের তরঙ্গবেগে বালিকার হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

সেই উদ্বেগ-পরিপূর্ণ হৃদয়ে রঘুনাথকে ভোজন করাইতে যাইলেন, পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দেব-বিনিন্দিত অবয়বের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সময়ে সময়ে স্পন্দহীন হইয়া একেবারে চকিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। আবশ্যকমতে সম্মুখে আসিলেন, প্রেমবিদগ্ধা বালিকা তখনও নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না; যখন চারিচক্ষুর মিল হইল, তখন লজ্জাবৃত-বদনা ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলেন।

সরিয়া আসিলেন, কিন্তু হৃদয়ে নূতন একটি ভাব উদয় হইল। রঘুনাথ তাঁহারদিকে সোদ্বেগে দৃষ্টি করিলেন কেন? রঘুনাথ এরূপ বিচলিত-চিত্ত হইয়া ভোজন করিতেছেন কেন? তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস কি জন্য? হস্ত কাঁপিতেছে কি জন্য? জগদীশ্বর! ঐ দেবপুরুষ কি এই অভাগিনীকে মনে স্থান দিয়াছেন?

পরদিন আবার সেই তরুণ যোদ্ধাকে দেখিলেন, আবার হৃদয়, মন, প্রাণ সেই দিকে ধাবমান হইল। যখন বিদায় লইয়া যোদ্ধা অশ্বারূঢ় হইয়া চলিয়া গেলেন, সরযুর প্রাণটিও লইয়া গেলেন, কেবল দেহমাত্র প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সেই মন্দিরে দণ্ডায়মান রহিল। যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন, পুরুষের মন উচ্চাভিলাষে যুদ্ধ-উল্লাসে স্ফীত হইতে লাগিল; রমণী একাকী গবাক্ষ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নিঃশব্দে দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু বিমো-

চন করিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় নিঃশব্দে বিদীর্ণ হইতেছিল।

বালিকা একথা মুখ ফুটিয়া বলিবে কিরূপে, এ মর্ম্মভেদী দুঃখ জানাইবে কাহার কাছে ?

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। অশ্ব ও অশ্বারোহী অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বালিকা নিস্পন্দে সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। দিবালোকে পর্ব্বতমালা অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, তাহার উপর, যতদূর দেখা যায়, পর্ব্বত-বৃক্ষ সমুদ্রের লহরীর মত বায়ুতে দুলিতেছে। উপরে পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত পতিত হইতেছে, সেই স্বচ্ছজল নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে। নীচে সুন্দর উপত্যকায় গ্রামের কুটীর দেখা যাইতেছে, সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সমস্ত দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া পর্ব্বত-কন্যা তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে,ও মেঘ বিবর্জ্জিত সূর্য্য এই সুন্দর দৃশ্যের উপর দিয়া আপন আলোক-হিল্লোল আনন্দে গড়াইয়া দিতেছেন। কিন্তু সরযু এ সমস্ত দেখিতেছিলেন না, তাঁহার মন এ সমস্ত দৃশ্যে ন্যস্ত ছিল না। তিনি কেবল একমাত্র পর্ব্বতপথের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মন সেই দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া বালিকা আর কিছু দেখিতে পাইলেন না; তাঁহার নয়ন পুনরায় জলে আপ্লুত হইল, শীঘ্রই অবারিত ধারা বহিয়া গণ্ড ও বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। বালিকার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

শূন্য-হৃদয়ে সরযুবালা সংসারকার্য্যে নিয়োজিত হইলেন; স্নেহময়ী কন্যা পিতার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা অব্যক্তব্য ও অব্যক্ত, প্রফুল্ল মুখখানি কেবল ঈষৎ ম্লান, ধীরে ধীরে পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ধৈর্য্যই রমণীর প্রধান গুণ, ধৈর্য্যই রমণী বাল্যকাল অবধি অভ্যাস করেন। এই বিষম সংসারের নানা শোক দুঃখে, পীড়ায়, যাতনায়, বিষম উদ্বেগে, সকল সময়েই নারী ধৈর্য্যধারণ করিয়া সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অসহ্য শোকযাতনা হৃদয়ে গোপন রাখিয়া হাস্যমুখী স্বামীর সেবা করেন, দুর্ব্বহনীয় পীড়া তুচ্ছ করিয়া স্নেহময়ী সযত্নে সন্তানকে লালন পালন করেন। শুনিয়াছি, পুরাকালে তাপসেরা ইন্দ্রিয়সুখ তুচ্ছ করিতেন, হেলায় সহস্র যাতনা সহ্য করিতেন। কিন্তু যখন আমি সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করি, প্রেমময়ী রমণীকে সহস্র যাতনা, সহস্র দুঃখ, সহস্র অপমান সহ্য করিয়াও স্বামীর দিকে একনিবিষ্টচিত্ত থাকিতে দেখি; যখন স্নেহময়ী জননীকে পীড়া, দারিদ্র্য, সংসারের অসংখ্য ও অসহ্য যন্ত্রণা হেলায় সহ্য করিয়া পুত্র কন্যাদিগকে সযত্নে লালন পালন করিতে দেখি, তখন আমি তাপসদিগের কথা বিস্মৃত হই, সংসারের মধ্যে গৃহস্থিনী তাপসীদিগের সহিষ্ণুতা দেখিয়া

বিস্মিত হই। সরযূবালা রমণী, সুতরাং বাল্যকাল হইতে সহ্যগুণ অভ্যাস করিয়াছিলেন; নিঃশব্দে পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, হৃদয়ের উদ্বেগ নিঃশব্দে হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন।

সায়ংকালে পিতার ভোজনের সময় নিকটে বসিলেন; স্বহস্তে পিতার শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে আপন শয়নাগারে যাইলেন, অথবা সেই নিস্তব্ধ রজনীতে পুনরায় ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষ পার্শ্বে যাইয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

পুনরায় প্রভাত হইল, পুনরায় দিন গতে সন্ধ্যা হইল, সপ্তাহ অতীত হইল, মাসকাল অতিবাহিত হইল, সে তরুণ-যোদ্ধা আর আসিলেন না, তাঁহার কোন সংবাদও আসিল না। সরযূবালা সেই পর্ব্বতপথ চাহিয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

"এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি,
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনু,
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।"
মধুসূদন দত্ত।

জনার্দ্দন স্বভাবতই সরলস্বভাব লোক ছিলেন, সমস্ত দিন শাস্ত্রানুশীলন বা দেবপূজায় রত থাকিতেন, প্রভাতে ও সায়ংকালে কিল্লাদারের নিকট সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, কদাচ বাটীতে থাকিতেন। তিনি একমাত্র কন্যাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, ভোজনের সময় কন্যাকে নিকটে না দেখিলে তাঁহার আহার হইত না, রজনীতে কখন কখন শাস্ত্রের গল্প বলিতেন, সরযূ বসিয়া শুনিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রায়ই আপন কার্য্যে রত থাকিতেন; কন্যাও পূর্ব্ববৎ পিতার সেবা করিতেন, গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা ও কখন কখন ঈষদ্ম্লান মুখখানি জনার্দ্দন লক্ষ্য করেন নাই।

বালিকার হৃদয়ে সহসা যে ভাবগুলি উদয় হয়, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না; একদিন সন্ধ্যাকালে ও একদিন প্রাতে সরযূর হৃদয়ে সহসা যে ভাবের উদ্রেক হইল, তাহা এক সপ্তাহে বা এক মাসের মধ্যেই বিলুপ্ত হওয়াই সম্ভব। যদি সরযূর মাতা থাকিত, বা ছোট ছোট ভগ্নী বা খেলিবার সঙ্গিনী থাকিত, বা জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেকে থাকিত, তবে সেই মাতাকে দেখিয়া বা খেলায় রত হইয়া সেই নবভাব বিস্মরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সরযূ জন্মাবধি একাকিনী, পিতা ভিন্ন তিনি আপনার লোক কাহাকেও কখন দেখেন নাই, কাহাকেও জানিতেন না, সুতরাং বাল্যকাল অবধিই ধীর, শান্ত, চিন্তাশীল। প্রথমযৌবনে যেরূপ দেখিয়া সহসা সরযূর হৃদয় আলোড়িত হইল, মন উন্মত্ত হইল, অপূর্ব্ব সুখের উ-

চ্ছাস হইল, সরযূ এখন সেই চিন্তায় মগ্ন হইলেন; দিনে, সায়ংকালে, প্রভাতে, সেই চিন্তা করিতেন, সুতরাং সে মূর্ত্তি বিলুপ্ত না হইয়া ক্রমেই হৃদয়ে গভীরাঙ্কিত হইতে লাগিল।

সে চিন্তা কি? সরযূ সেই তরুণ সেনাপতির চিন্তা করিতেন। তিনি এতদিনে যুদ্ধের উল্লাসে মগ্ন হইয়াছেন, দুর্গ হস্তগত করিতেছেন, শত্রু ধ্বংস করিতেছেন, বিক্রম ও বাহুবলে বীরনাম ক্রয় করিতেছেন, এখন কি আর এ অভাগিনীকে স্মরণ আছে? চিরকাল আমাকে স্মরণ রাখিবেন, বলিয়াছিলেন সে কথা কি এখন মনে আছে? পুরুষের মন! নানা কার্য্য, নানা চিন্তা, নানা শোক, নানা উল্লাসে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে। জীবন আশাপূর্ণ, অদ্য এই কার্য্য সাধন করিব, কল্য অপর কার্য্য সিদ্ধ করিব, এইরূপ নানা আশায় অতিবাহিত হয়। আশা ফলবতী হউক আর নাই হউক, জীবন সর্ব্বদা উল্লাসপূর্ণ থাকে। রাজদ্বারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শোকগৃহে বা নাট্যশালায়, নানা কার্য্যে নানা চিন্তায় হৃদয় পূর্ণ থাকে! কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? প্রেম আমাদের জীবন, প্রেম আমাদের জগৎ; জীবিতেশ্বর! সেটিতে যেন নৈরাশ করিও না! ধীরে ধীরে এক বিন্দু জল সরযূর গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল।

আবার চিন্তা আসিত;—তরুণ যোদ্ধা কি এখনও এ অভাগিনীর কথা ভাবেন? একালে এ বয়সে কি তাঁহার মন স্থির আছে? হায়! নব নব আমন্দে আমার কথা অনেক দিন বিস্মৃত হইয়াছেন! তাঁহার রমণীর অভাব কি? সুখের অভাব কি? নবীন যোদ্ধা এতদিনে অভাগিনীকে বিস্মৃত হইয়াছেন! হায়! নদীর ঊর্ম্মি পার্শ্বস্থ পুষ্পটীকে লইয়া ক্ষণকাল খেলা করে, পুষ্প আনন্দে নাচিয়া উঠে, তাহার পর ঊর্ম্মি কোথায় চলিয়া যায়, পুষ্পটি শুকাইয়া যায়, কিন্তু জল আর ফেরে না! আমাদের হৃদয়, আমাদের জীবন, পুরুষের খেলার দ্রব্য। মুহূর্ত্তে তাহাদের খেলা সাঙ্গ হয়, পরে রমণীর সমস্ত জীবন খেদ ও দুঃখপূর্ণ! নীরবে সরযূ আর একবিন্দু জল মোচন করিলেন।

নিশীথে যখন সেই উন্নত দুর্গ ও চারিদিকে পর্ব্বতমালা চন্দ্রের সুধাকিরণে নিস্তব্ধে সুপ্ত হইত, তখন নীল আকাশ ও শুভ্র চন্দ্রেরদিকে চাহিতে চাহিতে বালিকার হৃদয়ে কত ভাব উদয় হইত, কে বলিবে? বোধ হইত যেন, সেই পর্ব্বত-পথ দিয়া একজন নবীন অশ্বারোহী আসিতেছেন, অশ্ব শ্বেতবর্ণ, আরোহীর সেইরূপ গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ ললাট ও নয়ন ঈষৎ আবৃত করিয়াছে। যেন দুর্গে আসিয়া অশ্বারোহী অবতরণ করিতেন, যেন তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ-খচিত শিরস্ত্রাণ, বলিষ্ঠ সুগোল বাহুতে সুবর্ণের বাজু, দক্ষিণ হস্তে সেই দীর্ঘ বর্শা! যেন যোদ্ধা আবার আহার করিতে বসিলেন, সরযূ তাঁহাকে ভো-

জন করাইতেছেন ; অথবা রজনীতে সেই ছাদে সরযু সেই যোদ্ধার হস্ত ধারণ করিয়া একবার মনের কথা খুলিয়া বলিতেছেন, হৃদয় ভরিয়া একবার কাঁদিতেছেন। যোদ্ধার প্রশাস্ত শীতল বক্ষে সরযু মুখ খানি লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাঁদিতেছেন! উঃ! সে দিন কি কখন আসিবে? সে আনন্দময় প্রতিমাকে কি সরযু আর দেখিতে পাইবে?

চিন্তার শেষ নাই, অগাধ সমুদ্রের হিল্লোলের ন্যায় একটির পর আর একটি আইসে, তাহার পর আর একটি। সরযু আবার ভাবিলেন যেন যুদ্ধ হইয়াগিয়াছে, তরুণ সেনাপতি বহু খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, বড় উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু সরযুকে ভুলেন নাই। যেন পিতা তাঁহার সহিত সরযুকে বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, যেন ঘর লোকে পরিপূর্ণ, চারিদিকে দীপালোক জ্বলিতেছে, বাদ্য বাজিতেছে, গীত হইতেছে, আর কত কি হইতেছে সরযু জানে না, ভাল দেখিতে পাইতেছে না। যেন সরযু কম্পিত-কলেবরে সেই দেব প্রতিমূর্ত্তির নিকট বসিলেন, যেন যুবকের হস্তে আপন স্বেদাক্ত কম্পিতহস্তটি রাখিলেন, যেন রজনীতে সেই জীবিতেশ্বরকে পাইলেন। উঃ! আনন্দে বালিকা-হৃদয় স্ফীত হইতেছে, তিনি আনন্দাশ্রু সম্বরণ না করিতে পারিয়া সেই বীরের শীতল হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া মুহুর্মুহু ক্রন্দন করিতেছেন। সরযু! পাগলিনী হইও না।

আবার চিন্তা আসিল। রঘুনাথ খ্যাতিপন্ন হয়েন নাই, রঘুনাথ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই, রঘুনাথ দরিদ্র, কিন্তু সরযু সেই পরম ধনকে পাইয়াছেন। পর্ব্বতের নীচে ঐ যে সুন্দর উপত্যকা দেখা যাইতেছে, যেখানে শান্তবাহিনী নদী চন্দ্রালোকে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, যেখানে হরিদ্বর্ণ সুন্দর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র চন্দ্রালোকে সুপ্ত রহিয়াছে, ঐ রমণীয় স্থানে অনেকগুলি কুটীরের মধ্যে যেন একটি ক্ষুদ্র কুটীর সরযুর! যেন দিবাবসানে সরযু স্বহস্তে রন্ধনকার্য্য সমাপন করিয়াছেন, যেন যত্নপূর্ব্বক জীবিতনাথের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কুটীর সম্মুখে সুন্দর দুর্ব্বার উপর বসিয়া রহিয়াছেন, পার্শ্বে শিশুসন্তান ক্রীড়া করিতেছে। যেন সরযু দূর ক্ষেত্রের দিকে চাহিতেছেন, যেন সেই দিক হইতে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর একজন দীর্ঘকায় পুরুষ কুটী রাভিমুখে আসিতেছেন। সরযুর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, শিশুসন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, যেন সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ আসিয়া প্রথমে শিশুকে, পরে শিশুর মাতাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। উঃ! সরযুর মস্তক ঘুরিতে লাগিল, সরযু ধন মান চাহে না, সুবর্ণ রৌপ্য চাহে না, খ্যাতি পদ চাহে না; ভগবন্! সরযুকে সেই ক্ষুদ্র কুটীর, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠটী দাও।

গভীর নিশীথে শ্রান্ত হইয়া সরযু

সেই ছাদে সুপ্ত হইয়া পড়িলেন ; অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইলেন ; ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র, সহস্র মোগল সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের ছিন্ন মস্তক বা ছিন্ন বাহু পতিত রহিয়াছে, ক্ষেত্র রক্তে আবৃত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে সেই নবীনযোদ্ধা পড়িয়া রহিয়াছেন! যোদ্ধার বক্ষঃস্থল হইতে রক্তস্রোত বহির্গত হইতেছে ও উজ্জ্বলতাশূন্য নয়নদ্বয় সরযুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সরযু শিহরিয়া চীৎকার শব্দে জাগরিত হইলেন, দেখিলেন সূর্য্য উদয় হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত, ও এখনও কাঁপিতেছে, তাঁহার দীর্ঘ কেশপাশ, বাহু স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের উপর আলুলায়িতরূপে রহিয়াছে।

এইরূপে এক মাস, দুইমাস তিন মাস অতিবাহিত হইল, কিন্তু সে নবীনযোদ্ধা আর আসিলেন না। গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল, তাহার পর সুন্দর শরৎকাল শুভ্রচন্দ্র ও তারাবলীকে সঙ্গে লইয়া যেন জগৎকে সুধাপূর্ণ ও শান্ত করিল, কিন্তু সরযুর তপ্ত-হৃদয় শান্ত হইল না। শীত আসিল, চলিয়া গেল, আবার মধুময় বসন্তকাল আসিল, পুষ্পগুলি দেখা দিল, বৃক্ষে বৃক্ষে পত্র মঞ্জরিত হইল কিন্তু পূর্ব্ববসন্তে সরযু যে মধুময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, মধুকালের সহিত তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না।

বৎসরকাল অতীত হইল, সরযু সেই পর্ব্বত-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু সে পথে সে নবীনযোদ্ধা আর দেখা দিলেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নৈরাশ।

"বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি পড়ি ভূমিতলে
হারাই সতত জ্ঞান ; চেতন পাইয়া
মিলি যবে আঁখি,দেখি তোমায় সম্মুখে!"
মধুসূদন দত্ত।

কয়েক মাসের চিন্তার অবশেষে সরযুর শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, মুখ ম্লান হইল, নয়নদুটী ঈষৎ কালিমাবেষ্টিত হইল। যে লাবণ্য দেখিয়া দুর্গের সকলেই বিস্মিত হইতেন, সে অপূর্ব্ব প্রফুল্ল লাবণ্য আর নাই ; শরীর শীর্ণ, ওষ্ঠদুটি শুষ্ক, নয়নের প্রফুল্ল জ্যোতিঃ হ্রাস পাইয়াছে। শরীরে যত্ন নাই, মনেও প্রফুল্লতা নাই। জনার্দ্দন সময়ে সময়ে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিতেন "সরযু! তোমার শরীর কাহিল হইতেছে কেন?" অথবা "সরযু! তোমার খাওয়া দাওয়ায় রুচি নাই কেন?" কিন্তু সরযু উত্তর দিতেন না, পিতা কিছু না জানিতে পারেন, এই জন্য ঈষদ্ধাস্য করিয়া অন্য কথা আনিতেন, সুতরাং সরল-স্বভাব জনার্দ্দন কিছুই জানিতে পারিলেন না।

কিন্তু অগ্নি বস্ত্রাবৃত হইলে সেই বস্ত্রকে দাহ করে, যত্নসঙ্গোপিত চিন্তা সরযুর হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতে লাগিল। শরীর আরও অবসন্ন হইতে লা-

গিল, বদন-মণ্ডল পাণ্ডু বর্ণ ধারণ করিল, চক্ষুর্দ্বয় কোটর-প্রবিষ্ট হইল, বালিকার শরীর আর সহ্য করিতে পারিল না, সরযূ সঙ্কটজনক পীড়াক্রান্ত হইলেন। ভীষণ জ্বরে শরীর দগ্ধ করিতে লাগিল, বালিকা জ্বালায় অস্থির হইয়া "জল" "জল" করিতে লাগিল, অথবা সময়ে সময়ে অজ্ঞান হইয়া নানারূপ কথা কহিতে লাগিল।

জনার্দ্দন যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন, কিন্তু কারণ জানিতেন না। শারীরিক পীড়ামাত্র বিবেচনা করিয়া প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগকে আনয়ন করিয়া কন্যার চিকিৎসা করাইলেন।

বালিকার অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া চিকিৎসকেরাও ভীত হইল। বালিকার শরীর কখন কখন ঘর্ম্মে আপ্লুত হইত, কখন বা শীতে কণ্টকিত হইয়া উঠিত। সর্ব্বদাই অজ্ঞান অবস্থায় থাকিত, নানারূপ কথা উচ্চারণ করিত, কিন্তু তাহা এরূপ তীব্র ও অস্পষ্ট যে কিছুই বুঝা যাইত না।

সূক্ষ্ম রক্তশূন্য অঙ্গুলীগুলি সর্ব্বদাই নড়িত, কখন কখন বালিকা বাহু প্রসারণ করিত, সময়ে সময়ে শিহরিয়া উঠিত, সময়ে সময়ে চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিত।

উঃ! সেই রোগীর মনে কত সময়ে কত রূপ চিন্তার উদ্রেক হইত, তাহার স্বপ্নে কত রূপ আকৃতির আবির্ভাব হইত, তাহা কে বলিবে?

কখন সম্মুখে বিস্তীর্ণ মরুভূমি দেখিত, বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে, সূর্য্যের প্রখর তাপে সে বালুকা উত্তপ্ত হইয়াছে, সেই মরুভূমিতে সেই রৌদ্রে বালিকা একাকী গমন করিতেছে। উঃ! তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে; জল! জল! এক বিন্দু জল দিয়া প্রাণ রক্ষা কর, গাত্রচর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে, জল! জল! জল! সে মরুভূমিতে বৃক্ষ নাই, গ্রাম নাই, কেবল তপ্ত বালুকা, সরযুর পদ দগ্ধ হইতেছে। আকাশে মেঘ নাই, অথবা যাহা আছে তাহাতে উত্তাপ অধিকতর বৃদ্ধি করিতেছে! সরযুকে কে জল দিবে? সহসা অট্টহাস্য শুনা যাইল, সরযূ সেই আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, রঘুনাথ তাঁহার কষ্ট দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া হাসিতেছেন; বালিকা ক্রোধে ওখেদে তর্জ্জন করিয়া উঠিল। সুপ্তরোগী চীৎকার করিয়া উঠিল, চিকিৎসকগণ ভীত হইল।

আবার স্বপ্ন দেখিল। নিবিড় বন, অন্ধকার, জনশূন্য! সেই বনের মধ্য দিয়া সরযু বেগে পলাইতেছে, একটা ব্যাঘ্র তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইতেছে। চীৎকারশব্দ করিয়া সরযু পলাইতেছে, তাঁহার শব্দে বন প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বনের কণ্টকে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, পদযুগল ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, কিন্তু ভয়ে দাঁড়াইতে পারে না। উঃ! শরীর জ্বলিতেছে, পা জ্বলিতেছে, এ জ্বালা কিছুতে নিবারণ হয় না? সহসা সম্মুখে কি দেখিল? দেখিল সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ সম্মুখে দ-

শায়মান রহিয়াছেন, ভীত সরযুকে বামহস্তে রক্ষা করিলেন, দক্ষিণহস্ত চালনায় খড়্গদ্বারা ব্যাঘ্রকে ধরাশায়ী করিলেন। উঃ! সরযুর প্রাণ শীতল হইল; শ্রান্ত রোগীর অস্থিরতা নিবারণ হইল, রোগী গম্ভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। চিকিৎসকগণ এই সুলক্ষণ দেখিয়া সে দিন চলিয়া গেলেন।

এইরূপে প্রায় একমাস পর্য্যন্ত সরযু রোগগ্রস্ত ও অজ্ঞান হইয়া রহিল। সময়ে সময়ে রোগের এরূপ তীব্রতা হইত যে চিকিৎসকেরাও জীবনআশা ত্যাগ করিতেন। জনার্দ্দন স্ত্রীর মৃত্যু অবধি একরূপ উদাসীন হইয়াছিলেন, শাস্ত্রানুশীলনে ও পূজাকার্য্যেই রত থাকিতেন, এক দিনের জন্যও শাস্ত্রপাঠে নিবৃত্ত থাকিতেন না। কিন্তু অদ্য সংসারের মায়া কাহাকে বলে বুঝিলেন; বৃদ্ধ নিরানন্দে সেই শয্যার নিকট বসিয়া থাকিতেন, স্নেহময়ী কন্যার জন্য হৃদয় শোকে উথলিতে লাগিল, সেই কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, নিশীথে অনিদ্র হইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন। অনেক দিনে, অনেক যত্নে, ক্রমে ঔষধি সেবনে রোগের উপশম হইতে লাগিল; অনেক দিন পরে সরযু শয্যা হইতে উঠিলেন, অল্প আহার করিলেন, এ দিক ওদিক পদচারণ করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু তখন বদন-মণ্ডল একেবারে পাণ্ডুবর্ণ, শরীরে যেন রক্ত মাংস কিছুই নাই।

রজনী একপ্রহর হইয়াছে, ক্ষীণ দুর্ব্বল সরযু ছাদে উপবেশন করিয়া গ্রীষ্মকালের মন্দ মন্দ নৈশ বায়ু সেবন করিতেছেন। তিনি এখনও অতিশয় ক্ষীণ, শরীরের জ্বালা এখন ওসম্পূর্ণরূপে যায় নাই, এই জন্যই বায়ুসেবন করিতে ভাল বাসিতেন।

ধীরে ধীরে গত গ্রীষ্মের কথা মনে আসিতে লাগিল, যে যুবক তাঁহাকে বৃথা আশা দিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারই কথা মনে আসিতেছিল। চিন্তার তীব্রতা এখন নাই, কেননা শরীর অতি দুর্ব্বল, চিন্তাশক্তিও দুর্ব্বল। যেমন মন্দ মন্দ গতিতে সরযু পদচারণ করিতে পারিতেন, তাঁহার চিন্তাশক্তিও সেইরূপ ধীরে ধীরে পূর্ব্ব বৎসরের কথা জাগরিত করিতেছিল।

নিশির মন্দ মন্দ বায়ুতে যেন ধীরে ধীরে পূর্ব্বস্মৃতি আনিতে লাগিলেন; গলদেশে সেই কণ্ঠমালা দুলিতেছিল, সেইটীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একবিন্দু জল শুষ্ক গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া পড়িল; ভাবিলেন "যদিও তিনি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, আমি কি তাঁহাকে ভুলিতে পারি? যতদিন জীবিত থাকিব, এই কণ্ঠমালা সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিব।" আর এক বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল, কণ্ঠমালা দিবার সময় যে মিষ্ট কথাগুলি রঘুনাথ বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল; রঘুনাথের মুখখানি মনে পড়িল; বোধ হইল যেন রঘুনাথ সেই মিষ্টস্বরে আবার ডাকিলেন "সরযু!"

সরযু শিহরিয়া উঠিলেন, পরে খেদে অল্প হাসিয়া ভাবিলেন "হায়! আমি জ্ঞান হারাইলাম না কি? সকল সময়ে তাহাকে দেখিতে পাই, এখনই বোধ হইল যেন তিনি সেই মিষ্টস্বরে আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। ভগবন্! এবিড়ম্বনা কেন!"

আবার সেই কোকিল-বিনিন্দিত শব্দ শুনিতে পাইলেন—"সরযু!" সরযু চমকিত হইয়া পশ্চাৎদিকে চাহিলেন, দেখিলেন—রঘুনাথ!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

"দেখিব প্রেমেরস্বপ্ন জাগি হে দুজনে!"

মধুসূদন দত্ত।

দেখিতে দেখিতে রঘুনাথ নিকটে আসিলেন, সহসা নত হইয়া সরযুর পদযুগল ধরিয়া বলিলেন "সরযু! আমাকে ক্ষমা কর, আমার মত পাতকী এ জগতে নাই, কিন্তু তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর।" রঘুনাথের চক্ষুজলে সেই পদযুগল সিক্ত হইল।

আনন্দে, বিস্ময়ে, লজ্জায় সরযু বাক্শূন্য হইলেন, রঘুনাথকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। আর কি করিলেন, তিনি জানেন না; আনন্দে তাঁহার শরীর বায়ুতাড়িত পত্রের মত কাঁপিতেছিল। যাঁহার প্রেমময় মুখখানি এক বৎসর অবধি চিন্তা করিতেছিলেন, যাঁহার উপর হৃদয়, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, জগদীশ্বর! সরযু কি সেই হারাধন ফিরিয়া পাইলেন?

রঘুনাথ পুনরায় কম্পিতস্বরে বলিলেন "সরযু! তুমি আমার চিন্তা করিয়াছিলে, তুমি পীড়িত হইয়াছিলে, সেই পীড়ায় তুমি আমার নাম করিয়াছিলে;—আর আমি,—আমি কোথায় ছিলাম? সরযু এ পাপিষ্ঠকে কি তুমি মার্জ্জনা করিতে পার?" সরযু চাহিয়া দেখিলেন—চন্দ্রালোকে দেখিলেন, সেই কৃষ্ণকেশ-শোভিত, উদার দেবনিন্দিত মুখখানি সিক্ত,—সেই ভ্রমরনিন্দিত নয়ন হইতে অশ্রু বহিয়া পড়িতেছে! সরযুর নয়নও শুষ্ক রহিল না।

রঘুনাথ আবার বলিলেন "উঃ! ঐ পাণ্ডু-বদন দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; আমি তোমাকে কত শোক দিয়াছি; তুমি আমাকে কি মনে করিয়াছিলে?" পরে ধীরে ধীরে আপন বক্ষের উপর সরযুর হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "কিন্তু সরযু! যদি তুমি এই হৃদয়ের ভাব জানিতে, দিবাভাগে, নিশীথে, শিবিরে, ক্ষেত্রে, যুদ্ধমধ্যে ঐ দেবী-বিনিন্দিত মূর্ত্তি কত ভাবিয়াছি যদি জানিতে, তবে বোধ হয় তোমাকে যে দারুণ কষ্ট দিয়াছি তাহাও মার্জ্জনা করিতে। জগদীশ্বর! আমি কি জানিতাম যে সরযুবালা এ অভাগার জন্য চিন্তা করেন, এ অভাগাকে মনে রাখিয়াছেন?"

পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিলেন, চারিচক্ষুর মিলন হইল, চারি চক্ষুই জলে ছল্ ছল্ করিতেছে, উভয়ের হৃদয় স্ফীত হইতেছে, সরযুর দুইটী হাত রঘুনাথ স্বহস্তে ধারণ করিয়াছেন, উভয়ের হৃদয় পরিপূর্ণ, মুখে আর বাক্য নাই; মন,প্রাণ, হৃদয়ের বেগবতী চিন্তা যেন সেই সজল নয়নে প্রকাশ পাইতেছে।

চন্দ্র! রঘুনাথ ও সরযুর উপর সুধাবর্ষণ কর, তুমি নিশীথে জাগরণ করিয়া সকল দেখিতে পাও, কিন্তু জগতে এরূপ দৃশ্য আর দেখ নাই। তরুণ বয়সে যখন মন প্রথম প্রেমোল্লাসে উৎক্ষিপ্ত হয়, যখন নবজাত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় নবজাত প্রেমের আনন্দ-হিল্লোল মানসজগতে গড়াইতে থাকে, যখন বহুবিচ্ছেদের পর পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উন্মত্তপ্রায় হয়, যখন পরস্পরের প্রেমে আনন্দিত হইয়া উভয়ে জগৎ বিস্মৃত হয়, স্থান কাল বিস্মৃত হয়, দোষ গুণ বিস্মৃত হয়, নীচে পৃথিবী,উপরে আকাশ বিস্মৃত হয়,—কেবল সেই প্রণয়সুখ ভিন্ন সমুদয় বিস্মৃত হয়,—তখন, তখনই যেন এ জগতে ইন্দ্রপুরী অবতীর্ণ হয়।

চন্দ্র! আরও সুধা বর্ষণ কর। বায়ু! ধীরে ধীরে বহিয়া যাও, এরূপ সুখের স্থানে তুমি কখনও বহিয়া যাও নাই। সরযু অনুচিত কার্য্য করিতেছেন তাহা জানেন না, অজ্ঞাত পুরুষের হস্ত ধারণ করিয়া আছেন তাহা জানেন না; কেবল যে মূর্ত্তি এক বৎসরকাল ধ্যান করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ দেখিতেছেন এইমাত্র জানেন, কেবল সেই নবীন মুখমণ্ডল, সেই চক্ষু, সেই কেশ, সেই ওষ্ঠ, দেখিতেছিলেন, এইমাত্র জানেন। আর রঘুনাথ! একি ভদ্রোচিত কার্য্য? রঘুনাথ জানেন না, রঘুনাথ উন্মত্ত!

সেই চন্দ্রালোকে, নিস্তব্ধ নিশাকালে রঘুনাথ সংক্ষেপে আপন বিবরণ সরযুকে জানাইলেন, সরযু পুলকিত শরীরে সেই মিষ্ট কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। একবৎসর কাল অবধি রঘুনাথ নানাস্থানে, নানা যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তোরণে আসিবার জন্য একদিনেরও অবকাশ পান নাই। এক্ষণে শিবজী রায়গড়ে যাইয়া রাজা উপাধি লইয়াছেন, দেশশাসনপ্রণালীতে মনোনিবেশ করিয়াছেন, রঘুনাথ বিদায় পাইয়াছেন। রঘুনাথ দরিদ্র হাবেলদার মাত্র, তাঁহার নাম নাই, অর্থ নাই, পদ নাই, তিনি সরযুরত্নকে কি রূপে পাইবেন? জগদীশ্বর সহায় হউন, রঘুনাথ চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না, রঘুনাথ সেই রত্নটী কুড়াইয়া বক্ষে ধারণ করিবেন, অথবা চেষ্টায় অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিবেন। রঘুনাথ অদ্যই দুর্গে আসিয়াছেন, আসিয়াই সরযুর পীড়ার কথা শুনিয়াছিলেন, রাত্রিতে একবার সরযুকে গোপনে থাকিয়া দেখিবেন বলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সে পাণ্ডুবদন দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই,

ধীরে ধীরে নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, নিকটে আসিয়াছেন, তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, সরযু তাহা মার্জ্জনা করিবেন। রঘুনাথ পুনরায় কল্যই চলিয়া যাইবেন, কিন্তু দেহে যতদিন প্রাণ থাকিবে, সরযুর চিন্তা, সরযুর মুখখানি কখনও বিস্মৃত হইবেন না। সরযুকে এক একবার এই দরিদ্র সেনার জন্য চিন্তা করিবেন।

পুলকিত শরীরে সরযু মধুর কথাগুলি শুনিতেছিলেন, আহা! তাঁহার তাপিত হৃদয় শীতল হইল, দগ্ধ শরীর জুড়াইল, কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়াছে, পিতা শয়ন করিয়াছেন, সরযুর কি রঘুনাথের নিকট বসিয়া থাকা উচিত? এই কথা সহসা মনে জাগরিত হওয়ায় সরযু উঠিলেন, ধীরে ধীরে রঘুনাথের হস্ত হইতে আপন হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন, পরে বলিলেন—

'রঘুনাথ!' সেই মিষ্ট নামটি উচ্চারণ করিয়াই লজ্জায় অধোবদন হইলেন। রঘুনাথের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। বলিলেন "সরযু! সরযু! আর একবার ঐ মিষ্টস্বরে ঐ নামটি উচ্চারণ কর, এক বৎসরের চিন্তা অদ্য বিস্মৃত হইব, এক বৎসরের কষ্ট অদ্য তুচ্ছজ্ঞান করিব।"

সরযু লজ্জা সংবরণ করিয়া বলিলেন "রঘুনাথ! জগদীশ্বর তোমাকে নিরাপদে রাখুন, তোমাকে জয়ী করুন! এ অভাগিনীর তাহা ভিন্ন অন্য প্রার্থনা নাই। তাহা ভিন্ন জীবনে অন্য চিন্তা নাই।" ধীরে ধীরে সরযু শয়নাগারে যাইলেন।

সে দিন রঘুনাথ তোরণ-দুর্গে রহিলেন, পরদিন প্রাতে কিল্লাদারের নিকট বিদায় লইয়া দুর্গ ত্যাগ করিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল; সরযুর চিন্তা পূর্ব্ববৎ বলবতী; কিন্তু পূর্ব্ববৎ খেদযুক্ত নহে। তিনি আনন্দের, সুখের চিন্তাই করিতেন; মায়াবিনী আশা কানে কানে বলিত "শীঘ্র যুদ্ধ শেষ হইবে, শীঘ্র রঘুনাথ জয়ী হইবেন, তখন তিনি এ অভাগিনীকে বিস্মৃত হইবেন না।" সরযুর শরীর ও পূর্ব্ববৎ পুষ্টতা ও লাবণ্য ধারণ করিল। দেখিয়া জনার্দ্দন পুনরায় নিশ্চিন্ত হইলেন, পুনরায় শাস্ত্রানুশীলনে মন দিলেন।

কএক মাস পরে সংবাদ আসিল, যে সম্রাট অম্বরাধিপতি জয়সিংহকে শিবজীর সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন। জনার্দ্দন পূর্ব্বপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বড়ই উৎসুক হইলেন; কিল্লাদারের অনুমতি লইয়া তোরণদুর্গ হইতে যাত্রা করিলেন। জনার্দ্দন সরল হৃদয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে শত্রুশিবিরে যাইতে দিতে কিল্লাদার বা শিবজী কোন আপত্তি করিলেন না; বিশেষ ভদ্রাচরণদ্বারা জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন হয় শিবজীর এই ইচ্ছা ছিল, জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে তিনি কদাপি সম্মত ছিলেন না।

সমস্ত স্থির হইল, জনার্দ্দন কন্যার সহিত তোরণদুর্গ ত্যাগ করিলেন, কন্যার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল!— কেন?

সরযুর চিন্তামালিন্য দূর হইল, সরযুর

লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইল, সরযুর হৃদয়াশয় ঢুক ঢুক করিতেছে, সরযুর মুখে সর্ব্বদা হাসি।

সরযুর আনন্দে পিতা আরও আনন্দিত হইলেন, উভয়ে নিরাপদে রাজা জয়সিংহের শিবিরে পৌঁছিলেন। পাঠক! আমরা তোরণদুর্গে থাকিয়া কি করিব, চল আমরাও সেই স্থানে যাই।

নিশীথচিন্তা।

বিরহ।

প্রেমের পুষ্টি মিলনে, না বিরহে? যাঁহাদিগের হৃদয় আছে, এবং হৃদয়ে প্রীতির পবিত্রপ্রতিমা অঙ্কিত আছে;—যাঁহারা প্রেম আর বিরহকে ব্রজলীলার কথা মনে না করিয়া, হৃদয়রহস্য ও অধ্যাত্মতত্ত্বের নিগূঢ় কথা বলিয়া মনে করেন, সেই সাধুহৃদয় প্রেমিকেরা এই প্রশ্নের উত্তর করুন। আমার চক্ষে প্রেমের মোহময় সম্মিলন যেমন সুখপ্রদ, বিরহের বিষাদময়বহ্নিও তেমনই উপকারজনক। একটিতে প্রীতির আলম্ব, আর একটিতে প্রীতির উদ্দীপনা। যে বিরহের যজ্ঞীয় অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই, সে প্রেমের আভোগ ও আবেশ কাহাকে বলে, তাহা জানে না। যে সম্মিলনসুখের নির্ম্মল অমৃতরাশিতে অবগাহন করে নাই,—হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া মানবহৃদয়স্থ তরল তরঙ্গের সেই গভীর সঙ্গীত শ্রবণ করে নাই, বিরহের বিষযন্ত্রণায় যে কি শিক্ষা, কি সম্পদ্‌, কি মেঘাবৃত জ্যোৎস্না, কি মধুময় দুঃখ আছে, তাহাও সে জানিতে পায় না; ফলতঃ বিরহ নিরবচ্ছিন্ন বিপদ নহে।

বিরহে প্রেমের পরিশুদ্ধি,—প্রীতির পবিত্রতা। যে প্রেম নিরাবিল ও নির্ম্মল নহে, তাহা প্রেমের বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট, অথবা মনুষ্যত্বের উচ্চতর আদর্শে বঞ্চিত, পশু-প্রকৃতিসম্পন্ন ইতর জনেরই ভোগে আসিতে পারে; প্রকৃত মনুষ্যের উপভোগ্য হয় না। সুতরাং প্রীতি যাহাতে সর্ব্বতোভাবে আবিলতাশূন্য হয়, ইহাই প্রার্থনীয়;—হৃদয় যাহাতে প্রীতির নাম লইয়া পঙ্কে গিয়া ডুবিয়া না পড়ে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। বিরহে সেই নিরাবিল মাধুর্য্য, সেই পঙ্ক-স্পর্শ-শূন্য প্রেমের প্রথম স্বাদ। হৃদয়, বিরহে দগ্ধ হইয়া, অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চনের ন্যায়, নূতন কান্তি ধারণ করে,—এবং দুঃখের মুর্ম্মুরদাহনে পুড়িয়া পুড়িয়া পবিত্রতার মোহনমূর্ত্তি সন্দর্শন করে। এইরূপে ইচ্ছা লালসাশূন্য হয়, লালসা একবারে বিনষ্ট না হইলেও প্রীতিতে পরিণতি পায়, এবং মনুষ্যের প্রাণ স্মৃতির উপাসনা করিতে প্রথম শিক্ষা পাইয়া দেবপ্রকৃতির সোপানপরম্পরায় ধীরে ধীরে আরোহণ

করে। ঈদৃশ শিক্ষাকে কোন প্রকারেই সামান্য শিক্ষা বলিতে সাহস পাই না।

শোক কি? না স্মৃতির উপাসনা। এবং স্মৃতির উপাসনাতেই মনুষ্যত্বের গৌরব। মুহূর্ত্তের জন্য যে অনুরাগ, তাহা মানব জাতির অধস্তন জীবসমূহেই শোভা পায়,—মনুষ্যে শোভা পায় না। মনুষ্যের অনুরাগ অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে না পারিলে পরিতৃপ্ত হয় না,—সূর্য্য, চন্দ্র, ও নক্ষত্রনিচয়ের সৃষ্টি ও বিলয়কেও পরিহাস করিয়া একবারে কালের সঙ্গে সমান রেখায় বহিতে না পারিলে, কৃতার্থ হয় না। এই নিমিত্তই মনুষ্যের জন্য মনুষ্যের শোক,—এবং এই নিমিত্তই শোকে মনুষ্যের এক অলৌকিক, অনির্ব্বচনীয়, অরুন্তুদ সুখ। যাহারা শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিকে সংসারের রূঢ়া কথা কহিয়া সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করে, আমার বিবেচনায় তাহারা হৃদয়-শূন্য। আর,—যাহারা বিবিধ নিষ্ঠুর নীতিসূত্র অথবা মমতার অনিত্যতা প্রভৃতি বিবিধ অর্থশূন্য বাক্য শুনাইয়া শোকাকুল হৃদয়ের মর্ম্মস্থান হইতে লোকান্তর-গত প্রিয়জনের প্রতিমূর্ত্তিখানি পুছিয়া ফেলিতে যত্নশীল হয়, তাহারা মূঢ়। আমার নিকট শোকের প্রতিকৃতি, সাধনার প্রতিকৃতির ন্যায়, যার পর নাই সুন্দর ও পবিত্র,—এবং শোকাকুলের দৃষ্টি সুধাবর্ষিণী। আমি আর্ত্তনাদকে শোক বলি না, এবং প্রিয় বিচ্ছেদের প্রথম আঘাতে যে এক আচ্ছন্নতা জন্মে, তাহাকে ও শোক বলিয়া ব্যাখ্যা করি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শোকের নাম স্মৃতির উপাসনা, এবং যে ঐরূপ উপাসনার ভাবে শোকাকুল, সে সার্থক-জন্মা। মনুষ্য যখন শোকে এইরূপ শান্ত, সুস্থির ও ধীরপ্রকৃতি হয়, তখন তাহার জন্য দুঃখ না হইয়া, প্রত্যুত তাহার প্রতি আমার ভক্তি জন্মে,—এবং মনুষ্যের স্নেহ ও মনুষ্যের মমতা যে নিতান্তই একটি কথার কথা, খেলার সামগ্রী অথবা মায়ার ছলনা নহে, ইহা অনুভব করিয়া মনুষ্যজাতির প্রতি শ্রদ্ধাতে হৃদয় তখন অবনত হইয়া পড়ে। যে সংসারে স্বার্থই একমাত্র উপাস্য দেবতা, ক্ষতিলাভ-গণনাই মনুষ্যের একমাত্র শিক্ষা, এবং ভোগের আবর্ত্তচক্রই মনুষ্যের বিলাসক্ষেত্র, যদি সেই সংসারেও শোকের প্রকৃত সমান না হয়;—যে সংসারে প্রীতি প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ-স্পর্শে বিকশিত হইয়া সন্ধ্যাগমেই শুকাইয়া যায়, মনুষ্যের মমতা সৈকত-ভূমিতে জলরেখা ন্যায় দেখিতে দেখিতেই অদৃশ্য হয় রাগের তরঙ্গ বসন্তকালীন লীলাতরঙ্গের ন্যায় এই খল[illegible] থাকে, এই আবার ভাঙ্গিয়া পুনরায় লীলাজলে বিলী[illegible] যদি সেই সংসারেও নুষ্যচিত্তে সমুচিত জানিনা মনুষ্যের

বিরহও [illegible]

সনা। সুক[illegible]

সম্মাননীয়। যাহার হৃদয়ে শোকের দীপশিখা লুক্কাইত ভাবে জ্বলিতে থাকে, সেই শোক-সন্তপ্ত ব্যক্তির পরিম্লানমুখশ্রীতেও যে গাম্ভীর্য্য, বিরহসন্তপ্ত প্রেমিক ব্যক্তির পরিম্লান-মুখ-মাধুরীতেও সেই গাম্ভীর্য্য। শোক সুদীর্ঘবিরহ ;—বিরহ শোকের সাময়িক ভোগ। শোকে যে শিক্ষা, বিরহেও সেই শিক্ষা ;—শোকে যে শুদ্ধি, বিরহেও সেই পবিশুদ্ধি। প্রভেদ এইমাত্র, শোক অনেক দুর্ভাগ্য মনুষ্যের নিকটই আশা-শূন্য অন্ধকার। বিরহের অন্ধকার আশাপ্রদ।

অপিচ, বিরহে প্রেমের পরীক্ষা। দৃষ্টি যখন মুখরা নর্ম্ম-সখীর ন্যায় হৃদয়ের কথা হৃদয়ের নিকট কহিয়া দেয়, রজ্জুর ন্যায় বন্ধনীর কার্য্য করিয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়কে গ্রন্থন করিতে যত্নশীল রহে,—জিহ্বায় যাহা প্রকাশ পায়না, অন্তরের অন্তরতমস্থাননিহিত সেই নিগূঢ় কাহিনী প্রকাশ করিয়া প্রিয়জনের চিত্তবিনোদন করে, তাস্ত অসারচিত্ত ক্ষীণপ্রাণ মনুষ্যও তখন ^হিল্লোলে ক্ষণকালের তরে ভা- ! তাদৃশ যত্নসিদ্ধ প্রীতির আর ? সেই প্রীতিই প্রীতি, যাহা আপনি জীবিত রহে,—সেই যাহা কালের তরঙ্গাঘাতে ক আহত ও প্রত্যাহত ন থাকে; সেই প্রী- ^লাভন এবং চির- হিসাও আশা ও ^র হৃদয়পুত্ত- লের ধ্যান করে। ইহারই নাম প্রণয়ের তপস্যা এবং প্রীতির যদি কিছু পরীক্ষা থাকে, সেই পরীক্ষা বিরহের এই সুদীর্ঘ তপস্যায়।

এই সংসারে কে না প্রণয়ের খেলা খেলে? এবং কে না প্রণয়ের খেলা খেখেলিয়া আত্মবিড়ম্বনা, এবং মনুষ্যের অবমাননা করে? মুহূর্ত্ত পরে যাহাকে ভুলিয়া যায়, মনুষ্য তাহাকে প্রাণাধিক বলে। নয়নপথের অন্তরালে গেলেই যে একবারে হৃদয়েরও অদৃশ্য হইয়া পড়ে, মনুষ্য তাহাকে অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করে। যাহাকে হর্ষ ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ, কোন সময়েই মনে পড়েনা, এবং অতি দীর্ঘ বিরহেও যাহার জন্য মন পোড়ে না,—মনুষ্য যাহাকে ছাড়িয়া আনন্দ ও নিরানন্দ উভয়ই ভোগ করিতে পারে,—এবং যাহার অদর্শন ও অভাবে আপনাকে কোন অংশে অঙ্গহীন জ্ঞান না করিয়া জীবনের সমস্ত ব্যাপারেই নিবিষ্ট রহিতে সমর্থ হয়,—কি ঘৃণা কি লজ্জার কথা, মনুষ্য তাদৃশ দূরস্থ জনকেও নিকটে পাইলে প্রিয়সম্ভাষণের মধু বিলাইয়া পুলকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। প্রীতির পরমারাধ্য পবিত্রতা লইয়া এইরূপ লৌকিক খেলা খেলিতে আমার সাহস হয়না,—এবং মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের এইরূপ ছলনার খেলা দেখিতেও আমার আর প্রাণে সহেনা। প্রীতির নাম অমৃত। যুগান্তব্যাপি তপস্যা বিনা এ অমৃতে মনুষ্যের অধিকার হয়না;—প্রীতি অবনীতে সাক্ষাৎ স্বর্গ;

মনুষ্য বহুদিনের সাধনায় আপনার আত্মাকে নরকস্পর্শ হইতে প্রক্ষালিত করিতে না পারিলে, এই স্বর্গ প্রবেশ-পথ পায়না। যদি হৃদয়ে প্র... ীতিই পরিস্ফুট হইল, তাহা হইলে ...হ কি ? এবং বিরহে দুর্ভাবনা বি... নিখিল জগৎ নৈশনিস্তব্ধতায় অভি... হইয়া নিদ্রার ক্রোড়ে অচেতন রহে, ...রহিণী প্রীতি তখন তপস্বিনীর ন্যায় জ... ছিয়া, সুখও নয়, দুঃখও নয় ...মিশ্রণও ...নীয় অ-...তাহাতে ডু-...ীর্য্য এবং প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য তখন এক হইয়া যায়। প্রকৃতির যে সকল প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য অন্য সময়ে চক্ষে পড়ে না, প্রেমালোক-প্রদীপ্ত মনুষ্যচক্ষু যামিনীর তিমিররাশি ভেদ করিয়া তাহা তখন দেখিতে পায়। শ্রুতি যে সকল অপার্থিব ধ্বনি কখনও শুনিতে পায় না, দূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় তাহা তখন শ্রুতিপথে প্রবেশ করে,—এবং মধ্যে যত কেন ব্যবধান থাকুক না হৃদয় তখন হৃদয়ের সহিত আলাপ করিয়া, যিনি সকল হৃদয়ের শেষগতি এবং প্রীতির আদি প্রস্রবণ, তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে লীন হয়।

কবিতা পুস্তক *

আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। ইহাতে যে কয়টি কবিতা বিনিবেশিত হইয়াছে, বঙ্গদর্শন ও ভ্রমরের পাঠকবর্গ অবশ্যই তাহা পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এই কবিতাগুলিকে বঙ্কিম বাবুর বলিয়া জানিতেন না। এইক্ষণ তাহা জানিতে পাইয়া, পাঠসময়ে নূতন আনন্দ লাভ করিবেন।

যদি চিত্রনৈপুণ্য অথবা কল্পনার বৈচিত্র্যই কবিত্বশক্তির প্রধান পরিচয় হয়, তাহা হইলে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের একজন প্রধান কবি। তাঁহার আয়েষা, তাঁহার সূর্য্যমুখী, তাঁহার মৃণালিনী, তাঁহার তিলোত্তমা, দময়ন্তী শকুন্তলার প্রণয়-স... হইবার যোগ্য। এসকল দেবদুর্... বঙ্গনস্পৃহণীয় পবিত্রপুষ্প কুঞ্জে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, মাজে আদরের আসন পাই... তাঁহার অপরাপর উপা... মধ্যে শৈবলিনীর প্র... পকরণে গঠিত হ... র্থিব সৌন্দর্য্যে

* শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কাঁটালপাড়া, বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও

অতকাল ইচ্ছা নিরীক্ষণ কর, চক্ষু কখনও ফিরিতে চাহিবে না! আমরা যখন প্রতাপের প্রতি স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করি,—প্রতাপের গভীরা প্রীতি, গভীরতর মহত্ত্বের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হই, তখন প্রতাপচরিত্র-স্রষ্টাকে শুধু প্রশংসা করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। আমরা তখন ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় তাঁহার নিকট অবনত হই,এবং কাব্যশাস্ত্রই যে প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র,তাহা অনুভব করিয়া কবিকে হৃদয়ের সহিত সাধুবাদ দেই। ফলতঃ বঙ্কিম বাবুর তুলিপাতশক্তি অসামান্য। যাঁহার হৃদয় নাই, এবং হৃদয়ে প্রীতির আবেগ এবং কল্পনার প্রবাহ নাই, তিনি এইরূপ সৃষ্টি নৈপুণ্যও এইরূপ চিত্রনৈপুণ্য দেখাইতে পারেন না।

কিন্তু বঙ্গীয়পাঠকসমাজে এসকল গুণে কবিত্বের পরীক্ষা হয় না। এদেশে কবিত্বের পরীক্ষা কর্ণে। বাঙ্গালির কবি
ইংরী তালের তরলতরঙ্গ তুলিয়া আপনি
চিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে নাচা-
হিলে সে কবি নহে। বাঙ্গালির
য ছড়া কাটিবে, কথার
দেওয়াইবে, এবং অকথায়ও
বে ;—নহিলে সে কবি
: বাঙ্গালির কবি কে-
গীতে ভ্রমরগুঞ্জনের
নির অনুকরণ হ-
। কিন্তু তা-
। যদি প্রস্থ-
থা লইয়া

আলোচনা করিতে হয়, তাহাও গুড়গুড়ী ভট্টাচার্য্য কিংবা ভূতপূর্ব্ব প্রভাকরের রীতিতে ছন্দোময়ী গীতিকবিতায় লিখিত হওয়া চাই। এই
ই বঙ্গে অত্যুৎকৃষ্ট গ-
দ্যকাব্যও অব
নয়া উপেক্ষিত, এবং
এই জন্যই
রূপর নাই জঘন্য, ও
অস্পৃশ্য পদ
বন্ধ কাব্য বলিয়া আ-
দৃত।

বঙ্কি
র সমস্ত লেখাই পদ্যে।
সুতরাং
সাহিত্যানুরাগী র-
সিক স
রচয়িতা
ও হীরা, এবং
স্তুতিগায়ক বলি
কবি বলিয়া
না। তাঁহার এই কবিতা-পুস্তক সেই অভাব পূরণ করিবে। বিংশতি বৎসরের প্রগাঢ় চিন্তাশ্রমে যে ফল ফলে নাই, এতদিনের পর সেই ফল ফলিবে। যাঁহারা স্কট ও লিটনের কল্পনার সহিত বাঙ্গালির কল্পনার তুলনা করিতে পারেন, সেই অল্পসংখ্যক অসামাজিক ব্যক্তিরাই এত দিন তাঁহাকে সুকবি বলিয়া সম্মান করিতেন, এইক্ষণ আপামর সাধারণ সকল শ্রেণির পাঠকই তাঁহার নাচনী ছন্দের কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে ও নির্ভীকচিত্তে কবি বলিবে। বঙ্কিম বাবু মনস্বিতার উচ্চশৈলে সমাসীন রহিয়াও বাঙ্গালি ভুলাইবার মোহমন্ত্রে কিরূপ সিদ্ধবিদ্যা লাভ করিয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ।

রাজা জয়সিংহ ।

"নরকুলোত্তম তুমি————
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে ।"

মধুসূদন দত্ত ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আরংজীব শায়েস্তাখাঁ ও যশোবন্ত সিংহ উভয়কেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, ও নিজ পুত্র সুলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন, ও তাঁহার সহায়তার জন্য যশোবন্তকে পুনরায় প্রেরণ করেন । তাঁহারাও বিশেষ ফললাভ করিতে না পারায়, সম্রাট্ অবশেষে তাঁহাদের স্থানান্তরিত করিয়া অম্বরাধিপতি প্রসিদ্ধনামা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার সহিত দিলাওয়র খাঁ নামক একজন বিক্রমশালী আফগান সেনাপতিকে দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন । ১৬৬৫ খৃঃ অব্দের চৈত্রমাসের শেষযোগে জয়সিংহ পুনায় উপস্থিত হইলেন । শায়েস্তাখাঁর ন্যায় নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া না থাকিয়া, তিনি দিলাওয়রখাঁকে পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন, ও স্বয়ং সিংহগড় বেষ্টন করিয়া

,,
মু-
দ্ট
কালে
সভার
প্রহরী
াজ্ঞা শি-
া রহিয়া-
াৎ প্রার্থনা
স্মত হইলেন,
জীকে আহ্বান
'ব যাইলেন। বহু
আহ্বান ও আ-
ান্তরে আনিলেন,
ানার দক্ষিণ দিকে
প সমাদর পাইয়া য-
ন। রাজা জয়সিংহ
া অবশেষে বলি-
ামার শিবিরে
করিয়াছেন,

রাজন, এ দাস কবে আপনার আজ্ঞাপালনে বিমুখ ? রঘুনাথ পন্ত দ্বারা আপনি দাসকে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দাস উপস্থিত হইয়াছে। আপনার মহৎ আচরণে আমিই সম্মানিত হইয়াছি।"

জয়। "হাঁ, রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রীকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা স্মরণ আছে। রাজন্, আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা করিব, দিল্লীশ্বর আপনার বিদ্রোহাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, আপনাকে রক্ষা করিবেন, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, এ বিষয়ে আমি বাক্যদান করিয়াছি, এ সমস্ত করিব, রাজপুতের কথা অন্যথা হয় না।"

এইরূপে ক্ষণেক কথোপকথনের পর সভাভঙ্গ হইল ; শিবিরে শিবজী ও জয়সিংহ ভিন্ন আর কেহই রহিলেন না ; তখন শিবজী কপটানন্দ-চিহ্ন ত্যাগ করিলেন, হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। জয়সিংহ দেখিলেন, তাঁহার চক্ষে জল।

বলিলেন—"রাজন্! আপনি যদি আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন, সে খেদ নিষ্প্রয়োজন! আপনি বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন, রাজপুত বিশ্বস্তের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। অদ্যই রজনীতে আমার অশ্বশালা

করুন, আপ...

নিরাপদে যাইবেন, আ...

কোনও রাজপুত আপনার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি ভাল, না পারি ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কদাচ বিস্মরণ করিব না।"

রাজা জয়সিংহের এতদূর মাহাত্ম্য দেখিয়া শিবজী বিস্মিত হইলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন—

"মহারাজ! ভবাদৃশ লোকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি তাহাতে খেদ নাই। বাল্যকাল অবধি যে হিন্দু-ধর্ম্মের জন্য, যে হিন্দুগৌরবের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, সে মহদুদ্দাম, সে উন্নত উদ্দেশ্য, অদ্য এককালে বিনষ্ট হইল, সে চিন্তায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু সে বিষয়েও মন স্থির করিয়াই আপনার শিবিরে আসিয়াছিলাম, সে জন্যও এখন খেদ করিতেছি না।"

জয়। "তবে কি জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন?"

শিব। "বাল্যকাল হইতে আপনাদের গৌরব-গীত গাইতে ভালবাসিতাম, অদ্য দেখিলাম সে গীত মিথ্যা নহে, জগতে যদি মাহাত্ম্য, সত্য ও ধর্ম্ম থাকে তবে রাজপুত-শরীরে আছে। এরাজপুত কি যবনাধীনতা স্বীকার করিবেন? মহারাজ জয়সিংহ কি যবন্ আরংজীবের সেনাপতি?"

জয়। "ক্ষত্রিয়রাজ! সেটী প্রকৃত

বে

জ্ঞা

নাদি

কার্য্যে

জ

পতিহ

র্য্যসিদ্ধি

বিষয়ে স

শিব।

ময় কি সত্য

দেশের শত্রু,

দের সহিত কি

জয়। "আ

জিজ্ঞাসা করিতে

কথা জিজ্ঞাসা ক

ইতিহাস পাঠ করু

মানদিগের সহিত যুদ্ধ

সত্য লঙ্ঘন করেন ন

করিয়াছেন, অনেক

ছেন, কিন্তু জয়ে

পদে, সর্ব্বদা

এখন আম

পের ন্যায় সেই
ত্যাগ করিতেন, আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতাম! কিন্তু যে দিন তিনি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি হইয়াছেন, সেই দিন তিনি মুসলমানের কার্য্যসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। সে কার্য্য ভাল হউক, মন্দ হউক, ব্রত গ্রহণ করিয়া গোপনে লঙ্ঘন করা ক্ষত্রোচিত কার্য্য হয় নাই; যশোবন্ত কলঙ্কে আপন যশোরাশি ম্লান করিয়াছেন। তিনি সিপ্রানদী তীরে আরংজীবের নিকট পরাস্ত হইয়া অবধি আরংজীবের অতিশয় বিদ্বেষী, নচেৎ তিনি এ গর্হিত কার্য্য করিতেন না।"

চতুর শিবজী দেখিলেন জয়সিংহ যশোবন্ত নহেন! ক্ষণেক পরে আবার বলিলেন,—

"হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি চেষ্টা কি গর্হিত কার্য্য? হিন্দুকে ভ্রাতা মনে করিয়া সহায়তা করা কি গর্হিত কার্য্য?"

জয়। "আমি তাহা বলি নাই। যশোবন্ত কেন আরংজীবের কার্য্য ত্যাগ করিয়া, জগতের সাক্ষাতে, ঈশ্বরের সাক্ষাতে, আপনার সহিত যোগ দিলেন না? আপনি যেরূপ স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি সেইরূপ করিলেন না কি জন্য? সম্রাটের কার্য্যে থাকিয়া গোপনে বিরুদ্ধাচরণ করা কপটাচরণ। ক্ষত্রিয়রাজ! কপটাচরণ কি ক্ষত্রোচিত কার্য্য?"

শিব। "তিনি আমার সহিত প্র-

,
।
টও
ক-
তের
লঙ্ঘন
ন হয়

সুসিংহ
; তিনি
র যুদ্ধ ক-
।"
শ্রেষ্ঠ, যশো-
হ নাই। তাঁ-
ন, তাঁহার যা-
কঠোর জাতি ও
ই। যদি যশো-
বষ্টিত হইয়া সেই
বাধীনতা রক্ষার,—
করিতেন, আমি তাঁ
তাম। যদি জয়ী হ-
স্ত করিয়া দিল্লীতে
তেন, ভারতবর্ষে
মি তাঁহাকে
। অথবা

কার্য্যে যোগ দিলে দিল্লীশ্বর পতি পাঠাইতেন, সম্ভবতঃ আমরা ৬ পরাস্ত ও হত হইতাম।"

জয়। "যুদ্ধে মরণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? ক্ষত্রিয় কি যুদ্ধে মরণ ডরে?"

শিবজীর মুখ আরক্ত হইল তিনি বলিলেন,—

"রাজপুত! মহারাষ্ট্রীয়েরাও মৃত্যু ডরে না, যদি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিলে আমার উদ্দেশ্য সাধন হয়, হিন্দু-স্বাধীনতা, হিন্দু-গৌরব পুনঃস্থাপিত হয়, তবে ভবানীর সাক্ষাতে এই মুহূর্ত্তে এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিব, অথবা রাজপুত! তুমি অব্যর্থ বর্শা ধারণ কর, এই হৃদয়ে আঘাত কর, সহাস্যবদনে প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু যে হিন্দু-গৌরবের বিষয় বাল্যকালে স্বপ্ন দেখিতাম, যাহার জন্য শত যুদ্ধ যুঝিলাম, শত শত্রুকে পরাস্ত করিলাম, এই বিংশ বৎসর পর্ব্বতে, উপত্যকায়, শিবিরে, শত্রু মধ্যে, দিবসে, সায়ংকালে, গভীর নিশীথে, চিন্তা করিয়াছি, আমি মরিলে সে হিন্দুধর্ম্মের, সে হিন্দুস্বাধীনতার, সে হিন্দু গৌরবের কি হইবে? যশোবন্ত ও আমি প্রাণ দিলে কি সে সমস্ত রক্ষা হইবে?"

জয়সিংহ শিবজীর তেজস্বী কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, চক্ষুতে জল দেখিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—

হ
জ
বা
আ
জিজ
পরাম
কঙ্ক
কায় ভ
রূপ চি
ভাবিতাম
স্বাধীনতা
তেছেন, যে
ব্রাহ্মণদিগের
ৎসাদি রক্ষা
মানদিগকে দূ
ত্তেজনা করিতে
লাম, সেই স্বপ্নে
গ্রহণ করিলাম, ব
রিলাম, দুর্গ অধিকা
যৌবনেও সেই
নামের গৌরব
স্বাধীনতা
জয় কি

ো
ার
মি
উ-
য় মি
র উ-
-রাম
দখাইয়া
ার গৌ-
আর শি-
; চরি-
যত চিন্তা
। আর থাকে
ক্ষল! মুসল-
ইপূর্ণ হইয়াছে,
হইয়াছে, পত-
দাঁড়াইতে পারে
, এই প্রাসাদতুল্য
য় ধূলিসাৎ হইবে,
হিন্দুর প্রাধান্য।
হইতেছে, মহা-
য ভারতবর্ষ
য়র স্বপ্ন

...নী তোমাকে মিথ্যা উক্তি করেন নাই!"

উৎসাহে, আনন্দে, শিবজীর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তবে ভবাদৃশ মহাত্মা সেই পতনোন্মুখ মোগল প্রাসাদের একমাত্র স্তম্ভ স্বরূপ রহিয়াছেন কি জন্য?"

জয়। "সত্যপালন ক্ষত্রিয়ধর্ম, যাহা সত্য করিয়াছি তাহা পালন করিব। কিন্তু অসাধ্য সাধন হয় না, পতনোন্মুখ গৃহ পতিত হইবে।"

শিব। "ভাল, সত্য পালন করুন, কপটাচারী আরংজীবের নিকট ও আপনার ধর্ম্মাচরণ দেখিয়া দেবতারাও বিস্মিত হইয়া আপনার সাধুবাদ করিবেন। কিন্তু আমি আরংজীবের নিকট কখনও সত্য করি নাই, আমি যদি চাতুরী দ্বারাও স্বধর্ম্মের উন্নতি সাধনের প্রয়াস পাইয়া থাকি, আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকি, তবে সে চাতুরী কি নিন্দনীয়?"

জয়। "ক্ষত্রিয়রাজ! চাতুরী যোদ্ধার পক্ষে সকল সময়ে নিন্দনীয়, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে চাতুরী অধিকতর নিন্দনীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৌরববৃদ্ধি অনিবার্য্য, বোধ হয় তাঁহাদের বাহুবল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, বোধ হয় তাঁহারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু শিবজী! অদ্য যে শিক্ষা আপনি দিতেছেন, সে শিক্ষা কদাচ ভুলিবে না। আ-

মার কথায় দোষ -

আপনি নগর লুণ্ঠন

ছেন, কল্য তাহারা ভা

রিবে, অদ্য আপনি চতুরতা দ্ব.

করিতে শিখাইতেছেন, পরে

সম্মুখযুদ্ধ কখনই শিখিবে না। জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে, আপনি সেই জাতির বাল্যগুরু, গুরুর ন্যায় ধর্ম্ম শিক্ষা দিন। অদ্য আপনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সম্মুখ-রণশিক্ষা দিন, চতুরতা বিস্মৃত হইতে বলুন আপনি হিন্দু-শ্রেষ্ঠ। আপনার মহৎ উদ্দেশ্য আমি শত শতবার ধন্যবাদ করিয়াছি, আপনি এই উন্নত শিক্ষা না দিলে কে দিবে? মহা-রাষ্ট্রের শিক্ষাগুরু! সাবধান! আপনার প্রত্যেক কার্য্যের ফল বহুকালব্যাপী,—বহুদেশব্যাপী হইবে। মন্দ শিক্ষা দিলে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দেশে দেশে সেই শিক্ষার ফল দৃষ্ট হইবে। বৃদ্ধ বহুদর্শী রাজপুতের কথা গ্রহণ করুন।"

এই মহৎ বাক্য শুনিয়া শিবজী ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন,—

"আপনি গুরুর গুরু! আপনার উপদেশগুলি শিরোধার্য্য! কিন্তু অদ্য আমি আরংজীবের অধীনতা স্বীকার করিলাম, শিক্ষা কবে দিব?"

জয়। "জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই। অদ্য আমার জয় হইল, কল্য তোমার জয় হইতে পারে; অদ্য তুমি আরংজীবের

"

দিন

সত্য

দিন

কষ্ট

বে

জীবিত

দ্রোহাচর

প্রবর! নি

হিন্দুর প্রাধ.

গ্রাহ্য কর, ব

মোগলরাজ্য

আর নিবারিত

হিন্দুর গৌরব ন

প্রতিধ্বনিত হইবে।"

শিবজী অশ্রু

হকে আলিঙ্গন

ম্বন! আপন

আপনার

নার সা

. শিবজীর পিতা
শিবজীর যে সন্ধিস্থা-
...ন, শিবজী তাহা লঙ্ঘন
কিন্তু শিবজীর বিপদকালে
...এর সুলতান সন্ধি বিস্মরণ হইয়া
...ীর রাজ্য আক্রমণ করিতে সঙ্কুচিত
...েন নাই। সুতরাং শিবজী এক্ষণে জয়-
সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিজয়পুরের
সুলতান আলী আদিলশায়ের সহিত যুদ্ধা-
রম্ভ করিলেন, এবং আপন মাউলী সৈন্য-
দ্বারা বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করি-
লেন।

জয়সিংহের সহিত শিবজীর সদ্ভাব
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ও পর-
স্পরের মধ্যে অতিশয় স্নেহ জন্মাইল।
উভয়ে সর্ব্বদাই একত্র থাকিতেন, ও যুদ্ধে
পরস্পরের সহায়তা করিতেন। বলা বা-
হুল্য, যে শিবজীর একজন তরুণ হাবেল-
দার সর্ব্বদাই জয়সিংহের একজন পুরো-
হিতের সদনে যাইতেন। নাম বলিবার
কি আবশ্যক আছে?

সরলস্বভাব পুরোহিত জনার্দ্দনও
ক্রমে রঘুনাথকে পুত্রবৎ দেখিতে লাগি-
লেন, সর্ব্বদাই গৃহে আহ্বান করিতেন;
রঘুনাথও যখন পারিতেন পুরোহিতের
আবাসস্থান আপন আবাসস্থান করিতেন।
এরূপ অবস্থায় রঘুনাথ ও সরযূর সর্ব্বদাই
দেখা হইত, সর্ব্বদাই কথা হইত, উভয়ের
জীবন, মন, প্রাণ প্রথম প্রণয়ের অনির্ব্ব-
চনীয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত হইতে লা-

(left column fragments)
...য।"
।
...জী
দুর্গ
...ন,
, যে
...াগ করি-
ফিরাইয়া
...এ আবংজী-
রাখিলেন।
দিলেন তাহার
...র অধীনস্থ ক-
...কে দান করি-
...নবর্ষীয় বালক শ-
মনসবদারপদ প্রাপ্ত

...পর পর রাজা
...ংস করিয়া
...ানিবার

গিল। জগতে রঘুনাথ ও সরযূ অপেক্ষা কে সুখী? সরলচিত্ত জনার্দ্দন তাহাদিগের হৃদয়ের ভাব কিছুই বুঝিতেন না, কখন কখন তাহাদিগকে একত্র দেখিতেন বা কথা কহিতে দেখিতেন, কিন্তু রঘুনাথ " বাড়ীর ছেলে ", নিষেধ করিতেন না। রঘুনাথও জনার্দ্দনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

কএক মাসের মধ্যে বিজয়পুর অধীনস্থ অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া শিবজী অবশেষে একটি অতিশয় দুর্গম পর্ব্বতদুর্গ লইবার মানস করিলেন। তিনি কবে কোন্ দুর্গ আক্রমণ করিবেন, পূর্ব্বে শত্রুকে তাহার সংবাদ দিতেন না, নিজের সৈন্যেরাও পূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতে পারিত না। দিবাভাগে সেই দুর্গ হইতে ৫। ৬ ক্রোশ দূরে জয়সিংহের শিবিরের নিকটই তাঁহার শিবির ছিল, সায়ংকালে এক সহস্র মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন, এক প্রহর রজনীর সময়, গভীর অন্ধকারে প্রকাশ করিলেন যে রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণ করিবেন। নিঃশব্দে সেই এক সহস্র সেনাসমেত দুর্গাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দে দুর্গতলে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সমভূমি, তাহার মধ্যে একটি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর রুদ্রমণ্ডলদুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতে উঠিবার একমাত্র পথ আছে, এক্ষণে যুদ্ধকালে সেই পথ রুদ্ধ হইয়াছে;

ল
হণ
ইয়া,
ডাল
লম্ফ
গিল,
জাতীয়
সমর্থ কি
রূপে পদ
শব্দমাত্র ন
কেবল নৈশ
বৃক্ষের মধ্য
যাইতেছে।
অর্দ্ধেক পথ
হসা দেখিলেন, উ
একটি উজ্জ্বল আ
ক্ষণেক দণ্ডায়মান র
তাঁহার আগমন-বার্ত্ত
ছেন? নচেৎ প্রা
আলোক কেন?
র্গের নীচে পর্ব্ব
দুর্গবাসিগণ
আলোক

ক,
সেই
ঠিতে
ঃশব্দে
.লন।
স্থানের
র হইতে
ত হই-
লে, উপর
সম্ভাবনা।
হইলেন; বৃ-
হইয়া এদিকে
ন, সম্মুখে দে-
পরিমাণ স্থানে
পুনরায় বৃক্ষশ্রেণী
হস্ত কিরূপে যাওয়া
.লন, যাইবার কোন
দেখিলেন, অনেক দূর
য নীচে যাইয়া অন্য
দুর্গে আসিবার পূ-
রে। শিবজী
হিলেন, পরে
লী যোদ্ধা

তন্নজী মালশ্রীকে ডাকাইলেন; দুইজনে সেই বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক অতি মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে তন্নজী চলিয়া যাইলেন, শিবজী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমস্ত সৈন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে তন্নজী ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার শরীর সিক্ত, কেশ ও সমস্ত পরিচ্ছদ হইতে জল পড়িতেছে। তিনি শিবজীর নিকট আসিয়া অতি মৃদুস্বরে কি কহিলেন; শিবজী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাহাই হউক, অন্য উপায় নাই।" তিনি পুনরায় সেনাদিগকে চলিবার আদেশ দিলেন, তন্নজী অগ্রে অগ্রে চলিলেন।

বৃষ্টির জল অবতরণ দ্বারা এক স্থানে প্রস্তর ক্ষয় পাইয়া প্রণালীর ন্যায় হইয়াছিল। দুই পার্শ্ব উচ্চ, মধ্য গভীর, বৃষ্টির সময় সেই গভীর স্থান জলে পরিপূরিত হইত, এখনও তাহাতে জল আছে। সেই জল ভাঙ্গিয়া বুকে হাঁটিয়া যাইলে পর দুই পার্শ্বে উচ্চ পাড় থাকায় সম্ভবতঃ শত্রুরা দেখিতে পাইবে না, এই পরামর্শ স্থির হইল ও সমস্ত সৈন্য ধীরে ধীরে সেই স্রোতের মধ্য দিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। শত সহস্র শিলাখণ্ডের উপর দিয়া নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতে অনন্তনাদে পর্ব্বতজল অবতরণ করিতেছে, সেই শিলাখণ্ডের উপর দিয়া, সেই জল

ভাঙ্গিয়া সহস্র সেনা নিঃশব্দে প্র
আরোহণ করিতে লাগিল। অচির
উপরিস্থ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল, শিবজী মনে মনে ভবানীকে ধন্যবাদ করিলেন।

সহসা তাঁহার পার্শ্বস্থ একজন সেনা পতিত হইল, শিবজী দেখিলেন, তাহার বক্ষঃস্থলে তীর লাগিয়াছে। আর একটী তীর, আর একটী, আরও বহু সংখ্যক তীর। শত্রুগণ জাগরিত হইয়া রহিয়াছে, শিবজীর সৈন্য জলপ্রণালী দিয়া আরোহণ করিবার সময় তাহাদের সন্দেহ হওয়ায় তাহারা সেই দিকে তীর নিক্ষেপ করিয়াছে।

শিবজীর সমস্ত সৈন্য বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইল, তীর নিক্ষেপ থামিয়া গেল, শিবজী বুঝিলেন শত্রুরা সন্দেহ করিয়াছে মাত্র, এখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই। তিনি দুর্গের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটী আলোকের স্থলে দুই তিনটী প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে প্রহরীগণ এদিক ওদিক যাইতেছে। তখন তিনি দুর্গপ্রাচীর হইতে কেবল মাত্র ৩০০ হস্ত দূরে। বুঝিলেন সৈন্যগণ সতর্কিত হইয়াছে, ভীষণ যুদ্ধ বিনা অদ্য দুর্গ হস্তগত হইবার নহে।

শিবজীর চির সহচর তন্নজী মালশ্রীও এ সমস্ত দেখিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন "রাজন্! এক্ষণ ও নামিয়া যাইবার সময় আছে, অদ্য দুর্গ হস্তগত না হয় কল্য

ও
শি
অব
রূপা,
পার্শ্ব
সর হা
ি
তর দিন
ক্রকে
দুর্গের অ
আদেশ ক.
দুর্গের অপ
সেই দিক
করিয়াছেন f
ও সৈন্য সক
এ দিকে প্রাচীরে
লোক ভ্রমিতেছি
তখন শিবজী বলিলে
শত যুদ্ধে তোমরা ত
চয় দিয়াছ, শিবজী
আর একবার সেই
বাল্যকালের যে
দান কর।"
দেখিয়া

ন
রু-
ক্ত
শিবজী
ন সময
জন প্র-
করিয়া
সযাছে।
ী তীর নি-
রীর মৃত শ-
হইল।
এক জন, দুই
ক্রমে দুই তিন
ব ও নীচে জড
গুল্মের উপর দস্যু
লুক্কাযিত থাকিবার
সৈন্যকে অগ্রসর
ন;
ষ্ট্রীযদিগের "হর
নাদ গগনে উত্থিত
উল্লঙ্ঘন করিবার
র এক দল রু-
ন্তে প্রাচী-

রোহী মুসলমানদিগকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। মুসলমানেরাও শত্রুর আগমনে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া "আল্লাহু আকবর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল, কেহ বা প্রাচীরের উপর হইতে তীর ও বর্ষা নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা উৎসাহপরিপূর্ণ হইযা প্রাচীর হইতে লম্ফ দিযা আসিযা রক্ষমধ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিল।

শীঘ্রই সেই প্রাচীরতলে ও রক্ষমধ্যে ভীষণকাণ্ড হইযা উঠিল। প্রাচীরের উপবিষ্ট মুসলমানেরা সবল বর্ষাচালনে আক্রমণকারীদিগকে হত করিতে লাগিল, তাহারাও অব্যর্থ তীর সঞ্চালনে মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। রাশি রাশি মৃত দেহে প্রাচীর-পার্শ্ব পরিপূর্ণ হইল, যোদ্ধৃগণ সেই মৃত দেহের উপর দণ্ডায়মান হইয়া খড্গ বা বর্ষা চালন করিতে লাগিল, রক্তে আক্রান্ত ও আক্রমণকারীদিগের শরীর রঞ্জিত হইযা যাইল। শত শত মুসলমানেরা রক্ষের ভিতর পর্য্যন্ত আসিযাছিল; শিবজীর মাউলীগণ একেবারে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, প্রবলপ্রতাপ আফগানেরাও যুদ্ধে অপটু নহে, রক্তস্রোত সেই পর্ব্বত দিয়া বহিয়া পড়িতে লাগিল। রক্ষের অন্তরালে ঝোপের ভিতর, শিলারাশির পার্শ্বে শত শত মহারাষ্ট্রীয়গণ দণ্ডায়মান হইয়া অব্যর্থ তীর ও বর্ষা সঞ্চালন করিতে লাগিল, রক্ষপত্র ও

বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া অবারিত স্রো সেই তীর আক্রান্তদিগের সংখ্যা ক্ষীণ করিতে লাগিল, আক্রমণকারী ও আক্রান্তদিগের ঘন ঘন সিংহনাদে ও আর্ত্তদিগের আর্ত্তনাদে সেই নৈশ গগন কম্পিত হইতে লাগিল।

সহসা এ সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া প্রাচীর হইতে "শিবজী কি জয়" এইরূপ বজ্রনাদ উত্থিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া, মৃতদেহরাশির উপর দাঁড়াইয়া, রক্তাপ্লুত বর্ষার উপর ভর দিয়া একজন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা এক লম্ফে রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীরের উপর উঠিয়াছেন; তথায় পাঠানদিগের পতাকা পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়াছেন, পতাকাধারী ও দুই একজন প্রহরীকে বর্ষা ও খড়্গ চালনে হত করিয়াছেন, প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সেই অপূর্ব্ব যোদ্ধা বজ্রনাদে "শিবজীকি জয়" শব্দ করিয়াছিলেন, সেই যোদ্ধা রঘুনাথজী হাবেলদার।

হিন্দু ও মুসলমান এক মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তারকালোকে সেই দীর্ঘ মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি করিল। যোদ্ধার লৌহনির্মিত শিরস্ত্রাণ তারকালোকে চক্ মক্ করিতেছে, হস্ত, বাহু, পদদ্বয় রক্তে আপ্লুত, বিশাল বক্ষের চর্ম্মে দুই একটী তীর লাগিয়া রহিয়াছে, দীর্ঘ হস্তে রক্তাপ্লুত, অতি দীর্ঘ বর্ষা, উজ্জ্বল নয়ন গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশে আবৃত। শত্রু-

প
দে
লা
কৃষ্ণ
রঘুনা
শত
গের
রঘুনাথে
সকলে
ইল; ব্যা
উঠিল, রঘুন
যুদ্ধ করিতে
শতজন সেই
পার্শ্বে আসি
খড়্গাঘাতে পাঠ
করিয়া পথ পরি
দুর্গ পরিপূরিত ক
সহিত দুই তিন
স্তব নহে, ত
করিতে
প্রকাশ

র

রর
সাদ
রা-
শ ক-
জীর
, সেই
প্রহরী
খন বজ্র-
' দ্বার খু-
হ করিব,
ইবে।" সি-
ন " অগ্নিতে
র সম্মুখে দ্বার

ষ্টীয় মশাল আ-
অগ্নিদান করিতে
কিল্লাদার ও তাঁ-
নিক্ষেপে প্রা-
উল্লবার চেষ্টা
শালহস্তে
।

প্রথমে দ্বার, গবাক্ষ, পরে কড়িকাট, র সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ সমস্ত অগ্নিতে লিয়া উঠিল, সেই প্রচণ্ড আলোক ভী-ষণনাদে আকাশের দিকে ধাবমান হইল, ও রজনীর অন্ধকারকে আলোকময় করিল। দুর্গের উপরে নীচেব পল্লিগ্রামে, বহুদূব পর্য্যন্ত পর্ব্বতে ও উপত্যকার সেই আলোকস্তম্ভ দৃষ্ট হইল, সেই দাহের শব্দ শ্রুত হইল, সকলে জানিল শিবজীর দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহত সেনা মুসলমান-দুর্গ জয় করিয়াছে!

বীরের যাহা সাধ্য, পাঠান কিল্লাদার রহমৎ খাঁ তাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সঙ্গের যোদ্ধার সহিত বীরেরন্যায় মরিতে বাকি ছিল। যখন গৃহ অগ্নিপূর্ণ হইল, রহমৎ খাঁ ও সঙ্গীগণ লম্ফ দিয়া ছাদ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন, এক এক জন এক এক মহাবীরেরন্যায় খড়্গ চালনা করিতে লাগিলেন, সেই খড়্গ চালনায় বহু মহারাষ্ট্রীয় হত হইল।

সকলে সেই মুসলমানদিগকে বেষ্টন করিল, তাঁহারা শত্রুর মধ্যে চমৎকার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া একে একে হত হইতে লাগিলেন। একজন, দুইজন, দশজন হত হইলেন। রহমৎ খাঁ আহত ও ক্ষীণ, তখনও সিংহবীর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে, চারিদিকে খড়্গ উত্তোলিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের আশা নাই, এরূপ সময় উচ্চৈঃস্বরে শিবজীর

আদেশ শ্রুত হইল " কিল্লাদারকে কর, বীরের প্রাণসংহার করিও না ক্ষীণ আহত আফগানের হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইল, তাঁহার হস্ত বন্ধন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাসাদের অগ্নি নির্ব্বাণ করিতেছে এমত সময় শিবজী দেখিলেন দুর্গের অপর পার্শ্ব হইতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় প্রায় ছয়শত আফগান সৈন্য রাশীকৃত হইয়া আসিতেছে। শিবজী দুর্গপ্রাচীর আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে যে একশত সেনাকে অপর পার্শ্বে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারা সেইদিকে গোলকরাতে দুর্গের অধিকাংশ সেনা সেই দিকেই গিয়াছিল; ধূর্ত্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্ষণেক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাতে মুসলমানেরা উৎসাহিত হইয়া পর্ব্বতের তল পর্য্যন্ত সেই একশত মহারাষ্ট্রীয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, অপর দিকে শিবজী আক্রমণ করিয়া যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন তাহা তাহারা কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই।

পরে যখন প্রাসাদের আলোকে ক্ষেত্র, গ্রাম, পর্ব্বত ও উপত্যকা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সেই অধিকাংশ মুসলমানগণ আপনাদিগের ভ্রম জানিতে পারিয়া পুনর্ব্বার দুর্গারোহণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। শিবজী অল্প সংখ্যক সেনাকে পরাস্ত করিয়া দু-

।
৫
গি
রা
মধ্যে
বিক্র
উৎকৃ
বিলেন
সেই প্রা
পার্শ্বে ... রাখিলেন, বৃ
ক্ষের পার্শ্বে পার্শ্বে তিরন্দাজ
ছাদের উপর বর্শাধারী যোদ্ধাগ
বেশিত করিলেন; কোথাও
ক্কার করিলেন, কোথাও
কত্র করিলেন, মুহূর্ত্ত ম
তখন হাস্য করিয়া
" এই আমাদের
ক্রকে এই স্থানে
বোধ হয় প
ন্ধকারে স
ভঙ্গ দি
শত

র

ন

স-

য়,

ক-

মধ্যে

যাফ-

ক-

ার একে

মান হইলেন, স গোল

ঠিল। রঘুনাথ তাহাদের এক

য়মান হইলেন, কিন্তু কথা ক-

শব্দে মৃত্তিকারদিকে চা-

ধীরে সকলের দিকে

থকে দেখিয়া বলি-

মি ইহাদের মধ্যে

তে অসুরবীর্য্য

ক্রম দেখিয়া

দুর্গবিজয়

র ”

শির

প্র-য়া তিন শত সেনার সহিত বিদ্যুৎগ-ত নয়নের বহির্গত হইলেন।

শিবজী তন্নজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "ঐ হাবেলদার রাজপুত জাতীয়; উহার মুখমণ্ডল ও আচরণ দেখিলে কোন উন্নত বীরবংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু হাবেলদার কখন বংশের বিষয় একটী কথাও বলে না, আপন অসাধারণ সাহস সম্বন্ধে একটী গর্ব্বিত বাক্যও উচ্চারণ করে না, কেবল যুদ্ধকালে, বিপৎকালে, সেই সাহস ও বিক্রম কার্য্যে পরিণত করে। এক দিন পুনায় আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, অদ্য রঘুনাথই দুর্গবিজয়ে অগ্রসর,—আমি এপর্য্যন্ত কোনও পুরস্কার দিই নাই, কল্য রাজসভায় রাজা জয়সিংহের সম্মুখে রঘুনাথ সাহসের উচিত পুরস্কার পাইবেন।"

রঘুনাথজী যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা করেন নাই, করিতে চেষ্টাও করেন নাই; একেবারে তিন শত মাউলীর সহিত বর্শাহস্তে দুর্দ্দমনীয় ভীষণ বেগে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন। ত্রিংশৎ হস্ত দূর হইতে সকলে অব্যর্থ বর্শা নিক্ষেপ করিল, পরে "হর হর মহাদেও" ভীষণ নাদে ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে যাইয়া পড়িল। সে বেগ অমানুষিক ও অনিবার্য্য, মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত আফগানশ্রেণীও ছারখার ও ভিন্ন হইয়া গেল, উন্মত্ত মাউলীদিগের অবারিত ছুরিকা ও খড়্গা

আঘাতে আফগানগণ নিপতিত হইতে লাগিল।

কিন্তু আফগানগণও যুদ্ধবিষয়ে অপটু নহেন ; শ্রেণীচ্যুত হইয়াও হটিল না, পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে যুদ্ধনিনাদ করিয়া মাউলীদিগকে বেষ্টন করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে যে দৃশ্য দৃষ্ট হইল তাহার বর্ণনা দুঃসাধ্য। নিবিড় অন্ধকারে শত্রু মিত্র দেখা যায় না, আপন হস্তের অসি ভাল দেখা যাইতেছে না, মৃতদেহে সেই স্থান পরিপূর্ণ হইল, রক্ত স্রোতরূপে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, বর্ষা, খড্গ, ছুরিকা অবারিত পরিচালিত হইতেছে, যুদ্ধনিনাদে মেদিনী ও গগন পরিপূরিত হইতেছে ; বোধ হয় যেন এ মনুষ্যের যুদ্ধ নহে, শত সহস্র রক্তলোলুপ ক্ষুধিত ব্যাঘ্র পৈশাচিক শব্দে পরস্পরকে নখরাঘাতে বিদীর্ণ করিতেছে।

ঘন ঘন ভীষণনাদে বেষ্টনকারী আফগানগণ মুহুর্মুহুঃ সেই তিন শত যোদ্ধাকে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে অপূর্ব্ব যোদ্ধৃশ্রেণী কম্পিত হইল না। সমুদ্রের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জনে মুসলমানেরা সেই বীর-প্রাচীরে আঘাত করিতেছে, কিন্তু পর্ব্বততুল্য সেই বীর প্রাচীর অনায়াসে সে আঘাত প্রতিহত করিতেছে। মৃতের শবের চারিদিক প্রাচীরের ন্যায় হইয়াছে, মাউলীদিগের সংখ্যা ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে, আফগানগণ পুনঃ পুনঃ অধিকতর বেগে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে শ্রেণী ভিন্ন হইল না।

সহসা "শিবজীকি জয়" এইরূপ বজ্রনাদ হইল, সকলে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, দুর্গের তিন চারি স্থলে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা অগ্নিতে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে ও সেই দিক হইতে যুদ্ধনিনাদ করিয়া আরও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য আসিতেছে। যে একশত জন মহারাষ্ট্রীয় ধূর্ত্ততার সহিত আফগান সৈন্য দুর্গের বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আফগানগণ দুর্গে প্রত্যাগমন করিলে তাহারাই পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক্ষণে সেইদিক হইতে আসিয়া কয়েকটি গৃহে অগ্নিদান করিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। আফগানদিগের দুর্গ শত্রু হস্তগত হইয়াছে, প্রাসাদ জ্বলিয়া গিয়াছে, অন্যান্য অট্টালিকা জ্বলিতেছে, সম্মুখে শত্রু, পশ্চাতে শত্রু, মনুষ্যের য . . . . . . করি . . . আর পারিল না, একেবারে . . . দিয়া পলায়ন করি . . ., মহারাষ্ট্রী . . . শ্চাদ্ধাবন করিয়া শত শত শ . . . করিল। রঘুনাথ তখন উচ্চৈ . . . দেশ দিলেন 'পলাতকে . . . হত্যা করিও না ; শিবজী . . . নন কর।' পলাতক . . . করিয়া প্রাণ যাচ্ঞা . . . গের প্রাণরক্ষা হ . . .

তখন রঘুন . . . রিয়া, প্রাচী . . . স্থাপন ক . . . শস্ত্রের

রিলেন, বন্দীদিগকে একটি ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন, দুর্গের সমস্ত ঘর সমস্ত স্থান হস্তগত করিয়া সুরক্ষার আদেশ দিয়া শিবজীর নিকট যাইয়া শির নমাইয়া সমস্ত সমাচার নিবেদন করিলেন।

উষার রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্ব দিকে দৃষ্ট হইল, প্রাতঃকালের সুমন্দ শীতল বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতে লাগিল; সমস্ত দুর্গ শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ! যেন এই সুন্দর শান্ত পাদপমণ্ডিত পর্ব্বতশেখর যোগী ঋষির আশ্রম,—যেন যুদ্ধের পৈশাচিক রব কখন এস্থানে শ্রুত হয় নাই।

কে গাহিল!

১

কে গাহিল—কি মধুর—ওই যে আবার—
ছুটিল সঙ্গীত-স্রোত ভাসাযে গগন,
একি—এযে ভেসে যায় হৃদয় আমার,
নিশীথে কে করে হেন সুধা-[illegible]ষণ।
আবার—আবাব গ[illegible]
[illegible] চিত্ত ভেসে যায় [illegible]
[illegible]রীবণ্ঠ ? বটে তাই,
ছুটিয়া গবাক্ষে যাই—
কি দেখিনু কি বলিব হায়,
[illegible]নী-লতা পড়িয়া ধরায়।

২

দূর সরসির তটে,
পাষাণ সোপানে,
[illegible]যন চিত্রপটে
[illegible] পানে।
[illegible]
[illegible]
[illegible]র
[illegible]

ললিত সপ্তম গায় সঙ্গীত লহরী
পীযূষ প্রবাহে মত্তা নীরব শর্ব্বরী।

৩

আবার সঙ্গীত-স্রোত উঠিল উথলি,
আবার প্রকৃতি-চিত্ত উঠিল আঁকুলি,
নাচিল সরসিজল, নাচিল পবন,
নাচিল শাখায় [illegible] লক্ষ [illegible]।
হরষিত নীলাম্বরে
হাসিয়া কিরণ ঝরে,
মরি কি গভীর তান,
আকুল করিল প্রাণ;
অবসে মৃদুল খাদে গড়াযে পড়িল,
হৃদয়ের স্রোতসম সঙ্গীতে মিশিল।

৪

শুনিয়াছি বসন্তের কোকিল-কূজন,
শুনিয়াছি বাঁশরীর মধুর নিক্কণ
বসিয়া তরুর তলে, মাথার উপরি
ছুটিয়াছে পাপিয়ার সঙ্গীত লহরী,
হাসিপূর্ণ বিম্বাধরে
নর্ত্তকী মধুর স্বরে

গাহিয়াছে মুলতান,
শুনিয়াছি সেই গান
কিন্তু হেন উন্মাদিনী জীবন্ত রাগিণী,
শুনি নাই হেন গীত চিত্ত-বিপ্লাবিনী।

৫

শুনিলাম—কিন্তু কভু শুনিবনা আর
সুধুই হারানু চিত্ত সঙ্গীত শ্রবণে,
সুখের পিপাসা চিত্তে কেন দুর্নিবার,
সাধের সামগ্রী কেন দুর্লভ জীবনে ?
ইচ্ছা করে দিবানিশি
এই গবাক্ষেতে বসি,
ওই সুমধুর গান
শুনিয়া যুড়াই প্রাণ,
বুঝেনা স্বাধীন পাখী পথিকের মন,
যুড়ায়ে আপন চিত্ত করে পলায়ন।

৬

শুনিব না আর যদি গাহ একবার
হৃদয়-কবাট আমি করি উদ্ঘাটন,
গাহ তুমি বরষিয়া সুধা-পারাবার,
রেখে দেই চিত্তে আমি করিয়া বন্ধন,
কি শয়নে কি স্বপনে
উথলি উঠিবে প্রাণে,
বাজিবে তরঙ্গ বুকে
উঠিবে উথলি সুখে,
তুলিয়া সপ্তমে তুমি গাহ বিহঙ্গিনী
বেঁধে রাখি বক্ষঃস্থলে তব প্রতিধ্বনি।

শ্রীঈঃ—

ভারবি।

অসীম বারিধি-হৃদয়ে যেমন অনন্ত রত্ন
রাজি, অ
ভাবরাশি
(জগতে অ
হৃদয়ের ভা
(সৌন্দর্য্যের
রবির হৃদয়
পরিপূর্ণ।
লিমা নাই,
পার্থিব বিব
তুষার-ক্ষে
ধবলতা হ
অনন্তবক্ষে

ঙ্গিনীর বিকটহাস্য, জলধির প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস, অভ্রংলিহ গিরিবরের ভয়ঙ্কর দৃশ্য, এবং শ্বাপদসমাকীর্ণ গহন বনের ভীষণ পরিপূর্ণতায় তাঁহার হৃদয় আতঙ্ক, ভয় ও ভাবনায় অবশ হইয়া পড়ে না। তিনি প্রকৃতির এই চিত্রের অভ্যন্তরেও ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের রেখাপাত দেখিয়া আনন্দরস উপভোগ করেন, এবং নিজের হৃদয়স্রোত সাধারণের অগম্য, অচিন্ত্য, ও অপ্রাপ্য অমৃতপ্রবাহে মিশাইয়াদিয়া সারস্বতীশক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কবি এই সারস্বতী শক্তির কৃপাবলে নরলোকে থাকিয়াও দেবলোকের পবিত্র সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহার দয়ের অনন্ত প্রস্রবণ হইতে পবিত্রস- । জাহ্নবীর খরস্রোতের ন্যায় নিরন্তর ...বা ... াকে। সেক্ষ-

প্রযুক্ত হইতে পারে। ভারবির কবিতা ওজস্বিনী, প্রখর দীপ্তিমতী ও মাধুর্য্যশালিনী। কিন্তু কালিদাস যেমন বিশ্বসংসারের সকল মধুর সৌন্দর্য্যরাশি একসূত্রে গাঁথিয়া পাঠকের হৃদয় বিমুগ্ধ করেন, ভারবি সেরূপ কোন কৌশল অবলম্বন করেন না। তিনি পাঠকের সম্মুখে গভীর ও উদাত্ত বিষয় স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া রাখেন, সেই গভীর ও উদাত্ত বিষয়ে গভীর ও উদাত্ত ভাব সংযোজিত করেন। এবং সেই ভাবের সহিত এমন একটু তীব্র মদিরা, এমন একটু মনোমদ উগ্ররস ঢালিয়া দেন যে, তাহার আস্বাদমাত্র শরীর কণ্টকিত হয়, হৃদয় ওজস্বিতায় বিকশিত হয় এবং ধমনীমধ্যে প্রতপ্ত শোণিত-স্রোত তীব্রবেগে প্রবাহিত হইয়া উঠে। কালিদাস স্বীয়চিত্রে ধীরে ধীরে ...ন্দর্য্যের রেখাপাত করেন, এবং যেখানে

অধিকতর
ধীরে আ-
ত থাকেন;
র সমাবেশ।
িষয় গুলি
বকশিত হয়,
কালিদা-
বাসন্তীলতা,
পত্র-সুশো-
কটি ভ্রমর-
মল, অপ-
োরবিন্দ ;

একটি সুশীতল সুবিশুদ্ধ শারদী জ্যোৎস্না, অপরটি জ্বালাময়ী পবিত্র বহ্নিশিখা। একটি কলনাদিনী গিরি-নির্ঝরিণীর ন্যায় মৃদু মধুর ধ্বনিতে কর্ণ পরিতৃপ্ত করে, অপরটি ফেণায়মানা তরঙ্গমালিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় উদাত্ত ভাবের সঞ্চার করে। একটি ব্রীড়াময়ী তরুণীর ন্যায় মৃদু মধুর ভাবে অঙ্গলতিকা দুলাইয়া হৃদয়ের প্রতিগ্রন্থি অমৃতরসে পরিপ্লুত করে, অপরটি প্রৌঢ়া কামিনীর ন্যায় তীব্র রস বিকাশ করিয়া হৃদয়ের প্রতিস্তর অভিষিক্ত করিতে থাকে; একটি "ফুটে অথচ ফাটিয়া পড়ে না, দ্রবে অথচ বিগলিত হয় না," হাসে অথচ ধ্বনি করে না; অপরটি ফাটিয়াই শোভা বিকাশ করে, বিগলিত হইয়াই শিরায় শিরায় তীব্রতেজ সঞ্চারিত করে, এবং অট্টহাস্যে হাসিয়াই দশ দিক্ পরিপূর্ণ করে! সংক্ষেপে কালিদাসের কবিতা কোমল মাধুর্য্যময়ী, ভারবির ২
উগ্র মধুরতাশালিনী।

ভারবির কবিতার স'
কবিতার অনেকাংশে
ভয়েই ওজস্বিনী,
নার গৌরবে আ
সমানবেগে সমা
মদিরা ঢালিয়া দিয়
উভয়েই হিমালয়-ক
ণীর ন্যায় খরতরবেগে
সময়ে সমস্ত বিপ্লাবিত
সম্মুখে পায়, তাহাকেই

তীত তেজোমহিমা প্রদর্শন করিয়া ডুবাইয়া ফেলে। ভারবি কোন নাটক রচনা করেন নাই, ভবভূতি ও কোন মহাকাব্য প্রণয়ন করেন নাই। নাটকের সহিত মহাকাব্যের তুলনা হয় না। ভিন্ন পদ্ধতির বলে নাটক ও মহাকাব্য উভয়ই ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত। তথাপি আমরা সাধারণতঃ কবিতার উপর নির্ভর করিয়াই ভবভূতি ও ভারবির সম্বন্ধে এই সাদৃশ্য দেখাইলাম। ইহাতে ভবভূতি ও ভারবির কবিতা এক শ্রেণীতে সমাবেশিত ও একসূত্রে গ্রথিত হইতে পারে। ফলে মধুরতায় যেমন কালিদাস প্রধান, উগ্রতায় সেইরূপ ভবভূতি ও ভারবি শ্রেষ্ঠ।

ভারবি, ব্যাসের সংগৃহীত উপক
লইয়া নিজের কাব্য রচনা করি'
মহাভারতের
১-

যাঁহারা প্রাচীন কবিদের বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করেন, তাঁহাদের সেই কাব্যে কারুকার্য্যেরই সমধিক প্রবলতা দেখা যায়। প্রাচীন কবিগণ অযত্নে অনায়াসে যে চিত্র প্রস্তুত করেন, আধুনিক কবিগণ তুলী ঘসিবা, লতা পাতা আঁকিয়া ও রং ফলাইয়া সেই চিত্রে অধিকতর শিল্প-কুশলতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন। প্রাচীন কবিগণের লেখনী হইতে যে স্বভাবশালিনী চিত্তহারিণী কবিতা অবলীলায় অসঙ্কোচে নির্গত হয়, আধুনিক কবিগণের লেখনী ধীরে ধীরে সেই কবিতামালা সজ্জিত ও অলঙ্কৃত করিতে থাকে। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক কোন কাব্যেরই দোষ
ণের নির্ণয় হইতেছে না, কাব্যের শ্রেণী-
হইতেছে মাত্র। এই উভয় শ্রেণীর
...ও মহাভারত
...ক্ষা-

ভারবি ব্যাসের অবলম্বিত পথে পা দিয়া স্বীয়কাব্যে এইরূপ শিল্পচাতুরীর পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কিরাতার্জ্জুনীয়ের প্রথমেই রাজ্যনির্ব্বাসিত, দ্বৈতবনবাসী যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎলাভ হয়। যুধিষ্ঠির এখন কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বনেচর, এবং রাজচিহ্ন, রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া মুনিবেশধারী। দুর্য্যোধন কিরূপে রাজ্যশাসন করিতেছে, কিরূপে সামদণ্ডাদি রাজনীতির প্রয়োগ ক-করিতেছে, জানিবার নিমিত্ত এই মুনিবেশী বনেচর একজন কিরাত-শ্রেষ্ঠকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দেন। কিরাত যতিবেশধারণ করিয়া হস্তিনাপুরে যায়, এবং দুর্য্যোধনের রাজ্যশাসন-ব্যাপার অবগত হইয়া দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগমন করে। এই কিরাত যাহা জানিয়া আইসে, কিরাতার্জ্জুনীয়ের প্রারম্ভেই তৎ-
ঃর বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই
ভারবির কবিত্ব কিরূপ প্রকাশ
মরা তাহার সমালোচনে

ভারবির কবিতা
ত। এই শি-
চর কিরাত, মা-
ক্ষা উচ্চতর গ্রামে
ভারবির কিরাতে
মাতা নাই, সে মৃদুতা
ব নাই। ভারবির
জনীতিজ্ঞ ও তত্ত্বানুস-

স্থায়ী। কিরূপে কোন্ স্থানে, কে ন্ বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, কিরূপে কথার আরম্ভ ও উপসংহার করিতে হইবে, তাহা ভারবির কিরাতের নখদর্পণে স্থিত। ভারবির কিরাত বিপৎপাতে অধীর হয় না, যাতনায় অবসন্ন হয় না এবং মন্ত্রসাধনায় পরাঙ্মুখ হয় না। অধিকন্তু ভারবির কিরাত ভয়ের জন্য মিথ্যা কথা কহে না, মনস্তুষ্টির জন্য তোষামোদ করে না, এবং পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত হয় না। এ কিরাত সত্যবাদী, ধর্মশীল ও নীতিপরায়ণ,—এ কিরাত গুপ্তচরের সম্যক্ উপযুক্ত এবং গুপ্তচরের গুণগ্রামে সম্যক্ অলঙ্কৃত। এই বনবিহারী ধর্মপরায়ণ গুপ্তচর যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে কিরূপ গাম্ভীরভাবে এবং কিরূপ সৌষ্ঠব ও কিরূপ ঔদার্য্যের সহিত স্ববক্তব্যের অবতারণা করিতেছে, পাঠক শ্রবণ করুন। বনেচর অভিবাদন পূর্ব্বক কহিতেছে :—

" ক্রিয়াসু যুক্তৈর্নৃপ চারচক্ষুষো,
ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোঽনুজীবিভিঃ।
অতোঽর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা,
হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।

(অনুবাদ) মহারাজ! চারচক্ষু (১) প্রভুদিগকে প্রতারণা করা, কার্য্যে নিয়োজিত অনুজীবিগণের উচিত নয়। এই জন্য (আমার বাক্য) অপ্রিয়ই (হউক) প্রিয়ই (হউক), আপনি ক্ষমা করি হিতকারি অথচ মনোহারি বাক্য

স কিংসখা সাধু ন শাস্তি যে
হিতান্ন যঃ সংশৃণুতে স কি
সদানুকূলেষু হি কুর্ব্বতে
নৃপেষ্বমাত্যেষু চ সর্ব্বসম্

(অনুবাদ)। যে (অ
হিতোপদেশ দেয় না, সে
এবং যে (রাজা) হিতকর
না, তিনিও দুষ্টস্বভাব
অমাত্য (ইহারা সকলে
মত হইলে সম্পত্তি (যে
হয়।

নিসর্গদুর্ব্বোধম
ক ভূপতীন
তবানুভ
নিগ
/

যে
মূঢ়মতি
(তথ
তির
বল

(১) চরই রাজাদিগের চক্ষুঃস্থানী। অর্থাৎ চর স্বরাষ্ট্রে ও পররাষ্ট্রে বেড়াইয়া যাহা দেখিয়া আইসে, রাজাদিগকে ত নুসারেই কার্য্য করিতে হয়।

এই জন্য চর পূর্ব্বেই ক্ষমা প্রার্থনা
াছে। আমাদের নীতিশাস্ত্রকারেরা
ছন "সত্যং ব্রুয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ
সত্যমপ্রিয়ম্" (সত্য কথা ও
াহবে, অপ্রিয় সত্য কথা ক-
কিন্তু চর কর্ত্তব্যানুরোধে স-
। কথা কহিবে, উহা প্রিয়ই
হউক, তদ্বিষয়ে সে বিচার
সুতরাং প্রভুর অপ্রীতিসা-
প্রের অবমাননা-অপরাধের
না প্রার্থনাই যুক্তিসিদ্ধ।
ও প্রভুর অপ্রিয়পাত্র হ-
হইলে নীরবে থাকাই
ই সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী
তত্ত্বতঃ করে, চর বি-
নিরুত্তর করি-
খাইয়াছে যে,
পন কর্ত্তব্য,
দিগের
ীয়
ভমান
পরি-
খয়া
পূ-

ভারবির দুর্য্যোধন যদিও বঞ্চনাবলে রাজ্য অধিকার করিয়াছে, তথাপি রাজকার্য্যে কখনও ঔদাসীন্য না অব্যবস্থিততা দেখায় নাই। শাসনকার্য্যে ভারবির দুর্য্যোধন অনেক উন্নত। যুধিষ্ঠিরের গুণগ্রাম ও সুকীর্ত্তিমহিমা ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য ভারবির দুর্য্যোধন অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিরন্তর ব্যাপৃত। চর গম্ভীরভাবে যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে এই দুর্য্যোধনের শাসন শৃঙ্খলা ও উদার ভাবের বর্ণনা করিয়াছে।

আমরা এই বর্ণনায় দেখিতে পাই, দুর্য্যোধন, গুণে ও যশে যুধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করিবার জন্য সুরাজনীতির বলে পৃথিবী শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার দয়াদাক্ষিণ্যাদির গুণে যশ বাড়িয়া উঠিয়াছে, পৌরুষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং সুশাসন-মহিমা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। দুর্য্যোধন এক্ষণে অতন্দ্র হইয়া দিবারাত্রি ভাগ করিয়া যথাসময়ে যথাবিধি রাজনীতির প্রয়োগ করিতেছে; অহঙ্কারশূন্য হইয়া লোকের সমক্ষে ভৃত্যদিগকে বন্ধুরন্যায় দেখিতেছে, বন্ধুদিগকে ভ্রাতারন্যায় স্নেহ ও আদর করিতেছে, এবং ভ্রাতাদিগকে রাজ্যাধিপতি বলিয়াই পরিচিত করিতেছে। তাঁহার রাজ্যে শত্রুগণ নির্জ্জিত হইয়াছে, মিত্র রাজগণ বাঙ্ নিষ্পত্তি না করিয়া আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে, অপক্ষপাতে ন্যায়ানুসারে বি-
'র কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। সৈন্য-
প্রাণপণে রাজ্যরক্ষা করিতেছে, পৃ-

থিবী দয়া-দাক্ষিণ্যে পরিতুষ্ট হইয়া নিরন্তর ধনপ্রদানে পরিতোষ জন্মাইতেছে, হুতাশন যজ্ঞস্থলে যথাবিধি সংকৃত ও অভ্যর্থিত হইতেছেন এবং নদীমাতৃক ক্ষেত্রসকল শস্যসম্পত্তিতে অনুক্ষণ শোভা পাইতেছে। ভারবির দুর্য্যোধন এইরূপ সুরাজনীতি ও সদ্ধর্ম্মপরায়ণ; চর অবলীলায় ও অসঙ্কোচে এই দুর্য্যোধনের শাসনমহিমার এইরূপ বর্ণনা পরিসমাপ্ত করিয়াছে। এই বর্ণনা প্রগাঢ়তা ও অর্থগাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। ইহার অধিকাংশ উদ্ধৃত না করিলে সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয় না। কিন্তু প্রবন্ধের অবয়ব অতিশয় বাড়িয়া উঠিবে ভাবিয়া আমরা সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। যে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে শাসন-শৃঙ্খলা যেরূপ অভিব্যক্ত হইবে, সেইরূপ কবির রাজনীতিজ্ঞতা ও আভ্যন্তরীণ অবস্থায় অভিজ্ঞতাও জানা যাইবে। দুর্য্যোধনের রাজ্যে কিরূপে দণ্ডবিধি প্রয়োজিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে যুধিষ্ঠির-প্রেরিত চর কহিতেছে—

"বসূনি বাঞ্ছন্ন বশী ন মন্যুনা
স্বধর্ম্ম ইত্যেব নিবৃত্তকারণঃ।
গুরূপদিষ্টেন রিপৌ সুতেঽপি বা
নিহন্তি দণ্ডেন স ধর্ম্মবিপ্লবম্॥

(অনুবাদ) সেই জিতেন্দ্রিয় দুর্য্যোধন ধনলোভে অথবা ক্রোধবশতঃ দণ্ডবিধান করেন না, রাজধর্ম্ম [রক্ষার] জন্যই লোভাদি পরিত্যাগ করিয়া, শত্রুই হউক, (আর) নিজের পুত্রই হউক, অধর্ম্মাচরণ করিলে সকলকেই প্রাড়্‌বিবাকের উপদেশানুসারে দণ্ডিত করেন *।

স্থলান্তরে কৃষিকার্য্যের সম্বন্ধে চর বলিতেছেঃ—

সুখেন লভ্যা দধতঃ কৃষীবলৈ-
রকৃষ্টপচ্যা ইব শস্যসম্পদঃ।
বিতন্বতি ক্ষেমমদেবমাতৃকা-
শ্চিরায় তস্মিন্ কুরবশ্চকাসতে॥

(অনুবাদ) সেই দুর্য্যোধনের মঙ্গলকর কার্য্যের গুণে নদীমাতৃক কুরুজনপদ কৃষকদিগের একপ সুখলভ্য শস্য-সম্পত্তি ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে যে, বোধ হয় যেন ঐ শস্য বিনা কর্ষণেই পরিপক্ক হইতেছে †।

সন্ধিবন্ধন ও দানের প্রসঙ্গে চর এইরূপ বাক্য বিন্যাস করিয়াছেঃ—

---

* আধুনিক রাজ্যপালকগণ প্রাচীন ভারতের কবির নিকট এই উদারতা ও মহত্ত্ব শিক্ষা করুন। প্রাচীন ভারতের শাসনকার্য্যে এরূপ উদারতা ও মহত্ত্বের অনাদর ছিল না।

† এই বাক্যে প্রতিপন্ন হইতেছে, পূর্ব্বে ভূমিসকল দেবমাতৃক ছিল না, কৃষকগণ কেবল পর্জ্জন্য দেবের উপর নির্ভর করিয়াই থাকিত না। পূর্ত্তকার্য্যের গুণে শস্যক্ষেত্রের নিকট খাল প্রভৃতি থাকাতে কৃষিকার্য্যের বিশিষ্ট সুবিধা হইত। এক্ষণে যাঁহাদের রাজ্য অনাবৃষ্টির জন্য বারম্বার দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয়, তাঁহাদের এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

নিরত্যয়ং সাম ন দানবর্জ্জিত-
ন্ন ভূরি দানং বিরহয্য সৎক্রিয়াম্।
প্রবর্ত্ততে তস্য বিশেষ-শালিনী
গুণানুরোধেন বিনা ন সৎক্রিয়া ॥

(অনুবাদ) সেই দুর্য্যোধনের দান ব্যতিরেকে নির্ব্বাধ সন্ধি প্রবর্ত্তিত হয় না, সদসদ্বিবেচনা ব্যতিরেকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা সম্পন্ন হয় না *।

স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছেঃ—

বসীভূতাং সচ্চরিতৈশ্চরৈঃক্রিয়াঃ
স বেদ নিঃশেষমশেষিতক্রিয়ঃ।
মহোদয়ৈস্তস্য হিতানুবন্ধিভিঃ
প্রতীয়তে ধাতুরিবেহিতম্ফলৈঃ ॥

(অনুবাদ)। ফলোদয় পর্য্যন্ত কার্য্যকারী সেই দুর্য্যোধন সচ্চরিত্র চরদ্বারা রাজাদিগের সমস্ত কার্য্যই অবগত হইতেছেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্য কেবল হিতকর ফল দেখিয়াই জানিতে পারা যায় †।

* রাজ্যাধিপতিদিগের এই নীতিবাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা উচিত।

† কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশে দিলীপ রাজার গুণবর্ণনেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা;

তস্য সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ।
ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব॥

(অনুবাদ) সেই রাজা দিলীপের মন্ত্রণা এরূপ গোপনে থাকিত, এবং আকার ইঙ্গিত এরূপ নিগূঢ় ছিল যে, তাঁহার কার্য্য, জন্মান্তরীণ সংস্কারের ন্যায় ফল দেখিয়া অনুমান করা যাইত।

দুর্য্যোধন কেন এইরূপ সুরাজতার পরিচয় দিতেছে? কেন এইরূপ বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুসারে শাসনকার্য্যের পরিচালনা করিতেছে? কবি পূর্ব্বেই তাহার উত্তর দিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের গুণগ্রাম অতিক্রম ও সুরাজতা বিলুপ্ত করিবার জন্য রাজ্য সুব্যবস্থিত ও সুশাসিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সুতরাং দুর্য্যোধনের এইরূপ সুনীতিপ্রয়োগ কেবল যুধিষ্ঠিরের যশ ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য। কবি এইরূপ দুর্য্যোধনের চরিত্রে একটুকু রং ফলাইয়া যুধিষ্ঠিরের চরিত্র শতগুণে উজ্জ্বল করিয়াছেন। দুর্য্যোধন দুরাত্মা, দুর্য্যোধন মায়াবী, দুর্য্যোধন কপটদ্যূতে পর-রাজ্যাপহারী; এ দুর্য্যোধন যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপদে সমাসীন হইয়া যুধিষ্ঠিরের গুণাতিক্রমী——যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তিস্পর্দ্ধী হইবার জন্য সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বমান্য, সর্ব্বপূজিত ধর্ম্মের অনুশাসন অনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, তখন যুধিষ্ঠির কতদূর মহান্, কতদূর উদারচেতা, কতদূর সুনীতিপরায়ণ! কবি যুধিষ্ঠিরের কাছেও গেলেন না, তাঁহার চরিত্রপটে একটুকু রেখাপাতও করিলেন না, অথচ অপূর্ব্ব কৌশলে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র সুরঞ্জিত করিয়া তুলিলেন,—অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে যুধিষ্ঠিরকে উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে তুলিয়া দিলেন। ইহা কবিত্বের পরাকাষ্ঠা।

দুর্য্যোধন সুনিয়মে প্রজাপালন করি-

লেও যুধিষ্ঠিরের ভয় হইতে বিমুক্ত হয় নাই; অদ্যাপি যুধিষ্ঠিরের নামে তাহার মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয়, মস্তক অবনত হইয়া পড়ে এবং হৃদয়, আশঙ্কা ও আতঙ্কে অবসন্ন হইয়া উঠে। বনবিহারী কিরাত এসম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেঃ—

প্রলীনভূপালমপি স্থিরায়তি
প্রশাসদাবারিধিমণ্ডলম্ভুবঃ।
সঞ্চিন্তয়ত্যেব ভিযস্ত্বদেষ্যতী
রহো দুরন্তা বলবদ্বিরোধিতা॥

(অনুবাদ) সমস্ত শত্রু পরাজয় করিয়া স্থিরোত্তর কালা, সসাগরা পৃথিবী শাসন করিলেও, সেই দুর্য্যোধন সর্ব্বদা আপনার ভয়ে চিন্তিত রহিয়াছেন। অহো! প্রবলদিগের সহিত বিরোধ কি কষ্টকর!

কথাপ্রসঙ্গেন জনৈরুদাহৃতা,
দনুস্মৃতা খণ্ডসূনুবিক্রমঃ।
তবাভিধানাদ্ ব্যথতে নতাননঃ
স দুঃসহান্মন্ত্রপদাদিবোরগঃ॥

(অনুবাদ) লোকে কথাপ্রসঙ্গে আপনার নাম করিলে সেই দুর্য্যোধন, সর্প যেমন দুঃসহ মন্ত্রে গরুড়ের পরাক্রম মনে করিয়া নতশির হয়, সেইরূপ অর্জ্জুনের পরাক্রম স্মরণ করিয়া ব্যথিতচিত্তে অবনত মস্তক হইয়া পড়েন।

এস্থলে কবির কৌশল অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। কবি এস্থলে দুর্য্যোধন অপেক্ষা যুধিষ্ঠিরের শ্রেষ্ঠতা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। কবির কিরাত এস্থলে তোষামোদ করিল না, ব্যাপকতা দেখাইল না, দুর্য্যোধনকে নরকে ফেলিয়া যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে তুলিল না; অথচ দুই একটি গভীর রেখায় যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব্ব তেজোমহিমা—, অপূর্ব্ব দেবোপম ভাব স্পষ্ট আঁকিয়া দিল। যদি এই ভাব মানস-পটে অঙ্কিত করিতে চাও, তবে যুধিষ্ঠিরের কাছেও যাইও না; কল্পনারনেত্রে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের প্রতি একবারও চাহিয়া দেখিও না। অগ্রে দুর্য্যোধনের প্রতি নয়নপাত কর; অগ্রে দুর্য্যোধনের সুশাসন, দুর্য্যোধনের ভয়, দুর্য্যোধনের আতঙ্ক, একে একে স্মৃতিপটে চিত্রিত কর; তাহা হইলেই যুধিষ্ঠিরের উজ্জ্বল কান্তিতে তোমার হৃদয় আলোকিত হইবে; তাহা হইলেই শারদী পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্না-বিধৌত নিবাত নিষ্কম্প তরঙ্গিণীর ন্যায়, অথবা চন্দ্রালোকস্পৃষ্ট পূর্ণ বিকশিত কুমুদস্থলীর ন্যায় যুধিষ্ঠিরের পবিত্রতাময়ী শুভ্রোজ্জ্বল কীর্ত্তি তোমার সম্মুখে হাসিতে থাকিবে। দুর্য্যোধনের প্রতিবিম্বিতচ্ছবির সম্মুখবর্ত্তী না হইলে একীর্ত্তির গরিমা, একীর্ত্তির মধুরিমা বুঝিতে সমর্থ হইবে না। এই ছবিই এ কীর্ত্তি সন্দর্শনের অদ্বিতীয় আলোকবর্ত্তি, এবং এই চ্ছবিই এ কীর্ত্তি-মন্দিরের অদ্বিতীয় সোপান। অগ্রে এই আলোকবর্ত্তি হাতে কর, অগ্রে এই সোপানে পা দেও, তবেই এ কীর্ত্তির মধুর আভা নয়ন ভরিয়া পান করিতে পারিবে।

ভারবি এইরূপে এক দুর্য্যোধনের চিত্রেই

যুধিষ্ঠিরের চারিত্র-সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। "অহো! দুরন্তা বলবদ্-বিরোধিতা" এই কথাতেই কত অর্থ গাম্ভীর্য্য। এই একটি সামান্য কথায় যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য কত পরিস্ফুট হইয়াছে, পঞ্চমুখে স্তুতিগীত গাইলে অথবা শত পৃথিবীর প্রশংসাবাদ লিখিলেও সেই ঔজ্জ্বল্য তত বিকশিত হইত না। প্রবাসে জীর্ণকুটীরে সুসজ্জিত-হর্ম্ম্য-সুশোভিনী অলঙ্কৃতদেহা সুন্দরী পদ্মাবতীর সমক্ষে বনবিহারিণী নিরাভরণা সুন্দরী কপালকুণ্ডলা যেমন অধিকতর সুন্দরী হইয়াছিল, রাজাসনস্থ দুর্য্যোধনের চিত্রের সমক্ষে বনেচর যুধিষ্ঠিরের চিত্র সেইরূপ অধিকতর সুন্দর হইয়াছে। দরায়ুস দুহিতা সুন্দরী না হইলে সেকন্দর সাহেব ধর্ম্ম কখনও পরম সুন্দর বলিয়া পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় হইত না, কিরাতার্জ্জুনীয়ে দুর্য্যোধন সুন্দর না হইলে কখনও যুধিষ্ঠিরের সৌন্দর্য্য সুস্পষ্ট অনুভব করা যাইত না।

কোন ক্ষুদ্র কবি হইলে হয়ত তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রশংসাধ্বনিতে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া দুর্য্যোধনকে একবারে নরকে ফেলিয়া দিতেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে কাব্যের গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য একবারে বিনষ্ট হইয়া যাইত। দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমকক্ষেই হওয়া উচিত, এবং এই সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সৌন্দর্য্যজনক হইয়া থাকে। কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। সৌন্দর্য্যই কাব্যের আত্মা এবং সৌন্দর্য্যই কাব্যের প্রাণ। যিনি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে না পারেন, তিনি কখনও "কবি" নামের অধিকারী নহেন এবং তৎপ্রণীত গ্রন্থও কখনও "কাব্য" নামের যোগ্য নহে। ভীমার্জ্জুন-নকুলসহদেব-সহচর যুধিষ্ঠির যদি দুর্য্যোধনের ন্যায় একজন ক্ষুদ্র-প্রাণ, ক্ষুদ্র-বুদ্ধি ও ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে কাব্যের গৌরব বা সৌষ্ঠব রক্ষা পাইত না। এবং তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র কখনও রমণীয় বা ঔজ্জ্বল্য-বিকাশক হইত না। সুতরাং চিত্রকরের চিত্র আত্মাহীন, প্রাণহীন হইয়া অকিঞ্চিৎকর পদার্থের দলে মিশিয়া যাইত। ইহাতে কখনও কোন সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইত না।

কুমন্ত্রণায় যদিও দুর্য্যোধনের চিত্তের মালিন্য জন্মিয়াছে কুমন্ত্রীর পরামর্শে যদিও দুর্য্যোধন ভ্রাতৃরাজ্য হরণ করিয়াছে; দুষ্টবুদ্ধিতে যদিও দুর্য্যোধন 'দুরাত্মা' বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তথাপি ক্ষত্রিয়তেজ,-ক্ষত্রিয় সাহস ও ক্ষত্রিয় দর্প দুর্য্যোধনকে একবারে ছাড়িয়া পলায় নাই। এই তেজ, এই সাহস ও এই দর্প দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠিরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও যুধিষ্ঠিরের গুণাতিক্রমী হইতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এদৃশ্যাও দেখিতে সুন্দর। মহৎ লোকের সহিত দুষ্টাশয়ের এরূপ বিরোধ এবং মহৎলোকের গুণস্পর্দ্ধী হইতে দুষ্টাশয়ের এরূপ চেষ্টাও কাব্যের উৎকর্ষ-সম্পাদক।

অধিকন্তু, দুর্য্যোধনের চরিত্রে সুরাজগুণের আভাস লক্ষিত না হইলে কাব্যের ঘটনাগত উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইত। কিরাতার্জ্জুনীয়ের ঘটনাগত উদ্দেশ্য, কিরাতবেশধারী ভবানীপতি মহাদেবকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের বাহুবলপরীক্ষা ও তদনন্তর অর্জ্জুনের অরাতিদমন অস্ত্রলাভ। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে অর্জ্জুনের অরাতিপক্ষকে বিশিষ্ট প্রবল ও সহায়সম্পন্ন করা উচিত। প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিলক্ষণ প্রবল না দেখিলে তাঁহার দমন জন্য দুষ্কর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে না। দুর্য্যোধনকে রাজনীতি-কুশল, সসাগরা সদ্বীপার অদ্বিতীয় অধীশ্বর ও রণপণ্ডিত সেনাপতিসমূহে পরিবৃত দেখিয়াই অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের নিমিত্ত ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও জায়া হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন, একাকী হিম-গিরিতে দুষ্কর তপস্যা করেন, এবং পরিশেষে ভবানীপতিকে পরিতুষ্ট করিয়া ধনুর্ব্বেদ লাভ করেন। প্রবল অরাতিপক্ষের দমন জন্য তরুণবয়স্ক বীরপুরুষের এরূপ উৎকট চেষ্টাও দেখিতে সুন্দর। দুর্য্যোধন কৌরবসাগরে নগণ্যজলবিম্ব হইলে তাহার বিলয়জন্য বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সেই দুষ্কর কার্য্য, সেই কঠোর যত্ন অবশ্যই উপহাসকর ও কাব্যের অপকর্ষ-সম্পাদক হইত। ইহাতে কাব্যের কোথাও উদ্ভাবনার পারিপাট্য থাকিত না, কোথাও সৃষ্টির রমণীয় বিকাশ প্রতিবিম্বিত হইত না এবং কোথাও পবিত্র সৌন্দর্য্যের মদালস বিভ্রম লীলা করিত না। অনন্ত জলধরপটলের ছায়ায় যেমন অনন্ত বারিধিবক্ষ কালীময় হইয়া যায়, একটি চরিত্রের কলঙ্কময় প্রতিবিম্বে সেইরূপ কাব্যের প্রতিচিত্রের প্রতিরেখা কলঙ্কময় হইয়া যাইত। দুর্য্যোধনের রাজোচিত গুণ ও রাজোচিত গৌরব অস্থানে বা অসময়ে বিকশিত হয় নাই। কবি চিত্ররঞ্জিত করিয়াই অনেক উদ্দেশ্যের সিদ্ধি ও অনেক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

পৃথ্বীরাজচরিত।

পুরাণে কথিত আছে অবনী দৈত্যদানব-দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইলে ভগবান বিষ্ণু জীব-শরীর ধারণ পূর্ব্বক ভূভার হরণ করিয়াছেন। ফলতঃ সময়ে সময়ে পৃথিবীতে এক একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন হয়, এবং সেই প্রয়োজন সাধন জন্য তাঁহারা অবনীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের স্বীয় জীবনের পৃথক্ অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাইনা, কারণ তাঁহারা এক হইয়া অনেক,—তাঁহারা জাতীয় জীবনের আদর্শ-স্বরূপ। যে দেশে যখন তাঁহারা আবির্ভূত হন,

সেই দেশ ও তৎকালের ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা হইলে তাঁহাদিগের জীবন পাঠ করিলেই হয়; পক্ষান্তরে তাঁহাদিগেব জীবনচরিত জাতীয় ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। নেপোলিয়ান বোনাপার্টী কহিতেন, ফ্রান্স ও আমি এক ও অভিন্ন, আমার জীবনই ফরাসিশ জাতির জীবন! ইহা বৃথা গর্ব্ব নহে, উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসিশ ইতিহাস নেপোলিয়নের জীবন চরিতের ছায়া মাত্র। আমরা উপরে যে মহাত্মার নাম স্থাপন করিলাম, তদীয় জীবনচরিতও তদ্রূপ দ্বাদশ শতাব্দীর হিন্দু জাতির ইতিহাস। আর্য্য জাতি কি ছিল, যদি কেহ জানিতে চান, তিনি পৃথ্বীরাজের চরিত পাঠ করুন। যদি কেহ আর্য্য জাতির পুনরুদ্ধার দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে পৃথ্বীরাজের উন্নতি ও পতনের বিষয় চিন্তা করুন।

পৃথ্বীরাজের কাহিনী পাঠ করিতে করিতে সাহসে মন উৎসাহিত, আনন্দে উৎফুল্ল, ও অভিমানে উন্নত হয়, পৃথ্বীরাজ আর্য্যকুলগৌরবস্থল। আবার পক্ষান্তরে পৃথ্বী-চরিত পাঠে, মনে ক্ষোভ হয়, হতাশ হয়, লজ্জা হয়,—পৃথ্বী আর্য্য জাতির কলঙ্ক।

পৃথ্বীচরিত ঐতিহাসিকদিগের প্রগাঢ় চিন্তার স্থল; নীতিজ্ঞদিগের উপদেশের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল; দেশ-হিতৈষীদিগের স্বদেশহিতৈষণা শিখিবার উৎকৃষ্ট স্থল; এবং কবিদিগের অনুপম ক্রিড়াস্থল। ফলতঃ ইহাতে ইতিহাস, নীতি, কাব্য প্রভৃতির অপর্য্যাপ্ত উপকরণ বিদ্যমান আছে। বিষয়টি এত গুরুতর যে, একটি প্রবন্ধে ইহার শেষ করা দুঃসাধ্য। অথচ এরূপ প্রস্তাব ক্রমশঃ প্রকাশ করিলেও সাময়িক পত্রিকার পাঠকবর্গের প্রীতিকর হয় না। সুতরাং আমরা যথাসাধ্য এক প্রবন্ধেই ইহার শেষ করিব। এই জীবনীটি যে ভাবে লেখা উচিত, হয়ত আমাদের ক্ষমতার দোষে তাহার কিছুই পাঠক ইহাতে দেখিতে পাইবেন না। এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ-প্রয়োজন। পৃথ্বীরাজচরিত ইতিহাসে বিশেষ কিছুই লেখা নাই। কাব্য হইতে ইহার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত বিষয়ের সহিত কবি-কল্পনার এত অধিক মিশ্রণ হইয়াছে যে, কতটুকু কাব্য আর কতটুকু ইতিহাস তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। আমরা এই প্রস্তাবে কাব্যাংশের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা যতদূর সম্ভব তাহা প্রদান করিতে চেষ্টা পাইব। কাব্যিয় উপকরণের আধিক্য দেখিয়া, আমরা একদা একখানি বৃহৎ কাব্য লিখিব বলিয়া স্থির করি, কিন্তু প্রথম সর্গের কিয়দ্দূর রচনা করিয়া নানা কারণে বিরত হই। বর্ত্তমান লেখকের দুটি প্রবন্ধের উপর নির্ভর করিয়া যিনি "পলাসীর যুদ্ধ" রূপ উপাদেয় পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহাকেই আমরা এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রথমে আহ্বান করিতেছি।

৩৬টি রাজপুত নৃপতিবংশের মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইন্দ্রপ্রস্থে তুমার, অজমীরে চোহান, কান্যকুব্জে রাঠোর, এবং গুজ্জরাষ্ট্রে ভগিলা এই চারি বংশই প্রবল ছিল। খ্রীষ্টিয় ৭৯২ অব্দে অনঙ্গ পাল কর্ত্তৃক তুমার বংশের স্থাপিতত্তন হয়। নরসিংহদেব নামধারী * শেষ রাজা ১১৬৪ শাকে রাজত্ব করেন। এই বংশে সর্ব্ব শুদ্ধ ২৬ জন রাজা রাজত্ব করেন। অনহল চোহান বংশের আদিপুরুষ। ৩৮ জন রাজার রাজত্বের পর সোমেশ্বর আজমিরের সিংহাসনে আরোহণ করেন; ইনি তুমার রাজের সহায় হইয়া কান্যকুব্জ প্রভৃতি দেশের রাজাদিগকে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করান। দিল্লীশ্বর নরসিংহ সোমেশ্বরের উপর ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় দুহিতাকে তদীয় হস্তে সম্প্রদান করেন। আমাদের নায়ক এই শুভ পরিণয়ের ফল। ১১৫৯ শাকে শুভলগ্নে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। রাঠোরপতি বিজয় পাল নরসিংহের দ্বিতীয় কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, এবং তদীয় গর্ভে কুক্ষণে আর্য্যকুল-কালিমা কান্যকুব্জাধিপতি নরাধম জয় চন্দ্রের জন্ম হয়।

ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ রাজা নরসিংহদেবের পুত্রসন্তান জন্মে না। সুতরাং স্বীয় দৌহিত্র পৃথ্বীকে অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। তিনি মাতামহের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।* এবং এই হইতেই চোহান ও তুমার বংশের একীকরণ হইল, উভয় দেশই এক অধিপতির শাসনাধীন হইল।

পৃথ্বীরাজ-জনক সোমেশ্বরের অপর এক পত্নীছিল, সে অতি দুশ্চরিত্রা ছিল। কিন্তু সোমেশ্বর তাহাকেই প্রাণপণে ভালবাসিতেন। ...

* টডসাহেবের মতে ইহার নামও অনঙ্গপাল।

* রাজাবলী নামক গ্রন্থে এই বৃত্তান্তটি অন্যরূপে বর্ণিত আছে। যথা— সোমেশ্বরের (প্রাচ দেশের রাজার) অপর এক রাক্ষসী স্ত্রী ছিল। সে নরসিংহের দুহিতার গর্ভজাত প্রথম পুত্রকে ভক্ষণ করে। এবং ক্রমে স্বীয় স্বামীকেও স্বীয় মতাবলম্বী করাইয়া দেশে নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করে। নরসিংহ দুহিতা পতি ও স্বপত্নীর আচরণে ভীতা হইয়া স্বীয় ভ্রাতা জীবন সিংহের (নরসিংহের পুত্র) আলয়ে গমন করেন, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। কালে পিত্রালয়ে পৃথুনামে তাঁহার এক পুত্রজন্মে। জীবন সিংহ অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং ভাগিনেয় পৃথুকেই উত্তরাধিকারী রূপে স্থির করেন। কিছু কাল পরে রাজগিরির রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে জীবনসিংহ তথা গমন করেন, এই অবকাশে পৃথু দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। সমরান্তে জীবন সিংহ স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় ভাগিনেয়ের দুষ্টাচরণ শ্রবণ পূর্ব্বক কোন বাঙ্-নিষ্পত্তি না করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। পৃথু নির্ব্বিবাদে দিল্লীশ্বর হইলেন।

বাসিতেন। ফলতঃ সেই খলমতি কুহকিনীর প্রেম-কুহকে তিনি জড়িত হইয়া কিছু দিন মধ্যে তদীয়হস্তে ক্রীড়াপুত্তলবৎ হইয়া পড়িলেন। এইরূপে স্বামীকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিয়া সেই নর-রাক্ষসী দেশে নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল, ক্রমে দেশ উৎসন্ন হইল, প্রজা ও অধীন সর্দ্দারেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল ফলতঃ কিছু দিন মধ্যে প্রাচদেশে সম্পূর্ণ-অরাজকতা উপস্থিত হইল। প্রধান কর্ম্মচারী, সর্দ্দার ও সাধারণ প্রজাবৃন্দের ভাবগতি বুঝিয়া কৃপাপাত্র সোমেশ্বরকে শত্রুহস্তে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই দুরাচারিণী রাজধানী হইতে রাত্রযোগে একদা পলায়ন করিল।

পৃথ্বীরাজ অজমীরের এই দুরবস্থার কথা শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং সামদানভেদদণ্ড চতুর্ব্বিধ উপায়ে সর্দ্দার, অমাত্য ও প্রজাবৃন্দকে বশ করিয়া পিতাকে পুনর্ব্বার পদস্থ করিতে মনন করিলেন। কিন্তু সোমেশ্বরের উপর প্রজাদিগের এরূপ বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ হইয়াছিল যে, পৃথ্বীরাজ বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিলেন, এবং দিল্লী ও অজমীর সংযুক্ত রাজ্যে স্বীয় একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। *

ঘটনাচক্রে পৃথ্বী দিল্লীশ্বর হইলেন, পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং অজমীরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই উভয় ব্যাপারে তাঁহার অপরাধ কি? নেপোলিয়ান কহিতেন আমি "ঘটনার সন্তান" † ফলতঃ মনুষ্য মাত্রেই ঘটনার অধীন। একথায় কেহ যেন এরূপ মনে করেন না যে, আমরা মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছামতের বিরোধী। মনুষ্য যন্ত্র নহে, ইচ্ছা বিশিষ্ট জীব, সত্য; কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকে এরূপ ঘটনাজালে পরিবেষ্টিত হইতে হয়, যে ইচ্ছার প্রতিকূলেও তাঁহাকে ঘটনাস্রোতে শরীর ঢালিয়া দিতে হয়। আমাদের নায়ককেও তাহাই করিতে হইয়াছিল; কিন্তু "উদয়মুখী প্রতিভার নিত্য-বিদ্বেষিণী ঈর্ষা" তদীয় অনিষ্ট সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন লোলুপ ক্রুরমতি জয়চন্দ্র সঞ্চিত অভিলাষপরাঙ্মুখ হইয়া পৃথ্বীর ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন; অসূয়াপরবশ হইয়া তাঁহার নানারূপ দুর্ণাম রটনা করিতে লাগিলেন; কিছু দিনের মধ্যে দিল্লীর অধীন ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্বাধীন ভূপতিবর্গ পৃথ্বীরাজের ভয়ানক শত্রু হইয়া উঠিলেন। জয়চন্দ্রের মন্ত্রণায় পত্তন আনহালবার রাজা ও মন্দরের পুরিহর বংশীয় রাজারা পৃথ্বীর অধীনতা অস্বীকার করিলেন। এই সময়ে হিন্দু ভূপতিগণ দুইটি দলে বিভক্ত হইলেন।

* রাজাবলীর মতে সোমেশ্বরের প্রার্থনানুসারে পৃথু তাঁহার মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক রাক্ষসী-সহবাস-পাপ হইতে উদ্ধার করেন।

† Child of circumstances.

লৌহ-দৃঢ়-কলেবর পত্তনেশ্বর ভোলা ভীম দেব; ধ্রুবতারাসদৃশ সমরে অটল প্রমরাবংশাবতংশ জীতমাল, দিল্লী-বিপক্ষদলের নিকট করগ্রাহী মেয়োরাধিপ সমর সিংহ ও মন্দরাধীশ্বর মাক্কুল-পতি নির্ভীক মহামানী নেহার রাও জয়চন্দ্রের পক্ষ। চিতোর, নাগোর, সিন্ধু, জলবৎ, পেশোয়ার, লাহোর, কাঙ্গারা, কাশী, প্রয়াগ, ও দেবগড় প্রদেশসমূহের অধিপতিগণ পৃথ্বীরাজের পক্ষ। সিমারের রাজারাও ভয়ে পৃথ্বীরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বীরকেশরী যোগীন্দ্র চিতোরাধিপতির কিঞ্চিৎ বিবরণ এই স্থলে বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক।

১২০৬ খ্রীষ্টিয় শাকে সমরশায়ী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কুলদেবতা মহাদেবের পরমভক্ত ছিলেন। জনকরাজর্ষির ন্যায় শিরে জটাজুট, গ্রীবায় কমল-পুষ্প-বীজমালা; ও কটীতটে রক্তাম্বর ধারণ করিতেন। এদিকে সমরে অসম সাহস, অপ্রতিমেয় স্থৈর্য্য ও অদ্ভুত নৈপুণ্য ছিল, এবং মন্ত্রণায় পরিণামদর্শিতা, প্রাজ্ঞতা, ও কৌশল ছিল। উদ্দীপনাবিষয়ে প্রধানবাগ্মী, আচরণে পরমধার্ম্মিক ও সভ্য ছিলেন। স্বীয় প্রজা ও অধীনবর্গের যার পর নাই অনুরাগ-ভাজন ছিলেন। সমরশায়ী পৃথ্বীরাজের ভগিনীকে পরিণয় করেন; এবং তাঁহার সহিত ইহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য ও বন্ধুতা ছিল। পৃথু ইহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, এবং ইহার পরামর্শ ভিন্ন কোন কর্ম্ম করিতেন না।

... উল্লেখ হইয়াছে যে মন্দরাধিপ পুরিহর (বা, মাক্ক) বংশোদ্ভব নেহাররাও জয়চন্দ্রের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। পুরিহর বংশীয়েরা তুমার ও চোহান বংশীয়দিগের করদ প্রজা ছিলেন। নেহার জয়চন্দ্রের কুমন্ত্রণায় বার্ষিক কর প্রদানে বিরত ও স্বাধীন হইতে উদ্যত হন। মহাবীর পৃথ্বীরায় অচিরে তদীয় গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া নিয়মিত কর প্রদানে বাধ্য করিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে কাটীরাজপুতেরা যুদ্ধ বিষয়ে অতি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইহারা পৃথু ও জয়চন্দ্রের অধীনে থাকিয়া বহুযুদ্ধ করে। ঝালার রাজপুতেরাও উভয় পক্ষেই যোগ দেন। পৃথু দর বা দদ নামা ঝালার রাজাকে সমরে পরাভূত করিয়া তদ্দেশে এক কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন। ফলতঃ কিছুদিনের মধ্যে মহাবীর অথচ মন্ত্রণাকুশল পৃথ্বীরাজ সমস্ত রাজপুতদিগকে একপ্রকার বশতাপন্ন করেন। কেহ ভয়ে, কেহ মৈত্রিতে, কেহবা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, তদীয় প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। পরিশেষে কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্র ভিন্ন আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। এই জয়চন্দ্রের সহিত ক্রমাগত কলহে উভয় পক্ষ হীনবল হইয়া পড়ে, সেই সুযোগে ভারতের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

বায়েনার দাহিম নামক রাজার দুই

কন্যা ও তিন পুত্র ছিল। এক কন্যাকে পৃথ্বীরাজ বিবাহ করেন, এই কন্যার নাম পৃথা। অপর কন্যা মেওয়া রাজা বিবাহ করেন। চাঁদ কবি কহেন যে, পৃথার যৌতুকস্বরূপ দিল্লীশ্বর আটজন পরম রূপবতী সখী, ত্রিষষ্টীটি দাসী, পারস্য দেশজাত একশত অশ্ব, দুইটি গজ, দশটি চর্ম্ম, ও একটি স্বর্ণরৌপ্যখচিত বহুমূল্য শয্যা প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত পৃথাকে কাষ্ঠনির্ম্মিত শত পুত্তলিকা, শত রথ, ও শত স্বর্ণমুদ্রা প্রদত্ত হয়। কিন্তু দাহিমতনয়ত্রয়কে সহায় পাইয়া দিল্লীশ্বরের যে মহোপকার হয়, তাহার সহিত তুলনায় এসকল বহুমূল্যরত্ন অতি অকিঞ্চিৎকর। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কায়মসকে পৃথু প্রধান সচিবের পদে নিযুক্ত করেন, ইনি মন্ত্রণায় বৃহস্পতিতুল্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় যে অন্যায়রূপে স্বীয় পত্নীর সতিত্বের উপর সন্দেহ হওয়াতে অকালে আত্মহত্যা করেন। পুন্দির নামা দ্বিতীয় ভ্রাতা একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। ইনি প্রথমে রাজসমীপে অমাত্য রূপে নিযুক্ত থাকেন, পরে লাহোরের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে বরিত হন। ইহার সহিতই সাহাবুদ্দিনের প্রথম যুদ্ধ হয়, এবং সেই যুদ্ধেই ইনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ চাঁদরাও থানেশ্বরের যুদ্ধে প্রধান সেনানী ছিলেন, ইহার বিষয় পরে বর্ণিত হইবে। মুসলমানেরা ইহাকে খাণ্ডীরাও বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং ফেরেস্তা ইহার শৌর্য্য বীর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সাহাবুদ্দিনের সহিত সমরই পৃথু নাটকের শেষ অঙ্ক। তাহার অভিনয়ের পূর্ব্বে পৃথ্বীর জীবনচরিত সম্বন্ধে আমরা আরো দুই একটি বিবরণের উল্লেখ করিব। পৃথুর সহিত জয়চন্দ্রের মনোবাদের প্রথম কারণ পৃথুর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ ও অচির উন্নতি। ইহার যথাযথ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। নাগোরকোটস্থ প্রভূত সঞ্চিত ধনলাভ দ্বিতীয় কারণ; রাজসূয়যজ্ঞে পৃথ্বীরাজের অনাগমন তৃতীয় কারণ; এবং পৃথ্বীরাজের সহিত জয়চন্দ্র দুহিতার পরিণয় দিতে অসম্মতি চতুর্থ কারণ। আমরা ক্রমে এই তিনটি কারণের সংক্ষেপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

নাগরকোটনগরে পূর্ব্বতম কোন নৃপতির সঞ্চিত সপ্ততিলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা নিহিত ছিল। পৃথ্বীরাজ তাহা হস্তগত করিতে বাসনা করেন। কিন্তু জয়চন্দ্র যবনরাজ সাহাবুদ্দিন ও পত্তনরাজ ভীমদেবকে সহায় করিয়া তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে চেষ্টা করেন। তখন দিল্লীশ্বর স্বীয় কুটুম্ব ও সচিব পুন্দিরকে চিতোরনগরে দূত স্বরূপ প্রেরণ করেন, এবং সমরশায়ীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সমরশায়ী স্বীয় প্রিয়তম তনয় কর্ণের হস্তে রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া পৃথ্বীরাজের সাহায্যার্থ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করেন। প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে থাকিতে পৃ-

থ্বীরাজ অমাত্যবর্গসহ অগ্রসর হইয়া স মাদরে সমরশায়ীকে গ্রহণ করেন। উভয়ে মন্ত্রণাপূর্ব্বক এই স্থির করিলেন যে পৃথ্বীরাজ ভীমদেবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন, সমরশায়ী সাহাবুদ্দিন ও জয়চন্দ্রের প্রতিকূলে গমন করিবেন। এই মন্ত্রণার পর সমরশায়ী নাগরকোটে উপস্থিত হইয়া প্রবল শত্রুদ্বয়ের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কোন পক্ষেই জয় পরাজয়ের সম্ভাবনা কিছু দৃষ্টহইল না। ইতিমধ্যে পৃথ্বীরাজ ভীমদেবকে পরাস্ত করিয়া নাগরকোটে যাইয়া সমরশায়ীর অনুবল হইলেন। প্রজ্বলিত ভীষণ দাবানলে প্রবল-প্রভঞ্জনের সংযোগ হইল; আর কার সাধ্য যে সে অনলপ্রবাহের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে? জয়চন্দ্র ও সাহাবুদ্দিন সত্বরই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়নপরায়ণ হইলেন। নাগর কোটের বিপুল স ম্পত্তি বিজয়িদিগের হস্তগত হইল; কিন্তু সমরশায়ী তাহার কপর্দ্দক ও স্পর্শ করিলেন না, সকলই পৃথুকে অর্পণপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

দ্বিতীয়তঃ জয়চন্দ্রের অনঙ্গমুঞ্জরী নামে এক পরমরূপবতী দুহিতা ছিল। কন্যা বয়স্থা হইল, কিন্তু মনোমত বর জুটে না। তখন রাজসূয়যজ্ঞব্যাপদেশে পাত্র নির্ব্বাচন করিতে মনস্থ করিলেন। সেই মহাযাগের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রণ পাইয়া দিগ্ দিগন্তর হইতে ভূপতিবৃন্দ কান্যকুব্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেবল জয়চন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া পৃথ্বীরাজ তথায় গমন করিলেন না। এই ব্যাপারের নিয়ম এই যে হোমাদের সমস্ত কার্য্য মুকুটধারিদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হওয়া প্রয়োজন। পৃথ্বীরাজের অনুপস্থিতিনিবন্ধন হোমের অঙ্গহানির আশঙ্কা হইল। পরে পণ্ডিত দিগের ব্যবস্থা লইয়া পৃথ্বীরাজের এক স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইলেন; এবং তাঁহার উপর জাতক্রোধ বশতঃ তাঁহাকে দ্বারবানের স্থানীয় করিয়া যজ্ঞসভার দ্বারে স্থাপন করাইলেন। লোকপরম্পরায় এই সংবাদ পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি শ্রবণমাত্র ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া সসৈন্যে কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বীরকেশরী দিল্লীশ্বরের হস্তে জম্বুকোপম জয়চন্দ্র শীঘ্রই পরাজিত ও হতমান হইলেন। দ্বারস্থিত কাঞ্চন-প্রতিমা লইয়া পৃথ্বীরাজ জয়োল্লাসে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ অঙ্গহীন হইয়া কোনমতে সমাপ্ত হইল; পৃথ্বীরাজের প্রতি জয়চন্দ্রের বিদ্বেষ ভাব অধিকতর প্রবল হইল। বিজয়ী পৃথু যখন পরাস্ত নৃপতিবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া হোমপ্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া স্বদেশগমননিমিত্ত স্বীয় সৈন্যদিগকে অনুমতি করিতেছেন, এমন সময়ে তদীয় মস্তকে পার্শ্ববর্ত্তী প্রাসাদ হইতে পুষ্পবৃষ্টি

হইল; পৃথু উর্দ্ধভাগে নয়নপাত করিলেন, অমনি এক অনুপমা সুন্দরীর চক্ষে আপন চক্ষু মিলিত হইল।

জয়চন্দ্র যে অভিপ্রায়ে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন তাহা নিষ্ফল হইল, নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গমধ্যে অনঙ্গমুঞ্জরীর মনোমত বর মিলিল না। হোম প্রাঙ্গনে যে বিজয়ী যুবকের প্রতি নয়ন আকৃষ্ট হইয়াছিল, মন তাঁহার পশ্চাতে গিয়াছে, মনের মত বরকে মনে মনে বরণ করিয়াছেন, অন্যবরে মন আর যাইবে কেন? যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, জয়চন্দ্র একদা দুঃখিত হইয়া তনয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কাহাকে পতিত্বে বরণ করিবে? অনঙ্গমুঞ্জরী প্রথমতঃ কোনও উত্তর করিলেন না। পরিশেষে পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয় অতিক্রম করিতে নাপারিয়া যে একটি নাম করিলেন, তাহা শুনিবামাত্র জয়চন্দ্রের আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া গেল। চিরশত্রু পৃথ্বীরাজকে কন্যাসম্প্রদান অপেক্ষা তাহাকে জলে নিমজ্জনও শ্রেয়ঃ। দুহিতাকে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন; অনঙ্গমুঞ্জরী পিতৃ-নিষ্কাষিতা হইয়া কোন আত্মীয়ের গৃহে রহিলেন। কিছু দিন মধ্যে এই কথা পৃথুরায়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পত্রসহ চন্দ্রভাটকে কান্যকুব্জে প্রেরণ করিলেন। তিনি জানিতেন প্রাণসত্ত্বে জয়চন্দ্র এ পরিণয়ে সম্মত হইবেন না, অতএব স্বদলবলে স্বয়ংও দূতের অনুগমন করিলেন। এবং জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া অনঙ্গমুঞ্জরীকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। মহাসমারোহে পরিণয় সমাধা হইল। বিধাতার চক্র বুঝাভার। কোন দুর্লক্ষ্য সূত্রে কি ঘটে লোকে তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারে না।

নবপ্রণয়িণীর রূপলাবণ্যে বীরকুলর্ষভ প্রজারঞ্জক পৃথ্বীরাজ মোহিত হইয়া শৌর্য্য বীর্য্য বিস্মৃত হইলেন, প্রজাপালন ও রাজ্যশাসনে বিরত হইলেন। অমাত্যবর্গের হস্তে সমস্ত কার্য্য ন্যস্ত করিয়া সমস্ত দিন অন্তঃপুরেই অতিবাহিত করিতেন। রাজকার্য্যে নৃপতির ঈদৃশ ঔদাস্যাবলোকনে রাজ্যমধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। পশ্চিমে যে বিতস্তিপ্রমাণ মেঘ দেখা দিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বৃহদাকার ধারণ পূর্ব্বক ঘোরতর ঘনঘটারূপে, প্রচণ্ড প্রভঞ্জনরূপে ভারতাকাশে সহসা উদয় হইল। ভারত-শত্রু সাহাবুদ্দিন-যবন ভারতবক্ষে দিগ্বিজয়িরূপে পদার্পণ করিল। ইতিপূর্ব্বেও একদা নাগরকোট নগরে উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে অন্যভাবে। অর্থলোভে জয়চন্দ্রের মন্ত্রণায় আসিয়াছিল, অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেও তখনই জানিয়া যায় যে পৃথু ও জয়চন্দ্রের গৃহবিবাদে ভারত ক্রমে দুর্ব্বল ও বীরশূন্য হইতেছে। এতদিন ধূর্ত্ত শৃগালের ন্যায় সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল, এইক্ষণ কুলাঙ্গার জয়চন্দ্রের আম-

ব্রূপে ভারতবিজয় সঙ্কল্প করিয়া উপস্থিত হইল।

যে গৃহ-বিবাদে দশাননের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল; যে গৃহ-বিবাদে কুরুকুল নির্ম্মূল হইয়াছিল; পুনশ্চ ভারতে সেই সাঙ্ঘাতিক রোগ যে দিন উপস্থিত হইল, সেইদিনেই ভারতবাসী হিন্দুগণের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। সেই দিনই জানা কর্ত্তব্য ছিল যে সেই ভয়ানক রোগ চরমে কি শোচনীয় ফল প্রসব করিবে। কিন্তু হায়! কাহারই চৈতন্য হয় নাই! সেই পাপে অদ্য পবিত্র ভারতবক্ষে ম্লেচ্ছের পদাঘাত! কুলাঙ্গার জয়চন্দ্র,কি করিলে? এ পাপের ভোগ কি তোমায় ভোগিতে হইবেনা? কিন্তু, আমরা কি লিখিতে কি লিখিতেছি? পাঠক, মার্জ্জনা কর, শুন তৎপর কি হইল।

সাহাবুদ্দিন লাহোরের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, তত্রত্য শাসনকর্ত্তা মহাবীর পুন্দির সসৈন্যে তদীয় পথাবরোধ করিলেন। ঘোরতর সংগ্রামের পর পুন্দির নিহত হইল, বিজয়োৎফুল্ল যবন সেনা "আল্লাহু আকবর"। ঘোর রণনাদে দিগন্ত কম্পিত করিয়া সগর্ব্বে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই বিবরণ পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইল, কিন্তু তাহাতেও তিনি বিপদ অনুভব করিতে পারিলেন না। সাহাবুদ্দিন দিল্লির সীমায় পদার্পণ করিলেন, তখনও পৃথু ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত। ক্রমে থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী নারায়ণ গ্রামে * উপস্থিত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিল। পৃথ্বীরাজের প্রিয়পাত্র চন্দ্র ভাট যাইয়া এই কুসংবাদ তাঁহাকে প্রদান করিল। তখন নিদ্রিত শার্দ্দূলের ন্যায় শূর-সিংহ পৃথ্বীরাজ গর্জ্জিয়া উঠিলেন। ইঙ্গিত মাত্র ঘোর রোলে রণশঙ্খ ও রণভেরী বাজিয়া উঠিল; নানাদিকে অধীনরাজবর্গকে আহ্বান করিতে দূত প্রেরিত হইল; শিক্ষিত সৈন্যদলের আস্ফালনে নগর টলমল করিতে লাগিল। তখন রাজপুতনায় সৈনিক-শাসন-প্রথা † প্রচলিত ছিল, সুতরাং দেশে যত লোক, সকলেই সৈনিক, সকলেই সমর-কুশল, সকলেই সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত। সুতরাং দুই এক দিনে লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ হইল; এবং ক্রমেং অধীন নৃপতিবর্গও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৃথু ও জয়চন্দ্রের গৃহবিবাদে যাঁহারা পৃথ্বীরাজের বিপক্ষ ছিলেন, ভারতের সাধারণ শত্রুদমন করিতে হইবে বলিয়া, তাঁহারা শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া একত্রে বন্ধুভাবে মিলিত হইলেন। আহা! ভারতের সে এক সুখের দিন গিয়াছে!

চিত্ররথ গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক দুর্য্যোধন স-

* বোধহয় এলফিনিষ্টোন প্রভৃতি ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরা ইহাকেই "টিরোরি" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

† Feudal system. টড্ সাহেব কৃত রাজস্থানের ইতিহাস দেখ।

গ্রীক বন্দীকৃত হইলে, যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য ভীমার্জ্জুনকে আদেশ করিলেন। ভীমার্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, " মহারাজ, আপনকার এ কিরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি, আমরা বুঝিতে পারিনা। যে শত্রু আমাদিগকে এত কষ্ট ও এত লাঞ্ছনা দিল, সে বিনষ্ট হইলেত পরম আহ্লাদের বিষয়। তাহাকে কিজন্য উদ্ধার করিতে যাইব ? " উদারচরিত্র-প্রশান্তমনা ধর্ম্মতনয় সোদরদ্বয়কে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—

" কহিলা যতেক পার্থ অন্যথা নাকরি।
সে মম পরম শত্রু আমি তার অরি ॥
আত্ম পক্ষে ঘরে দ্বন্দ্ব করিব যখন।
তারা শত সোদর আমরা পঞ্চজন ॥
সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত।
তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত ॥ "

কাশীরাম দাস। *

ধন্য যুধিষ্ঠির! ধন্য আর্য্যসন্তান! ধন্য ভারতবর্ষ! আহা! এরূপ উদার ভাব এইক্ষণ আর দেখা যায় না। তাহাতেই ভারতের এদুর্দ্দশা। জয়চন্দ্রের সহিত আত্ম-কলহে পৃথ্বীরাজের অসংখ্য সৈন্য নাশ হইয়াছিল, ১০৮ জন সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে মাত্র ৬৪ জন জীবিত ছিল। যাহা হউক, তথাপি দ্বিলক্ষ পদাতী, দ্বিলক্ষ অশ্বারোহী, এবং তিনসহস্র সমর-মাতঙ্গ লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। চিতোরাধিপ সমরশায়ী প্রধান সেনানীপদে বরিত হইলেন। তিন দিবস উভয় পক্ষ পরস্পরকে কিছুই বলিলেন না। চতুর্থ দিবস প্রত্যুষে যুদ্ধারম্ভ হইল।

সাহাবুদ্দিন স্বীয় সৈন্যের পুরোভাগে অশ্বপৃষ্ঠে উপবেশন পূর্ব্বক, তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, " বীরগণ! তোমরা জয়লোলুপ হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এই কাফেরের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। তোমরা পঞ্জাব জয় করিয়াছ, লাহোর জয় করিয়াছ, এবং সিন্ধুদেশও জয় করিয়াছ সত্য; কিন্তু সে সকল স্থান তোমাদের স্বদেশ মধ্যেই বলিতে হইবে। এবং যেসকল বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, তাহারাও আমাদের সমধর্ম্মী এবং একইরূপ রণকৌশলসম্পন্ন। অদ্য তোমরা প্রবল সিন্ধু নদের পর পারে উপস্থিত হইযাছ, পৃষ্ঠদেশে খরস্রোতা কাগার নদী বহিতেছে; যদি তোমরা কাফের সৈন্য দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়নে চেষ্টা কর, পলায়ন করিতে পারিবে না। কাগার তোমাদের পথ রোধ করিবে, এবং কাফেরের হস্তে একজনও রক্ষা পাইবে না। যুদ্ধ করিয়া যদি পরাভূত হও, তাহাতেও যে ফল, যুদ্ধ না করিয়া প্রস্থানপরায়ণ হইলেও সেই ফল। সুতরাং শৃগালের ন্যায় প্রস্থান না করিয়া সিংহ-বিক্রমে প্রাণপণে যুদ্ধ করাই আ-

* " প্রাচীন রোমের গীতি " নামক লর্ডমেকলের প্রথম প্রবন্ধের চরমভাগ দেখ।

মাদের উচিত। জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই, যদি আল্লার দোওয়ায় জয় লাভ করিতে পার, তবে এই সম্মুখস্থিত বিশাল রাজ্য, ও ভারতের মণিকাঞ্চন তোমাদিগেরই। আমি তোমাদিগের প্রভু বটি, কিন্তু এসকল আমার হইলে তোমরা যথাযোগ্য অংশলাভে কেহই বঞ্চিত হইবে না। আমার পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই যুদ্ধে জয়ী হইলে তোমাদের পরমারাধ্য মুসলমান ধর্ম্মেরই জয়। এই ধর্ম্ম-যুদ্ধে যদি প্রাণও যায়, তথাপি স্বর্গে যাইয়া সুরমা-নয়না পৈরীদিগের সহবাসে থাকিয়া শত্রু-করোটীতে সুস্বাদু সুরাপান করিতে পারিবে। মনোহর আলয়ে বাস; সুমিষ্ট খাদ্য; শত শত সুন্দরী রমণী; এসকলই অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারিবে।* এপৃথিবীর সুখ অল্পকাল স্থায়ী, কিন্তু স্বর্গীয় সুখ অনন্তকাল স্থায়ী। অতএব এ যুদ্ধের মৃত্যুও মঙ্গল। সুতরাং সাহসকর, অগ্রসর হও, শত্রুমুণ্ড চ্ছেদন কর।" ইহা কহিয়া শরাসন হইতে একটি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে সরিয়া গেলেন। শ্মশ্রুধারী যবন-অশ্বারোহীগণ "আল্লাহু আকবর!" বলিয়া গগন কাঁপাইয়া নক্ষত্রবেগে শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইল।

পৃথ্বীরাজ স্বীয় সৈন্যগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। দক্ষিণ-পার্শ্বিক সৈন্যের ভার স্বহস্তে রাখিলেন, বাম পার্শ্ব মহাবীর চাঁদরাওয়ের হস্তে ন্যস্ত করিলেন; অধিকাংশ-অশ্বারোহী-সম্বলিত সৈন্যের মূলভাগ বীরকুলচূড়ামণি সমরে অটল সমরশায়ীর অধীনে ছিল। নির্দ্ধারিত হইল যে সমরশায়ী বিপক্ষ সেনার কেন্দ্রস্থান লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইবেন, এবং সাহাবুদ্দিন ও অপরাপর মহম্মদীয় সেনাপতিদিগকে সেস্থ রক্ষা করিতে নিযুক্ত রাখিবেন। ঠিক সেই সময়ে পৃথ্বীরাজ ও চাঁদরাও বিপক্ষের উভয় পার্শ্ব আক্রমণ করিবেন। এইরূপ সুব্যবস্থা করিয়া পৃথ্বীরাজ এক ভীষণ সমর-মাতঙ্গে আরোহণ করিলেন। এবং অসিচর্ম্ম তিনবার তাড়িতবেগে দোলায়মান করিয়া সৈন্যগণের চিত্তাকর্ষণ করিলেন। সকলই নীরব, নিস্তব্ধ, স্থির ও অটল। তখন জলদগম্ভীর শ্রুতিসুখকর অথচ চিত্ত-উত্তেজী স্বরে কহিলেন "রাজপুতকুল ললামবীরবৃন্দ! তোমরা প্রাতস্মরণীয় বাপ্পারাও ও মহাবীর খুমানের বংশধর, এই কথাটি যেন স্মরণ থাকে। দুরাত্মা ম্লেচ্ছদুরাচার একবার নাগরকোটে তোমাদের অসির তেজ অনুভব করিয়াও পুনরায় পতঙ্গবৎ জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইতে আসিয়াছে। এবার বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া তোমাদিগকে পরাস্ত করিতে; তোমাদিগের স্ত্রীপুত্রকে অনাথ করিতে; স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী জন্মভূমিকে জয় করিতে আসিয়াছে! একি সামান্য আস্পর্দ্ধা! বীরপ্রসূ রাজ-

---

* সেলসকোরাণ ৭০, ১৪০, ১৪৯, ১৫১, ২৭৮, ৪৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।

স্থানে যবনের পদার্পণ। আশ্চর্য্য, বেদমাতা রাক্ষসী ইহাদিগকে এখনও গ্রাস করেন নাই! আশ্চর্য্য, কুলদেবতা একলিঙ্গ মহাদেব স্বীয় সর্ব্বসংহারক শূলে ইহাদিগকে নির্ম্মূল করেন নাই। দেবতারা দেখিবেন রাজস্থানে বীর আছে কি না? তাঁহারা তোমাদের শূরত্বের পরীক্ষা করিতেছেন? তবেকি আর এখনও নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে? আর এক মুহূর্ত্তও কি পবিত্রা জন্মভূমিকে ম্লেচ্ছপাদরেণুতে কলঙ্কিত দেখিবে? স্বীয় স্ত্রী পুত্রদিগকে ভীরুরাও রক্ষা করে। কাপুরুষেরাও স্বীয় কুলদেবতাদিগকে রক্ষা করে। আর অগ্নিকুলসম্ভূত দেবসন্তান রাজপুত কি ভীরু হইতেও অধম? বাপ্পারাওয়ের সঙ্গে সঙ্গে খুমানের সঙ্গে সঙ্গেই কি রাজস্থানের বীরত্ব লোপ পাইয়াছে? পৃথ্বীরাজের শরীরে প্রাণ থাকিতে, তোমাদিগের ন্যায় সমর বজয়ী বীরকুল তাঁহার সহায় থাকিতে সে আশঙ্কা নাই। ঐ দেখ শত্রুর তীক্ষ্ণশর শন্ শন্ করিয়া আসিতেছে, আর বিলম্ব কেন? দৃঢ় মুষ্টিতে অসি ধারণ কর; কটীবন্ধন কর; অগ্রসর হও। জয় অসুর-নাশিনী বেদমাতা! জয় হর হর একলিঙ্গ।* " ইহা বলিয়া পৃথ্বীরাজ হুঙ্কার ছাড়িলেন, সেই হুঙ্কারের সহিত সহস্র সহস্র বীরগর্জ্জন মিশিল, রণভেরী ঘোররোলে বাজিল। চতুর্দ্দিকে "জয় অসুর নাশিনী বেদমাতা," "জয় হর হর একলিঙ্গ" ভয়ঙ্কর রণনিনাদ উত্থিত হইল, অসি ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল, দিঙ্মণ্ডল ঘোর কোলাহলে পরিপূর্ণ। হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষারব, পদাতিক ও অশ্বারোহীদিগের আস্ফালনে যুগপ্রলয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক ধূলী ও কলম্বকুলে আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে কেবল "মার্ মার্" "কাট্ কাট্" শব্দ শুনা যাইতে লাগিল, কিন্তু কয়েক দণ্ড আর কিছুই শ্রবণ বা দর্শন হইল না।

পূর্ব্বনির্দ্দেশ মতে সমরশায়ী শত্রু সৈন্যের কেন্দ্রভাগ, ও পৃথ্বীরাজ ও চাঁদরাও উভয় পার্শ্ব যুগপৎ আক্রমণ করিলেন। সমর-মাতঙ্গ ও রাজপুত সেনার বিক্রম দেখিয়া মহম্মদীয় পার্শ্বিক সৈন্যেরা ভীত হইল; এবং ক্রমে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কেন্দ্রস্থ সে তখন সাহাবুদ্দীন ও সমরশায়ীতে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। বহুক্ষণ পরে সাহাবুদ্দিন সমরশায়ীর উপর এরূপ বেগে বর্শা-

* আমরা এস্থলে চরিতাখ্যায়কদিগের পদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কবিদিগের অনুসরণ করিয়াছি। ডাক্তর ফ্রিমেন সেন্‌লাকের যুদ্ধের পূর্ব্বে উইলিয়ম ও হেরল্ডের মুখে যেরূপ বক্তৃতা দিয়াছেন, (নর্ম্মান-কঙ্কোয়েষ্ট ৩ বালাম ৪৫৫ ও ৪৬৮ পৃষ্ঠা) আমরা তাহারই অনুকরণ করিয়াছি। বোধ হয় ইহাতে ঐতিহাসিক সত্যের কোন অপমান হয় নাই। ইহাতে আমরা যদি দোষী হই, তবে অনেক চরিতাখ্যায়ক ও ঐতিহাসিকই দোষী।

ঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতেই তাঁহার প্রাণনাশ হইত, সহসা তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া মহাবীর চাঁদরাও অগ্রসর হইলেন। তাঁহার রণকৌশলে মহম্মদীয় সেনারা বাতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তিনি এরূপ লঘুহস্তে অসিচালন করিতে লাগিলেন যে, এক এক আঘাতে এক এক জনের মুণ্ড ভূমিসাৎ করিতে লাগিলেন। এমন সময় দক্ষিণ পার্শ্ব পরাস্ত করিয়া পৃথ্বীরাজ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু চাঁদরাওয়ের অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল দেখিয়া পৃথ্বী ও সমরশায়ী নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে এবং একএকবার উৎসাহ দিতে লাগিলেন। নৃপতিও মহাবীর সমরশায়ীর উৎসাহ পাইয়া দ্বিগুণিত বিক্রমে চাঁদরাও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। একজন বীরের তেজে স্বীয় বহু সৈন্যের নাশ দেখিয়া সাহাবুদ্দিন চাঁদরাওয়ের প্রতি এরূপ বেগে আঘাত করিলেন যে, ছিন্ন শির হইয়া সেই শূরশ্রেষ্ঠ রণভূমিতে পতিত হইলেন। প্রিয়তম সেনানীর মৃত্যু দেখিয়া শোকে ও ক্রোধে পৃথ্বীরায় স্বয়ং সাহাবুদ্দিনকে আক্রমণ করিলেন। দুই এক মুহূর্ত্ত মধ্যে তদীয় বিশাল খড়্গের আঘাতে যবনরাজ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন। ভারতের নিতান্ত কপাল ভাঙ্গিয়াছে, ভারতের সর্ব্বনাশ হইবে, তাই বলিয়াই কেবল তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইলনা। স্বীয় সৈন্যেরা অচেতন সাহাবুদ্দিনকে ফেলাইয়া যুদ্ধ ভঙ্গ দিয়া মেষপালের ন্যায় পলায়নপরায়ণ হইল। সমরশায়ী বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অনুসরণপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থের সীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। লজ্জা ও ক্ষোভে সাহাবুদ্দিন অবশিষ্ট কতিপয় সৈন্য লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

থানেশ্বর সমরক্ষেত্র হইতে পরাস্ত ও হতমান হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর সাহাবুদ্দিন আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু সে অপমান দগ্ধ অঙ্গারবৎ তদীয় হৃদয়ে ধক্ ধক্ করিয়া সর্ব্বদা জ্বলিত। ফেরেস্তা কহেন "একদিনের তরে তিনি সুখে নিদ্রা যান নাই; এবং জাগ্রত হইয়া ও কেবল শোকে ও লজ্জায় দগ্ধ হইতেন।" * যে সকল সৈন্য ও সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে নানামতে অপমান করেন এবং লাঞ্ছনা দিয়া অনেককে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেন। এইরূপে দুই বৎসর গত হইল।

এই সময়মধ্যে তুরস্ক, তাজিক, আফগান প্রভৃতি সুশিক্ষিত ১২০,০০০ অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিক সংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয়বার ভারতাভিমুখে যাত্রাকরিলেন। এই সৈন্যদিগের মধ্যে অনেকের উষ্ণীষ মণিমুক্তা খচিত, ও বর্ম্ম রজতকাঞ্চনে সুশোভিত ছিল। † দিল্লীশ্বরও

* ব্রিগ্‌স ফেরেস্তা ১ম বালম ১৭৩ পৃ।

† ঐ। মার্স মেনকৃত ভারত ইতিহাসে ১ ম বালম ৬০ পৃ।

সাহাবুদ্দিনের অতিথিসৎকার করিতে অপ্রস্তুত ছিলেন না। সার্দ্ধশত হিন্দু নৃপতি দিল্লীশ্বরের অনুবল হইলেন, সর্ব্বশুদ্ধ তিন লক্ষ অশ্বারোহী, তিন সহস্র সমরমাতঙ্গ, এবং অসংখ্য পদাতি সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার থানেশ্বর সমরক্ষেত্রে কাগার নদীর পূর্ব্বপারে যাইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। ভারতীয় ভূপতিগণের জয় বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস, যবন বলিয়া ক্রক্ষেপ নাই। ভাগিরথীর পবিত্র সলিল স্পর্শ করিয়া সকলেই শপথ করিয়াছেন, হয় যুদ্ধে জয়ী হইব, নতুবা প্রাণত্যাগ করিব *। হিন্দু নৃপতিগণ সাহাবুদ্দিনকে বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি তোমার স্বীয় জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মিয়া থাকে, তথাপি এতগুলি লোকের পরিবারদিগকে কেন অনর্থক অনাথ করিবে? যদি প্রস্থান করিতে চাও, পথ পরিষ্কার আছে। যদি নিতান্তই মরিতে ইচ্ছাহইয়া থাকে তবে অগ্রসর হও। আমরা দেবতার নাম করিয়া শপথ করিয়াছি, রজনীমধ্যে প্রস্থান না করিলে নিশি অবসান মাত্র শত্রুব্যূহ-ভেদী সমর মাতঙ্গ, আহবামোদে-উন্মত্ত যুদ্ধাশ্ব, এবং শোনিত-পিপাসু সৈনিক লইয়া তোমাকে আক্রমণ করিব।* এবং তোমার হতভাগ্য সৈন্যকে পদে দলিত করিব।"*

ধূর্ত্ত যবন যেন এই সগর্ব্ব বাক্যে ভীত হইয়াছে, এই ভাণ করিয়া নম্রভাবে উত্তর করিল, আমি ভ্রাতৃ-আদেশে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি। আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত নহে। তবে ভ্রাতার অনুমতি ভিন্ন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারি না। যাহাহউক ভ্রাতার নিকট আপনাদের আদেশ লিখিয়া পাঠাইলাম, উত্তর আসাপর্য্যন্ত যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখিবেন। † এই চাতুরিপূর্ণ উত্তরে হিন্দুরাজগণ আহ্লাদে অধীর হইলেন। দ্বারে কালসর্প রাখিয়া গৃহমধ্যে সুখে সুষুপ্তি সম্ভোগে নিবিষ্ট হইলেন।

মহাসমারোহে ভোজ ও নৃত্য গীতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই নিরস্ত্র, সকলেই আমোদে মত্ত, সকলেই অপ্রস্তুত। নিস্তব্ধে নিশীথ সময়ে ধূর্ত্ত যবন-পতি সসৈন্যে কাগার নদী পার হইয়া অতর্কিত রূপে বিপক্ষ শিবির আক্রমণ করিল। ক্ষণমাত্রে নৃত্য গীত স্থগিত হইয়া শিবির মধ্যে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কিন্তু বহুসংখ্যক সেনানী সেই অল্প সময় মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া শিবির রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ইতিমধ্যে অবশিষ্টেরাও প্রস্তুত হইল। তখন সমস্ত হিন্দুসৈন্য চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া চতুষ্কোণব্যূহ রচনা করিল। সাহাবুদ্দিন ব্যূহ ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার এক প্রতারণাপরিপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করিলেন। ব্যূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দুসৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইবে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে

* মারেকৃত ভারতেতিহাস ১৭৫ পৃ।

† এলফিনেষ্টোন ৩১১ পৃ, ও মারে ১৭৫পৃ।

প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা প্রস্থানের ভাণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পশ্চাৎ হঠিয়া যাইতে লাগিল। হতবুদ্ধি হিন্দুসৈন্যগণ সেই দুরভিসন্ধির মর্ম্মভেদ করিতে না পারিয়া ব্যূহ ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। রণজ্ঞ মুক সাহাবুদ্দিন এই অবসরে স্বীয় শরীররক্ষক বর্ম্মধারী দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে সেই ছত্রভঙ্গ হিন্দু সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। এইরূপে প্রতারিত হইয়া অধিকাংশ হিন্দুসৈন্য হত নিহত ও বন্দীকৃত হইল; অবশিষ্ট প্রস্থান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। দিল্লীশ্বর স্বয়ং বন্দীকৃত ও হত হইলেন। কিন্তু সেই ভয়ানক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াও চিতোরাধিপ সমরশায়ী ও তদীয় তনয় কল্যাণ বীরের ন্যায় বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া সাহাবুদ্দিনের অধিকাংশ সৈন্যসামন্ত সংহার করেন। অবশেষে স্বীয় অধীনস্থ ত্রয়োদশ সহস্র সৈন্য ও পুত্র সমভিব্যাহারে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া রণভূমিতে বীরশয়নে শায়িত হইলেন।

থানেশ্বরের যুদ্ধের সহিত সেন্‌লাকের যুদ্ধের অনেক বিষয়ে তুলনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ সাহাবুদ্দিনের সহিত উইলিয়ম কঙ্কারেরে, পৃথ্বীরাজের সহিত হেরল্‌ডের; পরন্তু সমরশায়ী ও তদীয় তনয় কল্যাণের সহিত গার্থ ও লোয়েনতনয় হেকোর সুন্দর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ গৃহ-বিবাদ, এবং হেরলড্ ও টষ্টিগের পরস্পর কলহে সাক্সনেরা যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া ছিল; পৃথু ও জয়চন্দ্রের আত্মকলহে রাজপুত জাতির ও তদ্রূপ দুর্দ্দশা হয়। তৃতীয়তঃ পোপের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া উইলিয়ম যেরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, এবং হেরল্‌ড তাঁহাকে উচিত স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতেছেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল; সাহাবুদ্দিন ও তদ্রূপ মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিতে ও পূর্ব্ব পুরুষ গজ্নানপতির অধিকৃতস্থান উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ উইলিয়মের সুশিক্ষিত নর্ম্মাণ সৈন্যের সহিত দেশহিতৈষী সাক্সনেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও যেরূপ কিছু করিতে পারিয়াছিলনা; সাহাবুদ্দিনের শিক্ষিত সৈন্যের অগ্রেও রাজপুত সৈন্যগণ সেইরূপ পরাস্ত হইয়াছিল। পঞ্চমতঃ সেন্‌লাকের যুদ্ধেই যেমন সাক্সনেরা সিংহাসনচ্যুত হন ও ইংলণ্ডে নর্ম্মাণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়; থানেশ্বরের যুদ্ধেও তদ্রূপ স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের ধ্বংশ ও ম্লেচ্ছাধিকারের সূত্র পাত হয়।

আমাদের আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। কিন্তু যবনিকাপতনের পূর্ব্বে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন হইতেছে। পৃথ্বীরাজের মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নীদ্বয় জ্বলন্ত চিতায় আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুমৃতা হন। সাহাবুদ্দিনকে করপ্রদানে স্বীকৃত হওয়াতে পৃথুর জনৈক পুত্র সিংহাসনে অধি-

ষ্ঠিত হন। কিরূপে জয়চন্দ্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল—তদীয় পাপে ভারতের অপরাপর হিন্দু রাজত্বের কি দশা হইয়াছিল,তাহা ইতিহাসেই বর্ণিত আছে, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহাতেই কি ভারতবাসীর চক্ষু দান হইয়াছিল? ইতিহাসই একথার উত্তর প্রদান করিবে। শ্রী—

যবন।

"যবন" শব্দের উৎপত্তি কি এবং কোন্ দেশবাসিরাই বা "যবন" নামে অভিহিত হইত,এপর্য্যন্ত ইহার স্থির মীমাংসা কেহই করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির বাস; তম্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান হইতে অধিক। "হিন্দু" এই শব্দের মীমাংসা এক প্রকার হইয়াছে। সিন্ধুর অপভ্রংশ ইণ্ডস্ হইতে হিন্দুশব্দের উৎপত্তি। হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে যবনশব্দে অভিহিত করেন। এবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ কেহ বলেন "যবন" শব্দের সহিত গ্রীক আওনিয়া (Ionia) শব্দের সৌসাদৃশ্য আছে; অতএব পূর্ব্বে গ্রীকদিগকেই যবন কহিত। কিন্তু এই কথাইযে ঠিক তাহার প্রমাণ কি?

এবিষয়ের সত্য অনুসন্ধান করা একান্ত দুরূহ কার্য্য। অনুমান আমাদিগের প্রধান সম্বল। কিন্তু অনুমানের উপর নির্ভর করা যুক্তিসিদ্ধ বোধহয় না। প্রথমে যবন শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে পারিলে, যবনদিগের আদিমস্থান কোথায়ছিল সহজেই স্থিরকরা যাইবে, এবং তাহাদের আচার ব্যবহার জানিলে অনেক বিষয়ের সত্য আপনিই প্রকাশ হইবে।

(১) ধাতু—যু (মিশ্রিত করা)+ অন—যবন।

"যৌতি মিশ্রতি, মিশ্রীভবতি বা জাতিভেদাভাবাদিতি যবনঃ"। যাহাদিগের জাতিভেদ নাই তাহারাই যবন।

তবে কেবল মুসলমান কেন, অনেক জাতিকেই যবন বলা যাইতে পারে।

(২) (Synonymy) সমবাক্য —ম্লেচ্ছ=ম্লিচ্ছ-অ। ম্লিচ্ছ মিশ্রিত করা।

"গোমাংসখাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহুভাষতে। ধর্ম্মাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছইত্যভিধীয়তে॥" বৌধায়ন সূত্র।

যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে, বহু ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে এবং যাহাদিগের কোন ধর্ম্মনাই, তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ কহে।

ইংরেজাদি ইউরোপীয় সুসভ্য জাতিদিগকেওত তবে ম্লেচ্ছবলা যাইতে পারে!

ইহাতে বোধ হইতেছে পূর্ব্বে হিন্দুভিন্ন সমস্ত জাতিকে ম্লেচ্ছ বা যবনশব্দে অভিহিত করিত। কিন্তু এক্ষণে সেই শব্দে কেবল মুসলমানদিগকেই বুঝায়।

(৩) যবনের আদিনিবাস—

(ক) মধ্য আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণপশ্চিম দিকে যবনদেশ। পরাশর।

(খ) যে রেখা লঙ্কাদ্বীপকে দ্বিভাগ করে তাহার ৬০° পশ্চিমে যবনদেশ।

বরাহ মিহির।

(গ) ভারতবর্ষের পশ্চিমে যবনদেশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে কাবুল, টার্টরী, পারস্য, বাক্ট্রিয়া ইত্যাদি দেশ সকল পূর্ব্বে যবনদেশ এবং তত্রত্য অধিবাসিদিগকে যবন কহিত। দেখা যাইতেছে "যবন" শব্দ নূতন নহে। বহু পূর্ব্বকাল হইতে ইহার ব্যবহার আছে। তবে কেবল মুসলমানদিগকে যে যবন বলিত না, তাহা একপ্রকার স্থির নিশ্চয়, যেহেতু মুসলমান জাতির উদয়ের পূর্ব্বহইতে একথা প্রচলিত দৃষ্ট হয়।

(৪) যবনদিগের আচার ব্যবহার—

(ক) "যবনান্ মুণ্ডিতশিরসোঽর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্ প্রলম্বকেশান্ পারদান্ পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধারিণঃ"। বিষ্ণুপুরাণ।

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ রচনার কাল নিরূপণ করা অতীব দুরূহ কার্য্য। যদি এখানিকে বহুকালের রচিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে নিঃসন্দেহই মুসলমানদিগকে যবন বুঝায়; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ পুরাণ গ্রন্থ নহে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলায় কালিদাস লিখিয়াছেন—

"এসো বাণাসণ হত্থাহিং জবণীহিং বণপুপ্ফমালাধারিণীহিং পরিবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি পিঅবঅস্সো।"

দ্বিতীয় অঙ্ক পাঠান্তর।

মহারাজ দুষ্মন্তের পরিচারিকাগণ যবনকন্যা ছিল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে কালিদাস মুসলমানদিগকে যবন বলিয়াছেন। যেহেতু মুসলমানমহিলারা উত্তম নৃত্যকী, এবং প্রায় নৃপতিগণ তাহাদিগকে রাখিতেন।

রঘুবংশে লিখিত আছে, রঘু দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া পারস্যাধিপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এখানকার স্ত্রীলোকদিগকে কালিদাস যবনী বলিয়াছেন,—

"পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূং স্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী॥
যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতপমিবাব্জানামকালজলদোদয়ঃ॥"

পাণিনীপ্রণীত সিদ্ধান্ত কৌমুদী নামক ব্যাকরণে যবনবর্গ বুঝাইবার নিমিত্ত একটি সূত্র দেওয়া হইয়াছে। যথা—

ইন্দ্র বরুণ ভব সর্ব রুদ্র মৃড় হিমমারণ, যব যবন মতুলাচার্য্যাণ আনুক্, (যবনাৎ লি পত্যাম্) যবনানাং লিপির্যবনানী। ।১।৪।৪৬।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যবনগণ হিন্দুদিগের চিরপরিচিত।

ভোজরাজসভাসদ কবি কালিদাস প্রণীত (শকুন্তলারচয়িতা কালিদাস নহে) মালবিকাগ্নিমিত্র গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যে মহারাজ পুষ্পমিত্র অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্ব সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া অপরকূলে উপস্থিত হইলে একদল যবন তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

যদিও ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত যে গ্রিক আইওনিয়া শব্দ হইতে যবন শব্দের উৎপত্তি, কিন্তু সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণ একথা বিশ্বাস করেন না। পুরাণে ইহার যেরূপ মীমাংসা আছে তাহাই তাঁহারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় বৈবস্বতমনুপুত্র পিসধ্র তাঁহার গুরুর গাভী হরণ করেন এবং এই নিমিত্ত তাঁহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যদিও তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ বেদবিধি অনুসারে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, তথাপি তাহাদিগকে যবন বলিত।

একদা সগররাজা হৈহৈ তালজঙ্ঘদিগকে সমরে পরাস্ত করেন এবং ঘোর অবমাননার চিহ্নস্বরূপ তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া বাড়ী হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। যথা—

" অর্দ্ধমুণ্ডশিরসঃ কাংশ্চিৎ সর্ব্বমুণ্ডান থাপরান্। কাংশ্চিৎ শ্মশ্রুধরান্ কাংশ্চিৎ মুক্তকচ্ছানথাপরান্ ॥ "

এস্থলে প্রতিপন্ন হইতেছে স্বজাতিচ্যুত ব্যক্তিদিগকে যবন কহিত।

মহাভারতে দেখিতে পাই যবনজাতি বশিষ্ঠধেনু নন্দিনীর কান্না হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

কিন্তু যদ্যপি আইওনিয়া দেবী, মহাভারত এবং অন্যান্য সংস্কৃতগ্রন্থ যাহাতে যবন শব্দের উল্লেখ আছে তাহাদের কাল নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে এবিষয়ের মীমাংসা সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু একার্য্য একপ্রকার অসাধ্যসাধন।

(খ) " যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈবচ। "

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

যবনজাতি তাহাদের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করে।

(গ) যবনঃ শয়ানো ভুংক্তে। পাণিনী।

যবনজাতি শয়নাবস্থায় ভোজন করে।

যবনশব্দ।—

যবন-দ্বিষ্ট—ধূনা

যবনপ্রিয়—কালমরিচ

যবনালজ—সোরা

যবনিকা—তাঁবু

যবনেষ্ঠ—রসুন

যবনেষ্ঠা—খেজুর

যবনাশ্ব—যবনদেশীয় ঘোড়া।

উপরি উক্ত বিষয় গুলি সুস্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সপ্রমাণ হইবে

বাক্‌ষ্ট্রিয়ার সমীপবর্ত্তী কোন দেশ যবনদিগের আদি নিবাস। আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে এই জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল; কিন্তু কালক্রমে স্বধর্ম্ম হইতে পতিত হইলে ইহাদিগকে যবন নাম দেওয়া হয়। একথা প্রমাণ করা নিতান্ত কঠিন কার্য্য নহে যেহেতু আজ পর্য্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে; যদি কোন ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য না করে তাহাকে সমাজ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। কেহ তাহার বাটীতে আহার করে না এক হুঁকায় ধূমপান করে না সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। তবে এক্ষণে আর তাদৃশ হিন্দুধর্ম্মের মান সম্ভ্রম নাই। ইংরেজী শিক্ষা হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। যদি এই ব্যক্তি কোন সুযোগে পুনর্ব্বার স্বপদ উদ্ধার করিতে পারিলেন ভাল,নতুবা ইহার সন্তান সন্ততিগণ কালক্রমে নিজ ব্যবসায় অবলম্বন করিলে তাহারাই যবন হইবে।

মহাভারতে যবন শব্দের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ গ্রীকজাতির অভ্যুত্থানের বহুপূর্ব্বে রচিত। বিশেষতঃ পুরাণে প্রমাণ পাওয়া যায় যে যবনগণ তুর্ব্বসুর সন্তান সন্ততি। পূর্ব্বকালে সিন্ধুনদীর পশ্চিম পারস্থিত দেশসমূহ হিন্দুদিগের অধিকার ও আবাসস্থান ছিল। তাঁহাদের মধ্যে এক দল ভারতবর্ষ জয় ও অধিকার পূর্ব্বক তথায় আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তাঁহারা এই দেশের সৌন্দর্য্য রমণীয়তা ও উর্ব্বরতা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আর স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন না। ক্রমে ক্রমে সমস্ত আদিম নিবাসিদিগকে পরাস্ত ও দূরীকৃত করিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারিত করিলেন। তাঁহাদিগের যে অংশ স্বদেশে রহিয়া গেল তাঁহাকেই ইহারা যবন নামে অভিহিত করিলেন।

এখানে ইঁহাদিগের প্রভুত্ব বিস্তারের সহিত জ্ঞানেরও বিস্তার হইতে লাগিল। স্বর্গীয় সংস্কৃত ভাষা যাহাদিগের মাতৃভাষা সুতরাং তাঁহারা যে স্বল্প কালমধ্যে ভুবনবিখ্যাত হইবেন তাহা বিচিত্র কি? ক্রমে ক্রমে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ,ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের আলোচনায় সকলে মনোনিবেশ এবং তৎবিষয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিলেন। ওদিকে তাঁহাদের ভ্রাতৃগণের দিন দিন অধঃপতন হইতে লাগিল; তাহারা আপনাদিগের তেজ ও বীর্য্য বিস্মৃত হইয়া নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন, স্বধর্ম্মে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং গোমাংস ইত্যাদি অখাদ্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন; ইহাতে ভারতবর্ষবাসী হিন্দুগণ যে তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং তাঁহারা এককালে তাঁহাদের সহিত আদান প্রদান বন্ধ করিয়া দিলেন। এবং তাহাদের নাম ম্লেচ্ছ ও যবন রাখিলেন।

পূর্ব্বে যবনশব্দ দ্বারা যে কেবল মুস-

লমান জাতিকে বুঝাইত না চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট মনুষ্য মাত্রই ইহা বুঝিতে পারিবেন। ইংরেজ ফরাস ওলন্দাজ ইত্যাদি সমস্ত জাতিকেই যবন বলা যাইত। ইহাতে কি বুঝায় ? যে সকল জাতি হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করিত না তাহাদিগকেই যবন বলিত।

হিন্দুগণ অতি বিশুদ্ধাচারী এবং সতত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। এবং আপনাদিগের অদ্ভূত ক্ষমতাবলে কি রাজনীতি, কি সামাজিক নীতি, কি বীরত্ব, কি যুদ্ধকৌশল, কি শিল্প বিদ্যা, সর্ব্ববিদ্যায় ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। ব্যাস, মিহির, বাল্মিকী, বরাহ, কালিদাস, বশিষ্ঠ, পরাশর, নারদ, মনু, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সেই কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন, সুতরাং জাত্যভিমান ও আত্মাভিমান তাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি, ভাল বাসা ও সহানুভূতি জন্মিল ; এবং তাঁহাদের অন্তঃকরণে ঘোর অহঙ্কারের উদয় হইল, এমন কি তাঁহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করিতেও অস্বীকার করিতেন। স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের এত ভক্তি জন্মিয়াছিল যে তাঁহারা ভাবিতেন—ভাবিতেন যথার্থই, তাহাদের ভ্রম ছিল না—সেই ধর্ম্মই সকল ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। যাহারা সেই ধর্ম্ম মানিত না তাহাদিগকে অসভ্য, ম্লেচ্ছ ও যবন বলিতেন। সুতরাং যবন নামে কোন একটি জাতি ছিল না। আর্য্যগণ হিন্দু ভিন্ন সমস্ত জাতিকেই যবন বলিতেন।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভালমানুষ।

কেহ বলিতে পার, কি করিলে "ভাল মানুষ" হওয়া যায়? চলিত কথায় যাহাকে 'ভালমানুষ' বলে, অর্থাৎ সদসৎ বিবেকশূন্য, মৃৎপিণ্ডসদৃশ নিস্তেজ-হৃদয়, 'গো বেচারা' ভালমানুষের কথা বলিতেছি না। পূর্ব্বজন্মের বিশেষ পুণ্য না থাকিলে এরূপ ভালমানুষ হওয়া যায় না। যিনি সমস্ত বুঝিয়া, সমস্ত জানিয়া শুনিয়া 'ভালমানুষ,'—যিনি রঘুবংশের "জ্ঞানে মৌনং, ক্ষমা শক্তৌ, ত্যাগে শ্লাঘা-বিপর্য্যয়ঃ" ইত্যাদি গুণে বিভূষিত হইয়া 'ভালমানুষ,' তাঁহার কথা বলিতেছি। যিনি বাক্যে সত্যবাদী, মনে অহমিকাশূন্য, কার্য্যে ফলপ্রয়াসী,—যিনি পৃথিবীতে অজ্ঞাত, সমাজে অনাদৃত, পরিবার মধ্যে অবহেলিত হইয়াও সদানন্দ;—যিনি বিপদে প্রসন্ন এবং সম্পদে ধীর, তাঁহার কথা বলিতেছি।—যিনি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে হিতাহিত বিবেচনা করেন না, যিনি সময়ের গতি অনুসারে স্বীয় কার্য্যের গতি নিয়মিত করেন না,—যিনি আশাবাক্যে বন্ধুকে উৎসাহিত করিয়া কার্য্যকালে পলায়ন করেন না, সেই সহৃদয় মহাত্মার কথা বলিতেছি।

কি করিলে ভালমানুষ হওয়া যায়? নীতিশাস্ত্র পাঠ করিলে? কত কত নীতি পড়িলাম, কত নীতিশাস্ত্রবেত্তা দেখিলাম, কিন্তু কখনও দেখিলাম না যে, জ্ঞানের উন্নতির সহিত নীতির উন্নতি হইল। "সত্যকথা বলিও, মিথ্যা বলিও না" ইহাত কতবার কত প্রকার পড়িলাম, মিথ্যাকথার ফল ত কতবার ভুগিলাম, কতবার দেখিলাম; কিন্তু কখন সত্যবাদী হইতে পারিয়াছি কি? কার্য্যকালে দেখিয়াছি যে, সর্ব্বদা হিতোপদেশকারের কথাই সত্য হয়।

"ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং
ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।
স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে
যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ॥"

আরিস্ততলের সময় হইতে ইয়ুরোপে নীতিশাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে; কিন্তু ইউরোপের নীতি কিছুমাত্র বিশুদ্ধ হইয়াছে কি? সেই মিথ্যাকথা, সেই প্রতারণা, সেই স্বার্থপরতা, সেই নীচাশয়তা, এখনও আছে। তবে একমাত্র প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বকার অধিবাসীরা মনোবৃত্তি গোপনের এত কৌশল জানিত না। সভ্যতার সঙ্গে ভণ্ডামিরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং নীতির অবনতিই ঘটিয়াছে।

তবে কিসে ভালমানুষ হওয়া যায়? ধর্ম্মালোচনা দ্বারা? কত হিন্দু দেখিলাম, কত প্রাতস্নায়ী, নিরামিষাশী, চন্দনচর্চ্চিত, কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলাম; কত মেও য়াজওয়ালা সুদির্ঘ দাঁড়িবিশিষ্ট মুসলমান দেখিলাম; রবিবারের সন্ধ্যাকালে কত অশ্রুবারিপরিপ্লুত ব্রাহ্মভ্রাতা দেখিলাম; কত "ফ্রক কোটেড" মিসনরী 'পারসন' দেখিলাম; কখনও ধর্ম্মের সঙ্গে নীতি মিশ্রিত দেখিলাম কি? খ্রীষ্টানেরা বলেন, এবং ব্রাহ্মেরাও দেখাদেখি বলিতে শিখিয়াছেন, যে মনুষ্য জগদীশ্বরের 'গ্রেস্' (Grace) 'দয়াময়ের দয়া' না পাইলে ধার্ম্মিক অথবা বিশুদ্ধচরিত্র হইতে পারে না। এই জগদীশ্বরের করুণা পাইবার প্রধান উপায় 'উপাসনা'। এ'উপাসনা' ও ত অনেককাল করিলাম। উপাসনাগৃহে বসিয়া জগদীশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া কতবার আন্তরিক প্রতিজ্ঞা করিলাম, কখনও প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিলাম কি? পৃথিবীর দারুণ প্রলোভনের সাক্ষাতে, সমস্ত প্রতিজ্ঞা, সমস্ত জগদীশ্বর, সমস্ত উপাসনা, কোথায় উড়িয়া গেল। ইংরাজীতে এক প্রবচন আছে যে, "যদি জগদীশ্বরের সাহায্য চাও, তবে অগ্রে আপনি আপনার সহায় হও"। এ প্রবচন সাংসারিক উন্নতিসম্বন্ধে যেরূপ সত্য, নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। শুদ্ধ উপাসনায় সংসারে অন্ন মিলিবে না; শুদ্ধ উপাসনায় চরিত্রের উন্নতিও হইবে না। "উপাসনা" অর্থাৎ সন্তোষকর বাক্যে মনুষ্য ভুলিতে পারে। আপনি বড় ধনী, আপনি বড় বিদ্বান আপনি বড় সুন্দর, এ সকল কথায় মনুষ্য ভুলিতে পারে। কিন্তু জগদীশ্বর কথায় ভুলিবার পাত্র নহেন। তাঁহাকে কার্য্যে ভুলাইতে হইবে। চক্ষু মুদিয়া তুমি বড় সুন্দর, তুমি বড় জ্ঞানী, তুমি বড় মহৎ বলিলে চলিবেনা।*

তবে কি করিলে ভালমানুষ হইব? এক উপায় আছে! যুদ্ধ করিলে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক কার্য্যে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। স্বার্থত্যাগ চারিত্র-উন্নতির মূলমন্ত্র। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, সকল প্রকার দোষের মূলেই এই স্বার্থানুরাগ আছে। লোকের মনে স্বকীয় ক্ষমতার আধিক্য স্পষ্টীভূত করিবার জন্য মিথ্যাকথার সৃষ্টি। লোকের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার জন্য মিথ্যা কার্য্যের সৃষ্টি। যত কিছু দুষ্কর্ম্ম করি, সকলই আত্মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। জনসন্ বলেন যে, কেহ কেহ বিনা অভিপ্রায়ে, বিনা স্বার্থপ্রত্যাশায় দুষ্কর্ম্ম করে। কিন্তু আমাদিগের দৃঢ়

* এস্থলে এরূপ বলা হইতেছে না যে উপাসনার কোন কার্য্যকারিতা নাই। উপাসনার জন্য অনেক প্রয়োজন থাকিতে পারে। কিন্তু শুদ্ধ উপাসনায় চরিত্র উন্নত হয় না এই কথা বলা লেখকের অভিপ্রেত।

বিশ্বাস যে, যাহা তোমার আমার নিকট বিনা অভিপ্রায়ে, বিনা স্বার্থপ্রত্যাশায়, দুষ্কর্ম্মকারীর নিকট তাহা স্বার্থানুসন্ধান ব্যতীত আর কিছুই নয়'।

এই স্বার্থপরতার যে কত প্রকার মূর্ত্তি আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের প্রধান দেবতা বিষ্ণুর দশ অবতার; কিন্তু স্বার্থানুরাগের লক্ষকোটি অবতার। পরের উপকারে কিংবা পরের অপকারে এইএকই দেবতার পূজা হয়। কেহ কর্ত্তৃপক্ষের পদানুসরণ করিয়া, কেহবা তাহার অবাধ্যতাচরণ করিয়া এই এক দেবতারই পূজা করেন। ধর্ম্মের প্রবন্ধ ও নাস্তিকতার প্রবন্ধ এই একই দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত হয। ইনি কখন বা সত্যের বেশ ধরিয়া, কখন বা মিথ্যা কথার বেশ ধারণ করিয়া, কখন বা ভীরুতার বেশে, কখন বা নির্ভীকতার বেশে, ইহাঁর সেবকদিগের নিকট উপস্থিত হয়েন।*

ইউরোপের আধুনিক দার্শনিকেরা নীতির ভিত্তি স্বার্থানুসন্ধানের উপর স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, বুঝিয়া দেখিলে পরহিতৈষিতা ও স্বার্থচিন্তা একই প্রকার কার্য্যপ্রণালীর উপযোগী বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহাদের মতে স্বার্থে ও পরার্থে অবশ্যম্ভাবী বিসম্বাদিতারাখা অল্প বুদ্ধির কার্য্য। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে পরের ইষ্ট করিলে প্রকারান্তরে আপনারই ইষ্ট করা হয়। মিলের (Utilitarianism) এই মূল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত।

এইমত সম্বন্ধে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, যে বুদ্ধি বা যে জ্ঞান থাকিলে পরার্থের মধ্যে ও স্বার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সে বুদ্ধি বা সে জ্ঞান অধিকাংশেরই দুষ্প্রাপনীয়। মিলের মত দুই চারি জন অমানুষপ্রতিভাশালী ব্যক্তি ভিন্ন পরার্থে ও স্বার্থে একত্ব প্রতিপাদন অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই মত সম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে পরার্থ ও স্বার্থের ভবিষ্যৎ একত্ব বুঝিলেও স্বার্থ ত্যাগ করা বড় সহজ নহে। বুঝিতে পারি যে গ্রামস্থ বিদ্যালয়েব সাহায্য করিলে ভবিষ্যতে আমাদেরই ইষ্ট হওবার সম্ভাবনা, কিন্তু এই কথাটি বুঝিয়া কয়জনে স্ত্রীর অলঙ্কার হইতে টাকা বাঁচাইয়া বিদ্যালয়ের সাহায্য করিয়াছেন? সংস্কৃতে এক প্রবচন আছে। "কাচঃ কাচঃ মণির্মণিঃ" সহস্র যুক্তি প্রয়োগ করিলেও কাচ কাচই থাকিবে এবং মণি মণিই থাকিবে। সেইরূপ যতই কেন যুক্তি প্রয়োগ করুন না, মনুষ্যের মধ্যে আত্মপর বলিয়া যে একটা প্রভেদ, তাহা থাকিবেই থাকিবে। যত দিন মনুষ্যের মনে ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রবল ছিল, ততদিন পরার্থের মধ্যে স্বার্থানুসন্ধান অনায়াসেই করা যা-

* এতৎ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। অন্যত্র বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ইতে পারিত। তখন পর কালের দো-হাই দিয়া স্বার্থে ও পরার্থে একত্ব প্রতিপাদন করা যাইতে পারিত। কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে এরূপ কোন পর কালের উপর বিশ্বাস নাই। সুতরাং এক্ষণে পরার্থের মধ্যে ও স্বার্থাবলোকন করা বড় কঠিন ব্যাপার। তবে যাঁহারা "বসুধৈব কুটুম্বকম্" বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের নীতি-শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে; তাঁহাদিগের জন্য এ প্রস্তাব লিখিত হইতেছে না। অন্য দেশে যাহাই হউক, আমাদের দেশে স্বার্থ ও পরার্থ এক বলিয়া বুঝা অত্যন্ত কঠিন। শুদ্ধ কঠিন কেন, একরূপ অসম্ভব। যে জাতির মধ্যে ঐকজাত্য নাই, যাঁহাদের চরিত্র গঠনে কাপুরুষতাই প্রবল, স্ত্রীর জন্য অলঙ্কার নির্ম্মাণই যাঁহাদের পৌরুষের পরাকাষ্ঠা, তাঁহারা যে কখন পরার্থে ও স্বার্থে একত্ব দেখিবেন, ইহা আশা করাও বাতুলের কার্য্য। আত্ম পরের প্রভেদ যত আমাদিগের মধ্যে, এত আর অন্য কোন জাতিতে আছে কি না সন্দেহ।

তবে স্থির হইল, স্বার্থত্যাগেই নীতির উন্নতি সম্ভব। কিন্তু স্বার্থ ত্যাগ শিখিবার উপায় কি? নীতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া বা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া স্বার্থ ত্যাগ শিখিতে পারিব না। সংসারের প্রলোভন জয় করিব কিরূপ? এক উপায় আছে; সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া। প্রলোভন জয় করিতে পারিলাম না, সুতরাং প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় প্রলোভন হইতে পলায়ন। সংসার হইতে দূরে, বিজন অরণ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া প্রবৃত্তি দমন কর। যদি প্রবৃত্তি দমন করিয়াছ বলিয়া বুঝিতে পার, তবে পুনরায় সংসারে আসিয়া মিশিও। নতুবা বিজন অরণ্যমধ্যে এই অনন্ত জগতের অনন্তলীলা ধ্যান করিতে করিতে জীবন কাটাইও।

যদি কেহ কখন এ প্রবন্ধ পাঠ করেন, তবে তিনি বলিবেন "হঁা এ নীতি বাঙ্গালির ছেলের বটে। 'পলায়ন কর' এ মহামন্ত্র বাঙ্গালির একচেটিয়া।" কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যদি জয় করিতে না পারি, পলায়ন করিব না কেন? জয়ের উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা, আমার পলায়নের উদ্দেশ্যও তাহাই। তবে যে জয়কে পলায়ন অপেক্ষা ভাল বলি, তাহার কারণ স্বতন্ত্র। শত্রুকে জয় করিলে ভবিষ্যতে তাহা হইতে বিপদের সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু শত্রুর নিকট হইতে পলায়ন করিলে শত্রুকর্ত্তৃক পুনরুৎপীড়ন অধিকতর সম্ভব। কিন্তু যেখানে পলায়নই প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়, সেখানে পলায়নই শ্রেয়ঃ। পলায়ন করিতে জানিত না বলিয়া রজপুতের ধ্বংস হইয়াছে; পলায়ন করিতে জানে বলিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য জাতি ভূমণ্ডলে আধিপত্য করিতেছে। যদি তোমরা কেহ এমন থাক যে, শত্রুর সহিত

যুদ্ধ করিতে পার, যুদ্ধ কর; আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যদি কেহ আমার মত দুর্ব্বল, আমার মত ভীরু হয়, তবে সে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করুক, তাহাতে আপত্তি করিও না। সকলে তোমাদের মত বীরপুরুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই।

কেহ হয়ত আপত্তি করিবেন যে, যদি সকলেই এইরূপ করিতে যায়,তবে সংসার চলিবে কিরূপে? দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমার মত আমি বলি, "চলিয়া কাজ কি? এতকাল যে চলিল এই দুঃখ।" সংসার চলিবে কি না তাহা আমি কি জানি? আমি আপনাকেই বাচাইতে পারিনা। সংসার যাঁহার সৃষ্টি, সংসার পালন যাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তিনি সংসারের কথা ভাবিবেন। তুমি আমি সংসারের পরমাণু মাত্র। আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি না,আবার সংসার। আর এক কথা; সংসারের অসারতা বুঝিলেই সংসার ছাড়া যায় না। সংসারে যে রাশি রাশি প্রলোভন রহিয়াছে, তাহারাই সংসার চালাইবে। যে শিল্পকুশল নির্ম্মাতা এ সংসার সৃষ্টি করিয়াছিল,সে ইহার রক্ষার জন্য অগ্রেই সমস্ত উপাদান প্রস্তুত রাখিয়াছিল। সংসার রক্ষার জন্য তোমার আমার মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিবার প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাই ভালমানুষ হইবার এক প্রধান উপায়। এ সম্বন্ধে আরও একটি গভীর তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে। যদি প্রলোভন জয় করা ভালমানুষের অর্থ হয়, তাহা হইলে সমাজশূন্য স্থানে থাকিয়া ভালমানুষ হওয়া যাইতে পারে না। কারণ যেখানে প্রলোভন নাই, সেখানে প্রলোভনজয় কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে? আর এক কথা, কেহ স্থলে থাকিয়া সন্তরণ শিক্ষা করিতে পারে না। শিশু চির কাল মাতৃক্রোড়ে শয়ান রহিয়া সঞ্চরণ শিখিতে পারে না। তবে প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া কি প্রকারে প্রলোভন জয় শিক্ষা করা যাইতে পারে? যদি কেহ কখন জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন, তবে তাহা কেবল সমাজে থাকিয়াই সম্ভব হইতে পারে। বালক, সঞ্চরণক্রিয়া শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে অনেকবার ভূপতিত হইবে, অনেকবার দারুণ ব্যথা প্রাপ্ত হইবে, অনেকদিন ধাত্রীর কর-ধারণ করিয়া চলিবে। সন্তরণশিক্ষার্থী অনেকবার জলে নিমজ্জিত হইবে, অনেকবার হাবুডুবু খাইবে, অনেক বার অন্যের পৃষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া সাহসের সহিত গভীর জলে যাইবে। সেইরূপ যিনি বিশুদ্ধচরিত্র হইতে চাহেন, তাঁহাকেও অনেকবার অনেক প্রকার লোকের সহিত মিশিতে হইবে, অনেকবার তাঁহারও পদ-স্খলন হইবে, অনেকবার তাঁহাকেও দারুণ মনস্তাপ পাইতে হইবে, অনেকবার তাঁহাকেও " সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম " ইহা বুঝিতে ও তথায়

আশ্রয় লইতে হইবে। সর্ব্বত্র শিক্ষার নিয়মই এই।

এ তর্কটি বড় আশ্বাসদায়ক, বড় সান্ত্বনা-প্রদ। প্রতিদিন যে এই অসংখ্য দুষ্কর্ম্ম ও দুশ্চিন্তা করিতেছি, এ সমস্তই কি তবে কেবল চারিত্র-উন্নতির সোপানমাত্র? এখানেও কি জগদীশ্বর মন্দবৃক্ষ হইতে সুন্দরফল নিষ্কাশন করিতেছেন? যেমন তিক্ত ঔষধ সেবন না করিলে কঠিন রোগের উপশম হয় না, সেইরূপ কি দুষ্কর্ম্ম না করিলে চারিত্র-উন্নতি হইতে পারে না? চরিত্র-সুবর্ণ বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে কি দুষ্কর্ম্ম-অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে?

কথাগুলি বড় মিষ্ট। শুনিলে নৈরাশ্য অন্তর্হিত হয়; হৃদয়ের কঠোরতা দ্রবীভূত হয়; মলিন চিত্ত প্রফুল্ল হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কথাগুলি অন্যত্র সত্য হইলেও চরিত্র-উন্নতি সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে না।

প্রথমে দেখা যাউক, আমরা নূতন বিষয় শিক্ষা করি কেন? যতদিন আমরা আমাদিগের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকি, ততদিন কোন বিষয় শিক্ষা করিবার ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। চীনের অধিবাসীরা নূতন বিষয় শিক্ষা করে না; কারণ, তাহারা জানে যে তাহাদের শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। যেহেতু তাহারা তাহাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট আছে। বালকেরা সঞ্চরণ শিক্ষা করে, কারণ তাহাদের শারীরিক রক্ত তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে দেয় না। এই জন্যই বলিষ্ঠ বালক অধিক পরিমাণে ও দুর্ব্বল বালক অল্প পরিমাণে সঞ্চরণ-ক্রিয়া সম্পাদন করে। নৈসর্গিক প্রকৃতি বলে বলিষ্ঠ বালক আপন অবস্থায় সহজে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। আবার নৈসর্গিক কারণ বশতঃই দুর্ব্বল বালক সহজে আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়। এইরূপে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, অভাব ও অসন্তোষই শিক্ষার প্রধান নিয়ামক। বড় মানুষের সন্তানেরা লেখা পড়া শিখিতে পারে না। কারণ তাহাদের মনে অভাব ও অসন্তোষ বিদ্যমান নাই।

পাপ ছাড়িয়া পুণ্য করিতে হইলেও এইরূপ অভাবও অসন্তোষের আবশ্যক হইবে। কিন্তু পাপের সঙ্গে অভাবের কোন সম্পর্ক নাই। যেখানে যে সুখ আছে, পাপী তাহা অম্লানবদনে অধিকার করে; যতক্ষণ তাহাদের শক্তি থাকে, ততক্ষণ সেই সুখভোগ করে, এবং সুখের প্রীতিকারিণী শক্তির হ্রাস হইলেই অন্যত্র সুখের আশায় ধাবমান হয়। এইরূপ সুখ হইতে সুখান্তরের অন্বেষণে তাহার জীবন অতিবাহিত হয়; সুতরাং সে কখন অভাবের মুখ দেখিতে পায় না। সুতরাং কখন তাহার অসন্তোষও হয় না। সত্য বটে, সে অনেক সময়ে সুখলাভে বঞ্চিত হয়, সত্য বটে সে অনেক সময়ে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, সত্য বটে অনেক সময়ে দুঃখই তাহার সুখের পরিণাম হয়; কিন্তু এ পৃথিবীতে সর্ব্বদা সুখী কে? ঐ

যে ধার্ম্মিক পুরুষ ধীরপদে মন্দ মন্দ গমনে সংসারে বিচরণ করিতেছেন, ঐ যে উনি সর্ব্বত্রৈবং বিচার করিয়া করিয়া কার্য্য করিতেছেন, উনিই কি সর্ব্বদা সুখী? উঁহারও কি সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখলাভ হয় না? যদি সাংসারিক সুখের কথা বল, সে বিষয়ে পাপী ও পুণ্যবান উভয়েই সমান। পুণ্যবানের ও দুঃখ সুখ দুইই হয়; পাপীরও দুঃখ সুখ দুইই হয়। জয়ী সিজার ও পরাজিত কেটো, জয়ী ওয়াশিংটন ও পরাজিত নেপোলিয়ন, দণ্ডীকৃত ল্যাটিমার ও সিংহাসনাভিষিক্ত ক্রমওয়েল, এবিষয়ের সাক্ষ্যস্থল।

আর একটি আপত্তি হইতে পারে যে, সাংসারিক সম্পদ সম্বন্ধে পাপীর অভাব না থাকিতে পারে, কিন্তু পাপীর মানসিক শান্তিসম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনেক অভাব আছে। আন্তরিক নিরুদ্বেগ, পাপীর অভাব; এই অভাবের জন্য সে অন্যত্র সুখের আশায় ধাবিত হয়। যখন সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াও পাপী মনের উদ্বেগ দূর করিতে পারে না, তখনই তাহার মনে পুণ্যশিক্ষার ইচ্ছা বলবতী হয়। একথাটির মধ্যে অল্প পরিমাণে সত্য আছে। কিন্তু পাপীর মনে অশান্তিও অধিক লক্ষিত হয় না। আমাদের মনে ধর্ম্ম জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু তাহা কাহাকেও দারুণ যন্ত্রণায় ফেলে না। যদি আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান(Conscienc)প্রবল হইত, তাহা হইলে সকলেই, অন্ততঃ অনেকেই, পুণ্যপথে চলিত। যে দেশে শাস্তির নিয়ম বলবৎ, সেদেশে পাপের সংখ্যা অল্প। দণ্ডবিধি প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধি আমাদের দেশে চুরি ডাকাতি অনেক কমিয়াছে। সেইরূপ যদি অন্তরের দণ্ডবিধির কোন ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে পাপের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতে পারিত না। গোল্ডস্মিথ বলেন, "Conscience is a coward" আমাদের ধর্ম্মজ্ঞানের কোন সাহস নাই। পাপের পূর্ব্বে ইহার নিবর্ত্তনা এত অস্ফুট বলিয়া বোধ হয় যে, লোকে ইহাকে অক্লেশে তাচ্ছিল্য করিতে পারে। আবার পাপের পরেও ইহার তিরস্কার কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক হয় না। সুতরাং মানসিক শান্তি সম্বন্ধে যে অভাব তাহাও পাপীর বড় অধিক নয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে শিক্ষার প্রধান নিয়ামক যে অভাব, তাহা পাপীর নাই। এই জন্যই পাপের ও হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এরূপ কোন প্রধান অভাব থাকিত তাহা হইলে এতদিনে পৃথিবীতে সত্যযুগের আবির্ভাব হইত।

আর এক কথা, শিক্ষা[illegible] অন্য এক নিয়ামক দৃষ্টান্ত। যদি দেখিতাম যে অনেকে পাপ ছাড়িয়া পুণ্য করিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করিতেছে; তাহা হইলে পুণ্য শিক্ষা করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হইত। কিন্তু সমাজে এরূপ পুণ্যের দৃষ্টান্ত কয়টি দে-

খিতে পাওয়া যায়? যিনি বাহ্য দৃশ্যে ভারি পুণ্যাত্মা, তাঁহাকেও বিশেষ করিয়া দেখিলে ভণ্ড সন্ন্যাসী বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হয়।

এই সকল কারণে পুণ্যকে শিক্ষার বস্তু বলিয়া গণনা করা উচিত হয় না। এস্থলে শিক্ষার প্রধান নিয়ামক যে অভ্যাস ও দৃষ্টান্ত সে দুইটিই নাই। সুতরাং যদি কেহ মনে করেন যে পাপ করিতে ক্রমে-ক্রমে পুণ্য শিক্ষা করিব, তাঁহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা কখনই সফল হইবে না। একটি গল্প আছে যে, একজন মাতাল তাহার পিতাকে বলিয়া ছিল, "বাবা তুমিও একদিন মদ খাইয়া দেখ, পরে আমাকে তিরস্কার করিও" পিতা তদনুসারে একদিন মদ খাইয়া নিজেই মাতাল হইয়া উঠিলেন। সেইরূপ যিনি পাপ করিতে করিতে পুণ্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি অবশেষে নিজেই ঘোর পাপী হইয়া উঠিবেন। অতএব প্রলোভন হইতে দূরে থাকাই পুণ্য শিক্ষার প্রধান উপায়।

সংসারে থাকিয়া ভাল মানুষ হওয়া যে এক প্রকার অসম্ভব তাহা অনেক দার্শনিক স্বীকার করেন। বহুকাল হইতে এই পুণ্য শিক্ষা সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। একটির নাম স্বাতন্ত্র্যবাদ (Freewill) অপরটির নাম নিয়ুক্তিবাদ (Predestination)। স্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে মনুষ্যের নিজইচ্ছাই সকল কর্ম্মের নিয়ামক। নিয়ুক্তিবাদ মতে মনুষ্য কর্ম্মসূত্রের অধীন। স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন, আমি ইচ্ছা করিলে পাপও করিতে পারি, পুণ্যও করিতে পারি। নিয়ুক্তিবাদীরা বলেন যে পাপ পুণ্য আমার ইচ্ছার অনধীন। আমি জগদীশ্বরের করধৃত ক্রীড়াপুত্তল মাত্র। তিনি আমার শিরে পাপ পুণ্যের ভার যেরূপ ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহা আমি ইচ্ছা না করিলেও ঘটিবে, ইচ্ছা করিলেও ঘটিবেনা।

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদাস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

এই দুইটি মতের মধ্যে কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করা আমাদিগের ক্ষমতার অসাধ্য। এক্ষণে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে পৃথিবীতে এরূপ একদল দার্শনিক ছিলেন, যাঁহারা পাপ পুণ্য মনুষ্যের ইচ্ছার বহির্ভূত বলিয়া মনে করিতেন। ইঁহারা যে পুণ্য শিক্ষা অসম্ভব বোধ করিতেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। মিল স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন; কিন্তু তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, যে পুণ্যশিক্ষা অতীব কঠিন ব্যাপার। যাহা মার্জ্জিতবুদ্ধি, নির্লোভ, জ্ঞানী মহাপুরুষের নিকট অতীব কঠিন, তাহা যে তোমার আমার নিকট এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

জনসন্ বলেন, "যে অধিক কথা বলে, সে কতকগুলি অনর্থক বলিবেই ব-

দিবে।' কথা সম্বন্ধে যে নিয়ম, কার্য্য সম্বন্ধেও তাহাই। 'যে অনেক কার্য্য করে, সে কতকগুলি কার্য্য অন্যায় করিবেই করিবে।' এমতটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাংসারিক যে সন্ন্যাসী অপেক্ষা অধিকতর পাপী হইবেন, তাহা সহজেই বোধ হইতে পারে।

এস্থলে, আমরা কি বলিলাম একবার তাহা স্মরণ করিয়া দেখা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমাদিগের যুক্তির প্রণালী নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) স্বার্থত্যাগ শিক্ষাই ভাল মানুষ হইবার প্রধান উপায়।

(২) স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা সংসারে থাকিয়া হইতে পারে না। এজন্য সংসার ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু সংসার ত্যাগ সম্বন্ধে কএকটি আপত্তি আছে। যথা:—

(ক) সকলে সংসার ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে না।

(খ) সংসার ত্যাগ করিলে স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা করা যায় না। স্বার্থত্যাগ শিক্ষা সংসারে থাকিয়াই সম্ভব।

(৩) আপত্তিখণ্ডন। (আমরা যথাসাধ্য দেখাইয়াছি যে, সংসারে থাকিলে কোনরূপেই পুণ্য শিক্ষা করা যায় না।)

যদি কেহ এ প্রবন্ধ এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, কিজন্য আমরা স্বার্থত্যাগকে দুর্দ্ধর্ষ ও অজেয় শত্রু বলিয়া মনে করি। আমাদের অন্য এক প্রবল প্রমাণ এই যে, এতকাল পৃথিবী চলিয়া আসিতেছে, তথাপি পৃথিবীতে ভাল মানুষের সংখ্যা অতি অল্পই বৃদ্ধি হইয়াছে। যদি সংসারে থাকিয়া ভাল মানুষ হওয়া যাইত, তাহা হইলে এতদিন ভাল মানুষে সংসার পুরিয়া উঠিত।

অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বে আমরা ভাল মানুষের কি অর্থ করি, তাহা আরও একটুকু বিশদ করিয়া বলা উচিত বোধ হইতেছে। 'ভাল মানুষ' এ কথাটিতে প্রশংসাবাচক কিছুই নাই। সংসারের উপকার করিব, পৃথিবীর জ্ঞান বর্দ্ধন করিব, এসকল উদ্দেশ্য ভাল মানুষের নহে। ভাল করিতে পারি, না পারি, কাহার ও অনিষ্ট করিব না; সৎকার্য্য করিতে পারি না পারি, কোন অসৎকার্য্য করিব না; মহৎকার্য্য করিতে পারি না পারি, অন্যায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না; ইত্যাদি ভাল মানুষের উদ্দেশ্য। 'ভালমানুষ' চাহেন না যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার নাম প্রতিধ্বনিত হউক; চাহেন না যে দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে তাঁহার কীর্ত্তি বিঘোষিত হউক। 'ভালমানুষ' চাহেন নির্ম্মল, প্রসন্ন, রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত, শান্তভাবাপন্ন হৃদয়বৃত্তি। মনস্তুষ্টি জনিত সুখই ভাল মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীনী—

জীবনপ্রভাত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিজেতার পুরস্কার।

'ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে!
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাস যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে।'

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পর দিন অপরাহ্ণে সেই দুর্গোপরি অপরূপ সভা সন্নিবেশিত হইল। রৌপ্যবিনির্ম্মিত চারি স্তম্ভের উপর রক্ত বর্ণের চন্দ্রাতপ, নীচেও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত রাজগদীর উপর রাজা জয়সিংহ ও রাজা শিবজী উপবেশন করিয়া আছেন। চারি পার্শ্বে সৈন্যগণ বন্দুক লইয়া শ্রেণীবদ্ধে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই বন্দুকের কিরীচ হইতে রক্তবর্ণের পতাকা অপরাহ্ণের বায়ুহিল্লোলে নৃত্য করিতেছে। চারিদিকে শত শত লোক দিল্লীশ্বরের ও জয়সিংহ ও শিবজীর জয়নাদ করিতেছে।

জয়সিংহ সহাস্য বদনে বলিলেন 'আপনি দিল্লীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া অবধি তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়াছেন। এ উপকার দিল্লীশ্বর কখনই বিস্মৃত হইবেন না, আপনার সকল চেষ্টার জয় হইয়াছে।'

শিবজী। 'যেখানে জয়সিংহ সেই খানে জয়।'

সভাসদ্‌গণ সকলে সাধুবাদ করিল। জয়সিংহ আবার বলিলেন 'বোধ করি আমরা শীঘ্রই বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিব, আপনি এক রাত্রির মধ্যে এই দুর্গ অধিকার করিবেন তাহা আমি কখনই আশা করি নাই।'

শিব। 'মুসলমানদিগকে সুপ্ত পাইব বিবেচনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম সকলে জাগ্রত ও সসজ্জ! পূর্ব্বে কখনও দুর্গজয় করিতে এরূপ যুদ্ধ করিতে হয়নাই।'

জয়। 'বোধ করি এক্ষণ যুদ্ধের সময় বলিয়া রজনীতে সর্ব্বদাই শত্রুরা সসজ্জ থাকে।'

শিব। 'সত্য, কিন্তু এত দুর্গ জয় করিয়াছি, কোথাও সৈন্যগণকে এরূপ প্রস্তুত দেখি নাই।'

জয়। 'শিক্ষা পাইয়া ক্রমে সতর্ক হইতেছে। কিন্তু সতর্কই থাকুক অথবা নাই থাকুক, রাজা শিবজীর গতি অবারিত, শিবজীর জয় অনিবার্য্য!'

শিব। 'মহারাজের প্রসাদে দুর্গ

জন্ম হইয়াছে বটে, কিন্তু কল্য রজনীর ক্ষতি জীবনে পূরণ হইবে না। সহস্র আক্রমণকারীর মধ্যে পঞ্চশত জনকে আমি আর এ জীবনে দেখিব না, সেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিশ্বস্ত সেনা বোধ হয় আর পাইব না।' শিবজী ক্ষণেক শোকাকুল হইয়া রহিলেন। পরে বন্দীগণকে আনয়নের আদেশ করিলেন।

রহমৎখাঁর অধীনে সহস্র সেনা সেই দুর্গম দুর্গ রক্ষা করিত, কল্যকার যুদ্ধের পর কেবল তিনশত মাত্র জীবিত আছে। সকলের হস্তদ্বয় পশ্চাৎ দিকে বদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকলে সভাসম্মুখে উপস্থিত হইল।

শিবজী আদেশ করিলেন 'সকলের হস্ত খুলিয়া দাও। আফগান সেনাগণ! তোমরা বীরের নাম রাখিয়াছ, তোমাদের আচরণে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমরা স্বাধীন। ইচ্ছা হয় দিল্লীশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হও, নচেৎ আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট চলিয়া যাও,—আমার আদেশে কেহ তোমাদিগের কেশাগ্র স্পর্শ করিবে না।'

শিবজীর এই সদাচরণ দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না; সকল যুদ্ধে, সকল দুর্গজয়ের পর তিনি বিজিতদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ ও সদাচরণ করিতেন, তাঁহার বন্ধুগণ কখন কখন তাঁহাকে এজন্য দোষ দিতেন, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। শিবজীর সদাচরণে বিস্মিত হইয়া আফগানগণ অনেকেই দিল্লীশ্বরের বেতনভোগী হইতে স্বীকার করিল।

পরে শিবজী কিল্লাদার রহমৎখাঁকে আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহারও হস্তদ্বয় পশ্চাৎদিকে বদ্ধ, তাঁহার ললাটে খড়্গের আঘাত, বাহুতে তীর বিদ্ধ হইয়া ক্ষত হইয়াছে, কিন্তু বীর তখনও সদর্পে সভাসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, সদর্পে শিবজীর দিকে চাহিলেন।

শিবজী সেই বীরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া স্বয়ং আসন ত্যাগ করিয়া খড়্গ দ্বারা হস্তের রজ্জু কাটিয়া ফেলিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

'বীরপ্রধান! যুদ্ধের নিয়মানুসারে আপনার হস্তদ্বয় বদ্ধ হইয়াছিল, আপনি এক রজনী বন্দীরূপে ছিলেন, আমার সে দোষ মার্জ্জনা করুন, আপনি এক্ষণে স্বাধীন। আপনার বীরত্বের কথা কি বলিব; জয় পরাজয় ভাগ্যক্রমে ঘটে, কিন্তু আপনার ন্যায় যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমিই সম্মানিত হইয়াছি।'

রহমৎখাঁ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তাহাতেও তাঁহার স্থির গর্ব্বিত নয়নের একটি পত্রও কম্পিত হয় নাই; কিন্তু শিবজীর এই অসাধারণ ভদ্রতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। যুদ্ধসময়ে শত্রুমধ্যে কেহ কখনও রহমৎখাঁর কাতরতা-চিহ্ন দেখেন নাই, অদ্য যুদ্ধের দুই উজ্জ্বল চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। রহমৎখাঁ মুখ ফিরাইয়া

তাহা মোচন করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—

'ক্ষত্রিয়-রাজ! কল্য নিশীথে আপনার বাহুবলে পরাস্ত হইয়াছিলাম, অদ্য আপনার ভদ্রাচরণে তদধিক পরাস্ত হইলাম। যিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের অধীশ্বর, যিনি পাদসাহের উপর পাদসাহ, জমীন ও আসমানের সুলতান, তিনি এই জন্য আপনাকে নূতন রাজ্য বিস্তারের ক্ষমতা দিয়াছেন।' বৃদ্ধের নয়ন হইতে আর দুই বিন্দু জল পড়িল।

রাজা জয়সিংহ কহিলেন 'পাঠানরাজ! আপনারও উচ্চপদের যোগ্যতা আপনি প্রমাণ করিয়াছেন। দিল্লীশ্বর আপনার ন্যায় সেনা পাইলে আরও পদবৃদ্ধি করিবেন সন্দেহ নাই। দিল্লীশ্বরকে কি লিখিতে পারি যে আপনার ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহার সৈন্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইতে সম্মত হইয়াছেন?'

রহমৎখাঁ উত্তর করিলেন 'মহারাজ! আপনার প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইলাম, কিন্তু আজীবন যাঁহার কার্য্য করিয়াছি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না, যত দিন এ হস্ত খড়্গ ধরিতে পারিবে, বিজয়পুরের জন্য ধরিবে।'

শিবজী বলিলেন 'তাহাই হউক। আপনি অদ্য রাত্রি বিশ্রাম করুন, কল্য প্রাতে আমার একদল সেনা আপনাকে বিজয়পুর পর্য্যন্ত নিরাপদে পঁহুছিয়া দিবে।' এই বলিয়া রহমৎখাঁকে যথোচিত সম্মান ও শুশ্রূষা করিবার জন্য একজন প্রহরীকে আদেশ দিলেন।

রহমৎখাঁ স্থিরনেত্রে ক্ষণেক শিবজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন 'ক্ষত্রিয়বর! আপনি আমার সহিত ভদ্রাচরণ করিয়াছেন, আমি অভদ্রাচরণ করিব না, আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিব না। আপনার সেনার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন সকলে প্রভু ভক্ত নহে। কল্য দুর্গাক্রমণের গোপনানুসন্ধান আমি পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্যই সমস্ত সেনা সমস্ত রাত্রি সসজ্জ ও প্রস্তুত ছিল। অনুসন্ধানদাতা আপনারই একজন সেনা। ইহার অধিক বলিতে পারি না, সত্য লঙ্ঘন করিব না।' রহমৎখাঁ ধীরে ধীরে প্রহরীগণের সহিত প্রাসাদাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

রোষে শিবজীর মুখমণ্ডল একবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার বন্ধুগণ বুঝিলেন এক্ষণে পরামর্শ দেওয়া বৃথা; তাঁহার সৈন্যগণ বুঝিল অদ্য প্রমাদ উপস্থিত।

জয়সিংহ শিবজীকে এতদাবস্থায় দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'ক্ষান্ত হউন, একের দোষে সমস্ত সৈন্যের উপর ক্রোধ অনুচিত।' পরে শিবজীর সৈন্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

'এই দুর্গ আক্রমণ করা হইবে, তোমরা কখন জানিয়াছিলে?

সৈন্যগণ উত্তর দিল 'এক প্রহর রজনীতে।'

জয়। 'তাহার পূর্ব্বে কেহই এ কথা জানিতে না?'

সৈন্য। 'রজনীতে কোন একটি দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে জানিতাম, এই দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে তাহা জানিতাম না।'

জয়। 'ভাল, কোন্ সময়ে তোমরা দুর্গে পৌঁছিয়াছিলে?'

সৈন্য। 'অনুমান দেড় প্রহর রজনীর সময়।'

জয়। 'উত্তম। এক প্রহর হইতে দেড়প্রহর মধ্যে তোমরা সকলেই কি একত্র ছিলে? 'অমুক উপস্থিত নাই,' 'অমুক কোথায় গিয়াছে?' 'অমুক আসিল না কেন?' তোমাদিগের মধ্যে এরূপ কথা হয় নাই? যদি হইয়া থাকে প্রকাশ কর। দেখ একজনের জন্য সহস্র জনের গ্লানি অনুচিত; তোমরা দেশে দেশে পর্ব্বতে পর্ব্বতে গ্রামে গ্রামে মহাবীর রাজা শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, রাজা তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন,তোমরাও এরূপ প্রভু কখনও পাইবে না। আপনাদিগকে বিশ্বাসের যোগ্য প্রমাণ কর, যদি কেহ বিদ্রোহী থাকে তাহাকে আনিয়া দাও যদি সে কল্য রজনীর যুদ্ধে মরিয়া থাকে তাহার নাম কর, অন্যায় সন্দেহে কেন সকলের মন কলুষিত হইতেছে?,,

সৈন্যগণ তখন কল্যকার কথা স্মরণ করিতে লাগিল, পরস্পরের কথা কহিতে লাগিল; শিবজীর রোষ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিলেন 'মহারাজ! অদ্য যদি সেই কপট যোদ্ধাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন আমি চিরকাল আপনার নিকট ঋণী থাকিব।'

চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—

'রাজন্। কল্য এক প্রহর রজনীর সময় যখন আমরা যুদ্ধযাত্রা করি, তখন আমার অধীনস্থ একজন হাবেলদারকে অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই, যখন দুর্গতলে পঁহুছিলাম তখন তিনি আমাদের সহিত যোগ দিলেন।'

ভীষণস্বরে শিবজী বলিলেন 'সে কে, এখনও জীবিত আছে?'

বিদ্রোহীর নাম শুনিবার জন্য সকলে নিস্তব্ধ!—একটি নিশ্বাসের শব্দও শুনা যাইতেছে না, সভাতলে একটি সূচিকা পড়িলে বোধ হয় তাহার শব্দ শুনা যায়। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন,—" রঘুনাথজী হাবেলদার!'

সকলে নির্ব্বাক, বিস্ময়স্তব্ধ!

চন্দ্ররাও একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের আগমনাবধি সকলে চন্দ্ররাওয়ের নাম ও বিক্রম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মানবপ্রকৃতিতে ঈর্ষ্যার ন্যায় ভীষণ বলবতী প্রবৃত্তি আর নাই।

শিবজীর মুখমণ্ডল পুনরায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠে দন্ত স্থাপন করিয়া চন্দ্র-

রাওকে লক্ষ্য করিয়া সরোষে বলিলেন—

'নিন্দুক, কপটাচারি। তোমার নিন্দায় রঘুনাথের যশোরাশি স্পর্শ করিবে না, রঘুনাথের আচরণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কিন্তু মিথ্যা নিন্দুকের শাস্তি সৈন্যেরা দেখুক।'

সেই বজ্রহস্তে শিবজী লৌহবর্ষা উত্তোলন করিয়াছেন সহসা রঘুনাথ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—

'মহারাজ! প্রভু চন্দ্ররাওয়ের প্রাণ সংহার করিবেন না। তিনি মিথ্যাবাদী নহেন, আমার দুর্গতলে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল।

আবার সভাস্থল নিস্তব্ধ। নিঃশব্দে সমস্ত সৈন্য রঘুনাথের দিকে অবলোকন করিতেছে!

শিবজী ক্ষণকাল প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন,—"উঃ! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তুমি! রঘুনাথ তুমি এই কার্য্য করিয়াছ! তুমি যে প্রাচীরলঙ্ঘনের সময় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া একাকী অগ্রসর হইতেছিলে, পরে তিনশত সেনা মাত্র লইয়া দ্বিগুণ সংখ্যক আফগানকে পরাস্ত করিয়াছিলে, তুমি বিদ্রোহাচরণ করিয়া কিল্লাদারকে পূর্ব্বে আক্রমণ-সংবাদ দিয়াছিলে?' শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল।

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, 'প্রভু, আমি সে দোষে নির্দ্দোষী।' দীর্ঘকায় নির্ভীক তরুণ যোদ্ধা শিবজীর অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে নিষ্কম্প হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চক্ষের পলক পড়িতেছে না, একটি পত্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে না। সভাস্থ সকলে, চারিদিকে অসংখ্য লোক সমূহে, রঘুনাথের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছে। রঘুনাথজী স্থির, অবিচলিত, অকম্পিত; তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল কেবল গভীর নিশ্বাসে স্ফীত হইতেছে! কল্য যেরূপ অসংখ্য শত্রুমধ্যে প্রাচীরোপরি একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, অদ্য তদপেক্ষা অধিক সঙ্কট মধ্যে যোদ্ধা সেইরূপ ধীর, সেইরূপ অবিচলিত।

শিবজী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন—'তবে কি জন্য আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এক প্রহর রজনীর সময় অনুপস্থিত ছিলে?'

রঘুনাথের ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, কোন উত্তর না করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রঘুনাথকে নির্ব্বাক দেখিয়া শিবজীর সন্দেহ বৃদ্ধি হইল, নয়নদ্বয় পুনরায় রক্তবর্ণ হইল, ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন—

'কপটাচারি! এই জন্য এরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলে? কিন্তু কুক্ষণে শিবজীর নিকট ছলনা চেষ্টা করিয়াছিলে।'

রঘুনাথ সেইরূপ ধীর অকম্পিত স্বরে বলিলেন,— 'রাজন্! ছলনা, কপটাচরণ

আমার বংশের রীতি নহে,—বোধ হয় প্রভু চন্দ্ররাও তাহা জানিতে পারেন।' অদ্য প্রথমে রঘুনাথ আপন বংশের উল্লেখ করিলেন।

রঘুনাথের স্থির ভাব শিবজীর ক্রোধে আহুতি স্বরূপ হইল, তিনি কর্কশভাবে বলিলেন—

'পাপিষ্ঠ। নিষ্কৃতি চেষ্টা বৃথা! ক্ষুধার্থ সিংহের গ্রাসে পড়িয়া পলায়ন করিতে পার, কিন্তু শিবজীর জ্বলন্ত ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ নাই।'

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, 'আমি মহারাজের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করি না, মনুষ্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি না, জগদীশ্বর আমার দোষ মার্জ্জনা করুন!'

ক্ষিপ্তপ্রায় শিবজী বর্শা উত্তোলন করিয়া বজ্রনাদে আদেশ করিলেন,—

'বিদ্রোহাচরণের শাস্তি প্রাণদণ্ড।'

রঘুনাথ সেই বজ্রমুষ্টিতে সেই তীক্ষ্ণ বর্শা দেখিলেন, সেই অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—'যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত আছে, বিদ্রোহাচরণ সে করে নাই।'

শিবজী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অব্যর্থ মুষ্টিতে সেই বর্শা কম্পিত হইতেছে এরূপ সময়ে রাজা জয়সিংহ তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।

তখন শিবজীর মুখমণ্ডল ক্রোধে বিকৃত হইয়াছিল, শরীর কম্পিত হইতেছিল, তিনি জয়সিংহের প্রতিও সমুচিত সম্মান বিস্মৃত হইলেন, কর্কশ স্বরে কহিলেন—

'হস্ত ত্যাগ করুন; রাজপুতদিগের কি নিয়ম জানি না, জানিতে চাহি না, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সনাতন নিয়ম—বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড; শিবজী সেই নিয়ম পালন করিবে।

জয়সিংহ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "ক্ষত্রিয়রাজ! অদ্য যাহা করিবেন, কল্য তাহা অন্যথা করিতে পারিবেন না। এই যোদ্ধার অদ্য প্রাণদণ্ড করিলেন চিরকাল সে জন্য অনুতাপ করিবেন। যুদ্ধ-নিয়মে আপনি পারদর্শী কিন্তু বৃদ্ধ যে পরামর্শ দিতেছে তাহা অবহেলা করিবেন না।"

শিবজী জয়সিংহের ভদ্রতা দেখিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন, কহিলেন 'তাত! আমার পরুষ বাক্য মার্জ্জনা করুন, আপনার কথা কখন ও অবহেলা করিব না; কিন্তু শিবজী বিদ্রোহীকে ক্ষমা করিবে তাহা কখন মনে ভাবে নাই।' পরে রঘুনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

'হাবেলদার! রাজা জয়সিংহ তোমার জীবন রক্ষা করিলেন, কিন্তু আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শিবজী বিদ্রোহীর মুখদর্শন করিতে চাহে না।' তৎক্ষণাৎ পুনরায় বলিলেন 'অপেক্ষা কর; দুই বৎসর হইল তোমার কোষের ঐ অসি আমিই তোমাকে দিয়াছিলাম, বিদ্রোহীর হস্তে আমার অসির অবমাননা হইবে না। প্রহরীগণ! অসি কাড়িয়া লও, পরে বি-

দ্রোহীকে দুর্গ হইতে নিক্রান্ত করিয়া দাও।' প্রহরীগণ সেইরূপ করিল।

রঘুনাথের যখন প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, রঘুনাথ সে সময়ে অবিচলিত ছিলেন, কিন্তু প্রহরীগণ যখন অসি কাড়িয়া লইতেছিল, তখন তাঁহার শরীর ঈষৎ কম্পিত হইল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইল। কিন্তু তিনি সে ভীষণ উদ্বেগ সংযম করিলেন। শিবজীর দিকে একবার চাহিয়া মৃত্তিকা পর্য্যন্ত শির নমাইয়া, নিঃশব্দে দুর্গ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া জগৎ আবৃত করিতেছে, একজন পথিক একাকী নিঃশব্দে পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রান্তরাভিমুখে গমন করিলেন। প্রান্তর পার হইলেন, একটি গ্রামে উপস্থিত হইলেন, সেটি পার হইয়া আর একটি প্রান্তরে আসিলেন। অন্ধকার গভীরতর হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে, অন্ধকারে সে পথিককে আর দেখা গেল না, তাহার পর আর কেহ সে পথিককে দেখিতে পাইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্ররাও জুমলাদার।

' আমা হইতে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ,
হৃদে জ্বলে হলাহল।——————'

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্ররাও জুমলাদারের সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়, তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, অসাধারণ বীর্য্য, অসাধারণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাঁহার বয়স রঘুনাথ অপেক্ষা ৫। ৬ বৎসর অধিক মাত্র, কিন্তু দূর হইতে দেখিলে সহসা তাঁহাকে পঞ্চত্রিংশৎ বৎসরের লোক বলিয়া বোধ হয়। প্রশস্ত ললাটে এই বয়সেই দুই একটি চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, মস্তকের কেশ দুই একটি শুক্ল। নয়ন অতিশয় উজ্জ্বল ও তেজোব্যঞ্জক, কিন্তু চন্দ্ররাওকে যাঁহারা বিশেষ করিয়া জানিতেন তাঁহারা বলিতেন যে চন্দ্ররাওয়ের তেজ ও সাহস যেরূপ দুর্দ্দমনীয়, গভীর দূরদর্শী চিন্তা এবং ভীষণ অনিবার্য্য স্থির প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ। সমস্ত মুখমণ্ডলে এই দুইটি ভাব বিশেষ রূপে ব্যক্ত হইত। দেহ যেন লৌহবিনির্ম্মিত ও অসীম পরাক্রান্ত; যাঁহারা চন্দ্ররাওয়েব অসীম পরাক্রম, বিজাতীয় ক্রোধ গভীর বুদ্ধি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা কখনই সেই অল্পভাষী স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভয়ানক জুমলাদারের সহিত বিবাদ করিতেন না। এ সমস্ত ভিন্ন চন্দ্ররাওয়ের আর একটি গুণ বা দোষ ছিল তাহা কেহই বিশেষরূপে জানিত না। বিজাতীয় উচ্চাভিলাষে তাঁহার হৃদয় দিবারাত্র জ্বলিত। অসাধারণ বুদ্ধিসঞ্চালনে আত্মোন্নতির পথ আবিষ্কার করিতেন, অতুল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত সেই পথ অবলম্বন করিতেন, খড়্গহস্তে সে পথ পরিষ্কার

করিতেন; শত্রু হউক, মিত্র হউক, দোষী হউক, নির্দ্দোষী হউক, অপকারী হউক বা পরম উপকারী হউক, সে পথের সম্মুখে যিনি পড়িতেন, উচ্চাভিলাষী চন্দ্ররাও নিঃসঙ্কোচে পতঙ্গবৎ তাহাকে পদ-দলিত করিয়া নিজ পথ পরিষ্কার করিতেন। অজ্ঞ বালক রঘুনাথ ঘটনাবশতঃ সেই পথের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, তাহাকে পতঙ্গবৎ দলিত করিয়া জুমলাদার পথ পরিষ্কার করিলেন। এরূপ অসাধারণ পুরুষের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক, সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের বংশবৃত্তান্তও কিছু কিছু জানিতে পারিব।

তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত তিনি প্রকাশ করিতেন না, আমরাও জানি না, অতি উন্নত রাজপুতকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন। রাজা যশোবন্ত সিংহের একজন প্রধান সেনানী গজপতি সিংহ চন্দ্ররাওকে বাল্যকালে লালনপালন করিয়াছিলেন। অনাথ বালক গজপতির গৃহের কার্য্য করিত, গজপতির পুত্র কন্যাকে যত্ন করিত, ও সেই সংসারের মধ্যে থাকিয়া কালযাপন করিত।

যখন চন্দ্ররাওয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র, তখনই গজপতি তাঁহার গভীর চিন্তা ও বুদ্ধি, দুর্দ্দমনীয় তেজ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, নিজ পুত্র রঘুনাথের ন্যায় চন্দ্ররাওকে ভাল বাসিতেন, ও এই কোমল বয়সেই আপন অধীনে সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন।

সৈনিকের ব্রত ধারণ করিয়া অবধিই চন্দ্ররাও দিন দিন যে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহা দেখিয়া প্রাচীন যোদ্ধাগণও বিস্মিত হইত। যুদ্ধে যে স্থানে অতিশয় বিপদ, যে স্থানে প্রাণনাশের অতিশয় সম্ভাবনা, যে স্থানে শত্রু ও মিত্রের শব রাশীকৃত হইতেছে, রক্তস্রোত বহিয়া যাইতেছে, ধূলি ও ধূমে গগন আচ্ছাদিত হইতেছে, যোদ্ধার ভীষণ হুঙ্কারে ও আর্ত্তের আর্ত্তনাদে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে,—তথায় অন্বেষণ কর, পঞ্চদশ বর্ষের বালক নিঃশব্দে অসুর-বীর্য্য প্রকাশ করিতেছে; মুখে রব নাই, কিন্তু নয়ন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত, ললাট কুঞ্চিত ও বিজাতীয় ক্রোধ-চ্ছায়ায় কৃষ্ণবর্ণ! যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যে স্থানে যুদ্ধজয়ী সেনাগণ একত্র হইল। রজনীতে গীত বাদ্য করিতেছে, হাস্য ও আমোদ করিতেছে,—চন্দ্ররাও তথায় নাই; অল্পভাষী দৃঢপ্রতিজ্ঞ বালক শিবিরের অন্ধকারে একাকী বসিয়া রহিয়াছে, অথবা কুঞ্চিত ললাটে প্রান্তরে বা নদীতীরে একাকী সায়ংকালে পাদচারণ করিতেছে! চন্দ্ররাওয়ের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাধিত হইল, তিনি এক্ষণে অজ্ঞাত ব্রাহ্মণ-শিশু নহেন, তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছে, গজপতি সিংহের অধীনস্থ সমস্ত সেনার মধ্যে চন্দ্ররাও এক্ষণে একজন অসাধারণ সাহসী তেজস্বী বীর বলিয়া পরিচিত। মর্য্যাদাবৃদ্ধির সহিত চন্দ্ররাওয়ের উচ্চাভিলাষ ও গর্ব্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

একদিন একটি যুদ্ধে চন্দ্ররাওয়ের বিক্রম দেখিয়া গজপতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, বিজয়ের পর চন্দ্ররাওকে নিকটে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে যথোচিত সম্মান করিয়া বলিলেন 'চন্দ্ররাও! অদ্য তোমার সাহসেই আমাদিগের যুদ্ধে জয় হইয়াছে, ইহার পুরস্কার তোমাকে কি দিতে পারি?' চন্দ্ররাও মুখ অবনত করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন 'প্রভুর সাধুবাদে দাস যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছে, আর অধিক সে কি চাহিতে পারে?' গজপতি সস্নেহে বলিলেন 'মনে ভাবিয়া দেখ, যাহা ইচ্ছা হয় প্রকাশ করিয়া বল। অর্থ, ক্ষমতা, পদবৃদ্ধি,—চন্দ্ররাও! তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই।' চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে নয়ন উঠাইয়া বলিলেন,—

'রাজপুত বীর কখনও অঙ্গীকার অন্যথা করেন না জগতে বিদিত আছে। বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে আমার সহিত বিবাহ দিন।'

সভাস্থ সকলে নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ। গজপতির মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইল; অসি কোষ হইতে অর্দ্ধেক নিষ্কোষিত করিলেন, কিন্তু সে ক্রোধ কথঞ্চিৎ সংযম করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—

'অঙ্গীকার পালনে স্বীকৃত আছি, কিন্তু তোমার মহারাষ্ট্র দেশে জন্ম, রাজপুতদুহিতাদিগের দস্যু মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত পর্ব্বতকন্দরে ও জঙ্গলমধ্যে থাকিবার অভ্যাস নাই। অগ্রে লক্ষ্মীর উপযুক্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ কর, পরে মহারাষ্ট্রীয় ভৃত্যের সহিত রাজবংশীয়া বালিকার বিবাহ দিবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাইবে। এখন অন্য কোন যাচ্ঞা আছে?'

সভাস্থ সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন 'অন্য কোন যাচ্ঞা এক্ষণে নাই, যখন থাকিবে প্রভুকে জানাইব।'

সভা ভঙ্গ হইল, সকলে নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল, উদারচেতা গজপতি চন্দ্ররাওয়ের প্রতি ক্রোধ অচিরাৎ বিস্মৃত হইলেন, সেদিনকার কথা শীঘ্র বিস্মৃত হইলেন। চন্দ্ররাও সে কথা বিস্মৃত হইলেন না, সেই দিন সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে আপন শিবিরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন, প্রায় দুই দণ্ড এইরূপে পাদচারণ করিলেন, শিবির অন্ধকার, কিন্তু তাহা অপেক্ষা দুর্ভেদ্য অন্ধকার চন্দ্ররাওয়ের হৃদয় ও ললাটে বিরাজ করিতেছিল। তাঁহার সে সময়ের ভাব বর্ণনা করিতে আমরা অশক্ত, সে সময়ে তাঁহার মুখের ভীষণ আকৃতি দেখিলে বোধ হয় স্বয়ং মৃত্যুও চকিত হইতেন।

দুই দণ্ডের পর চন্দ্ররাও একটি দীপ জ্বালিলেন,—একখানি পুস্তকে সযত্নে কি লিখিলেন, পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন, আবার খুলিলেন, আবার দেখিলেন, আবার বন্ধ করিলেন। ঈষৎ বিকট হাস্য মুখমণ্ডলে দেখা গেল।

তাঁহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'চন্দ্র! কি লিখিতেছ?' চন্দ্ররাও সহজ অবিচলিত স্বরে বলিলেন 'কিছু নহে, হিসাব লিখিয়া রাখিতেছি, আমি কাহার নিকট কি ধারি তাহাই লিখিতেছি।'

বন্ধু চলিয়া গেল। চন্দ্ররাও পুনরায় পুস্তকখানি খুলিলেন। সেইটি যথার্থই হিসাবের পুস্তক, চন্দ্ররাও একটি ঋণের কথাই লিখিয়াছিলেন। পুনরায় পুস্তক বন্ধ করিয়া দীপ নির্ব্বাণ করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আরংজীবের সহিত যশোবন্তের উজ্জয়িনী সন্নিধানে মহাযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গজপতি সিংহ হত হয়েন, কিন্তু যে তীর তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করে তাহা শত্রুহস্ত নিক্ষিপ্ত নহে।

তাহার পর যখন যশোবন্তের রাজ্ঞী সেই যুদ্ধে পতির পরাজয়ের কথা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিলেন, তখন একজন সংবাদ দিল যে গজপতি নামক একজন সেনানীর ভীরুতা ও কপটাচারিতাতেই পরাজয় সাধন হইয়াছে। রাজ্ঞী সে সময়ে বিচার করিতে অসমর্থ, আদেশ করিলেন যে কপটাচারীর সন্তান সন্ততি মাড়ওয়ার হইতে দূরীকৃত হয়, ও সমস্ত সম্পত্তি রাজাধীনে নীত হয়! গজপতির কপটাচারিতার সংবাদ কে দিল তাহা স্পষ্ট প্রকাশ হইল না।

গজপতির অনাথা বালক ও বালিকা মাড়ওয়ার হইতে দূরীকৃত হইয়া পদব্রজে অন্য দেশে যাইতেছিল, রঘুনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, লক্ষ্মীর নয় বৎসর মাত্র, সঙ্গে কেবল একমাত্র পুরাতন ভৃত্য। রাজ্ঞীর ভয়ে হতভাগাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেও কেহ সাহস করিল না। পথিমধ্যে একদল দস্যু সেই ভৃত্যকে হত্যা করিয়া বালকবালিকাকে মহারাষ্ট্রদেশে লইয়া যাইল। বালক অল্পবয়সেই তেজস্বী; রজনীযোগে দস্যুদিগের শিবির হইতে পলায়ন করিল, বালিকাকে দস্যুপতি বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন। তিনি চন্দ্ররাও!

তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্ররাওয়ের মনোরথ কতক পরিমাণে পূর্ণ হইল। গজপতির সংসার হইতে প্রভূত অর্থ ও মণি মাণিক্য আনিয়াছিলেন, বিস্তীর্ণ জায়গীর কিনিলেন, মহারাষ্ট্রে একজন সমাদৃত সম্ভ্রান্ত লোক হইলেন। 'টাকা থাকিলে সব সাজে,—' চন্দ্ররাওয়ের বংশ এক পুরাতন রাজপুতবংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথা কেহ অবিশ্বাস করিল না, তিনি প্রসিদ্ধনামা রাজপুত গজপতি সিংহের একমাত্র দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছেন সকলে দেখিতে পাইল, তাঁহার যথার্থ সাহস বিক্রম দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে জুমলাদারের পদ দিলেন, তাঁহার বিপুল অর্থ জায়গীর ও বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সমাজে সমাদর করিলেন। চন্দ্ররাও আরও দুই তিনটি বড় ঘরে বিবাহ করিলেন, বড় লোকের স-

ছিত মিশিতে লাগিলেন, বড় রকম চাল অবলম্বন করিলেন। আর কি করিলেন বলার আবশ্যক কি? যে সমস্ত সুন্দর কৌশলে আমরাই 'বড লোক' হই, সমাজের শিরোভূষণ হই, পদ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করি, সঙ্গে সঙ্গে দম্ভ ও গাম্ভীর্য্যও বৃদ্ধি করি,—চন্দ্ররাও তাহাই করিলেন। তবে চন্দ্ররাও অসভ্য, তিনি স্বহস্তে পিতাস্বরূপ গজপতিকে হনন করিয়া সে উন্নত বংশের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন— আমরা সুসভ্য, আমরা চাতুরী ও মোকদ্দমা স্বরূপ সুন্দর উপায়ে কত সোণার সংসার ছার খার করি, কেহ নিন্দা করিতে পারে না, কেননা এ সভ্য 'আইন সঙ্গত' উপায়। চন্দ্ররাও অসভ্য, যুদ্ধে ভীষণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া আপন পদবৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেন, দেশে দেশে যশোবিস্তারের চেষ্টা পাইতেন। আমরা সুসভ্য, বক্তৃতা স্বরূপ বাগ্‌যুদ্ধে বা সংবাদপত্র স্বরূপ লেখনীযুদ্ধে ভীষণ বিক্রম দেখাইয়া রাজার নিকট উপাধি প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করি, অচিরে 'দেশহিতৈষী মহল্লোক' হইয়া উঠি! চারিদিকে জয়ধ্বনি বাজিতে থাকে, সংবাদপত্রের ভেরী বাজিতে থাকে, দেশে দেশে সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে—আমরা 'বড়লোক!'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মীবাই।

"স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার যে বিধাতা।
স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনা অন্যজন,
কেহ নহে সুখ মোক্ষদাতা।"

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় রঘুনাথ দস্যুবেশী চন্দ্ররাও দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজস্থান হইতে মহারাষ্ট্রদেশে নীত হইয়াছিলেন। এক দিন রজনীযোগে তিনি পলায়ন করেন, পর্ব্বতকন্দরে, বনমধ্যে, প্রান্তরে, বা গৃহস্থের বাটিতে, কয়েক দিন লুক্কায়িত থাকেন, সুন্দর অনাথ অল্পবয়স্ক বালককে দেখিয়া কেহই মুষ্টিভিক্ষা দিতে পরাঙ্মুখ হইত না।

তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর রঘুনাথ নানা স্থানে নানা কষ্টে অতিবাহিত করিল। সংসার স্বরূপ অনন্ত সাগরে অনাথ বালক একাকী ভাসিতে লাগিল! নানা দেশে পর্য্যটন করিল, নানা লোকের নিকট ভিক্ষা বা দাসত্বরৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিল। পূর্ব্ব গৌরবের কথা, পিতার বীরত্ব ও সম্মানের কথা, বালকের মনে সর্ব্বদাই জাগরিত হইত, কিন্তু অভিমানী বালক সে কথা, সে দুঃখ, কাহাকেও বলিত না, কখন কখন দুঃখভার সহ্য করিতে না পারিলে নিঃশব্দে প্রান্তরে বা পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি উ-

পবেশন করিয়া একাকী প্রাণ ভরিয়া রোদন করিত, পুনরায় চক্ষের জল মোচন করিয়া স্বকার্য্যে যাইত।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বংশোচিত ভাব হৃদয়ে যেন আপনিই জাগরিত হইতে লাগিল। অল্প বয়স্ক ভৃত্য গোপনে কখন কখন প্রভুর শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধারণ করিত, প্রভুর অসি কোষে ঝুলাইত! সন্ধ্যার সময় প্রান্তরে বসিয়া দেশীয় চরণদিগের গান উচ্চৈঃস্বরে গাইত, নৈশপথিকেরা পর্ব্বতগুহায় সংগ্রাম সিংহ বা প্রতাপের গীত শুনিয়া চমকিত হইত। যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়স তখন রঘুনাথ শিবজীর কীর্ত্তি, শিবজীর উদ্দেশ্য, শিবজীর বীর্য্যের কথা, চিন্তা করিতেন। রাজস্থানের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়দেশ স্বাধীন হইবে, শিবজী দক্ষিণদেশে হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবেন, চিন্তা করিতে করিতে বালকের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইল, তিনি শিবজীর নিকট যাইয়া একটি সামান্য সেনার কার্য্য প্রার্থনা করিলেন।

শিবজী লোক চিনিতে অদ্বিতীয়, কয়েক দিনের মধ্যে রঘুনাথকে চিনিলেন, একটি হাবেলদারী পদে নিযুক্ত করিলেন, ও তাহার কয়েক দিবস পরেই তোরণদুর্গে পাঠাইলেন। পথে রঘুনাথের সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

রঘুনাথ হাবেলদারী পদ পাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। রঘুনাথের শিবজীর নিকট আগমনের সময় চন্দ্ররাও জুমলাদারের অধীনে একজন হাবেলদারের মৃত্যু হয়, তাহারই পদ রঘুনাথ প্রাপ্ত হয়েন। রঘুনাথ চন্দ্ররাওকে পিতার পুরাতন ভৃত্য ও আপন বাল্যসুহৃৎ বলিয়া চিনিলেন; পিতৃহন্তা, বা দস্যুরূপী, বা ভগিনীপতি বলিয়া জানিতেন না, সুতরাং তিনি সানন্দে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাইলেন। চন্দ্ররাও রঘুনাথকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু অল্পভাষী জুমলাদারের ললাট অদ্য পুনরায় কুঞ্চিত হইল।

দিনে দিনে রঘুনাথজীর সাহস ও বিক্রমের যশ অধিক বিস্তার হইতে লাগিল, চন্দ্ররাওয়ের চিন্তা গভীরতর হইল। পতঙ্গ বা কীট আমাদের পথের সম্মুখে আসিলে আমরা পদসঞ্চালন দ্বারা দুর্ভাগ্যকে হত করিয়া পথ পরিষ্কার করি—চন্দ্ররাও ও কোনদিন গোপনে রঘুনাথকে হনন করিয়া আপন পথ পরিষ্কার করিবেন ভাবিলেন। কিন্তু যখন রঘুনাথের যশোরাশি তাঁহার নিজের যশকেও ম্লান করিল, যখন লোকে বালকের সাহস দেখিয়া বিক্রমশালী চন্দ্ররাওয়ের বিক্রম ও বিস্মৃত হইতে লাগিল, চন্দ্ররাও তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন ‘এ বালককে ভীষণতর শাস্তি দেওয়া আবশ্যক,—ইহার যশ বিনষ্ট করিব।’ চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্ররাওয়ের নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, মৃত্যুর ছায়া যেন সেই কুঞ্চিত ললাটকে আবৃত করিল।

চন্দ্ররাওয়ের স্থির প্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হইত না, গভীর মন্ত্রণা কখনও ব্যর্থ হইত না। অদ্য রঘুনাথজী দৈবযোগে প্রাণে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু বিদ্রোহী কপটাচারী বলিয়া শিবজীর কার্য্য হইতে দূরীকৃত হইলেন।

চন্দ্ররাওও শিবজীর নিকট কয়েক দিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী যাইলেন। পাঠক চল চল, আমরাও এক বার বড়লোকের বাটী সভয়ে প্রবেশ করি।

জুমলাদার বাটী আসিলেন, বহির্দ্বারে নহবৎ বাজিতে লাগিল,দাস দাসী শশব্যস্তে প্রভুর সম্মুখে আসিল, গৃহিনীগণ পতিকে অভ্যার্থনা করিবার জন্য বেশ ভূষা করিতে লাগিলেন, প্রতিবাসীগণ সাক্ষ্যাৎ করিতে আসিলেন, অচিরে চন্দ্ররাওয়ের আগমন বার্ত্তা সমগ্র গ্রামে রাষ্ট্র হইল।

সায়ংকালে চন্দ্ররাও অন্তঃপুরে আসিলেন, লক্ষ্মীবাই ভক্তি ভাবে স্বামীর চরণে প্রণত হইলেন, পরে আহারাদির আয়োজন করিয়া স্বামীকে আহ্বান করিলেন। চন্দ্ররাও আহারে বসিলেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবাই যথার্থ লক্ষ্মীস্বরূপা, শান্তা, ধীরা, বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা। বাল্যকালে পিতার আদরের কন্যা ছিলেন, কিন্তু কোমল বয়সে বিদেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে অল্পভাষী কঠোরস্বভাব স্বামীর হস্তে পড়িলেন, বৃক্ষ হইতে উৎপাটিত কোমল পুষ্পের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন। নয় বৎসরের বালিকার জীবন শোকাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু সে শোক কাহাকে জানাইবে? কে দুটা কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে? বালিকা পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিত, পিতার কথা স্মরণ করিত, প্রাণের সহোদরের কথা স্মরণ করিত, আর গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিত।

শোকে পড়িলে, কষ্টে পড়িলে, আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, আমাদের হৃদয় ও মন শান্ত, সহিষ্ণু হয়। বালিকা দুই এক বৎসরের মধ্যেই সংসারের কার্য্য করিতে লাগিলেন,, স্বামীর সেবায় রত হইলেন। হিন্দু-রমণীর পতি ভিন্ন আর কি গতি আছে? স্বামী যদি সহৃদয় ও সদয় হয়েন, নারী আনন্দে ভাসিয়া তাঁহার সেবা করেন, স্বামী নির্দ্দয় বা বিমুখ হইলেও নারীর পতিসেবা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? চন্দ্ররাওয়ের হৃদয়ে প্রণয় বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না, অভিমান, জিঘাংসা, উচ্চাভিলাষ, অপূর্ব্ব বিক্রমে সে হৃদয় পূর্ণ; তথাপি তিনি স্ত্রীর প্রতি নির্দ্দয় ছিলেন না, দাসী লক্ষ্মীবাইয়ের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিতেন, লক্ষ্মীও দাসী স্বরূপ স্বামীর যথেষ্ট সেবা করিতেন, স্বামীর স্বভাব জানিয়া সর্ব্বদা ভীত থাকিতেন. একটি মিষ্ট কথা শুনিলে আপনাকে পরমা ভাগ্যবতী বিবেচনা ক-

রিতেন, স্বামীর একান্ত প্রণয় কি কখন জানিতেন না, সুতরাং কখন আশা করেন নাই।

এইরূপে সংসারকার্য্যে ও পতিসেবায় এক বৎসরের পর আর এক বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, ধীর শান্ত লক্ষ্মী যৌবনপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে যৌবন কি শান্ত, নিরুদ্বেগ! পূর্ব্বের কথা প্রায় ভুলিয়া গেলেন, অথবা যদি সায়ংকালে কখন রাজস্থানের কথা মনে উদয় হইত, বাল্যকালের সুখ, বাল্যকালের ক্রীড়া ও প্রাণের ভ্রাতা রঘুনাথের কথা মনে হইত, যদি নিঃশব্দে দুই এক বিন্দু অশ্রু সেই সুন্দর রক্তশূন্য গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া যাইত, লক্ষ্মী সে অশ্রু বিন্দু মোচন করিয়া পুনরায় গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

ক্রমে চন্দ্ররাও আরও চারি পাঁচটি দার পরিগ্রহ করিলেন, কাহারও উচ্চবংশের জন্য, কাহারও বিপুল অর্থের জন্য, কাহারও বিস্তীর্ণ জায়গীরের জন্য, এই সকল কন্যা গ্রহণ করিলেন। চন্দ্ররাও বালক নহেন, প্রণয় বা সৌন্দর্য্যের জন্য কাহাকেও বিবাহ করেন নাই। তথাপি লক্ষ্মীবাই ঘরের গৃহিণী বটে,—তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, তিনি প্রথম স্ত্রী ও প্রসিদ্ধ রাজপুতবংশ-সমুদ্ভূতা এই জন্য। চন্দ্ররাও সকলকে ভূরি ভূরি গহনা, ভূরিভূরি অর্থ ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি দিতেন, কেহ কোথাও যাইলে অনেক দাস দাসী, অশ্ব, হস্তী পদাতিক ও বাদ্যকর সঙ্গে দিতেন, সকলেই জানিতে পারিতেন চন্দ্ররাওয়ের পরিবার যাইতেছেন, এ সমস্ত আড়ম্বর তাঁহার আপনার মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য, রমণীদিগের মনস্তুষ্টির জন্য তত নহে। বাটিতে সকল রমণীই পতিকে সমান ভয় করিতেন, দাসীর ন্যায় সকলেই প্রভুর সেবা করিতেন।

চন্দ্ররাও আহারে বসিয়াছেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতেছেন। লক্ষ্মীবাইয়ের বয়ঃক্রম এক্ষণে সপ্তদশ বর্ষ। অবয়ব কোমল, উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়, কিন্তু ঈষৎ ক্ষীণ। ভ্রূযুগল কি সুন্দর সুচিক্কণ, যেন সেই পরিষ্কার শান্ত ললাটে তুলী দ্বারা ন্যস্ত। শান্ত, কোমল, কৃষ্ণ নয়ন দুটিতে যেন চিন্তা আপনার আবাসস্থান করিয়াছে। গণ্ডস্থল সুন্দর, সুচিক্কণ, কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ. সমস্ত শরীর শান্ত ও ক্ষীণ। যৌবনের অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকাশিত রহিয়াছে, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্লতা, উন্মত্ততা কৈ? আহা! রাজস্থানের এই অপূর্ব্ব পুষ্পটি মহারাষ্ট্রে সেইরূপ সৌন্দর্য্য ও সুঘ্রাণ বিতরণ করিতেছে, কিন্তু জীবনাভাবে শুষ্ক, নতশির। পদ্মাসনা লক্ষ্মীর ন্যায় লক্ষ্মীবাইয়ের চারু নয়ন, সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশভার, কোমল সুগোল দেহ দেখিতেছি, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্ল সূর্য্যকিরণ নাই, জীবনাকাশ চিন্তামেঘাচ্ছন্ন।

চন্দ্ররাও গজপতিকে হনন করিয়াছেন. লক্ষ্মী তত দূর জানিতেন না, কিন্তু

স্বার্থসাধনের জন্য পিতার বংশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহা চন্দ্ররাওয়ের আচরণে ও কখন কখন দুই একটি কথা হইতে বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভয়ে সে বিষয় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না।

একদিন চন্দ্ররাও লক্ষ্মীকে জানাইলেন যে তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্রাওয়ের অধীনে হাবেলদার হইয়াছে ও যশোলাভ করিয়াছে। কথাটি সাঙ্গ হইলে চন্দ্র ঈষৎ হাসিলেন; লক্ষ্মী স্বামীকে জানিতেন, সে হাসি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ শুষ্ক হইয়া গেল।

রঘুনাথ কেমন আছেন, কি করিতেছেন, ইত্যাদি নানা ভাবনা সর্ব্বদাই লক্ষ্মীর মনে জাগরিত হইত, কিন্তু স্বামীকে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না, স্বামী বাটি আসিলে তাঁহার অধীনস্থ পদাতিক বা ভৃত্যদিগকে অর্থে বশ করিয়া গোপনে সংবাদ জানিতেন। তাঁহার মনে সর্ব্বদাই ভয় হইত পাছে স্বামী ভ্রাতার অনিষ্টসাধন করেন। কি জন্য এরূপ ভয় হইত তিনি জানিতেন না।

একদিন স্বামীর দুই একটি মিষ্টবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া লক্ষ্মী স্বামীর পদযুগলের নিকট বসিয়া বলিলেন— ,দাসীর একটি নিবেদন আছে কিন্তু বলিতে ভয় করে।'

চন্দ্ররাও শয়ন করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন, সস্নেহে বলিলেন—' কি বল না।'

লক্ষ্মী বলিলেন ' আমার ভ্রাতা বালক অজ্ঞান।'

চন্দ্ররাওয়ের মুখ গম্ভীর হইল।

লক্ষ্মী ভীত হইলেন, কিন্তু তথাপি ভাবিলেন কপালে যাহা থাকে আজ বলিব। প্রকাশ্যে বলিলেন—

' সে আপনার ভৃত্য, আপনারই অধীন।' চন্দ্ররাও ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—

' না, সে আমা অপেক্ষাও সাহসী বলিয়া পরিচিত।'

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন তিনি যাহা ভয় করিতেছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে, —চন্দ্রাও রঘুনাথের উপর যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ! ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিলেন—

' বালক যদি দোষ করে, আপনি না মার্জ্জনা করিলে কে করিবে ?'

চন্দ্ররাও পরুষস্বরে বলিলেন, ' নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের নিকট চন্দ্ররাও পরামর্শ লন না, বিরক্ত করিও না।'

লক্ষ্মী বুঝিলেন চন্দ্ররাওয়ের শরীরে ক্রোধের উদ্রেক হইতেছে; অন্য বিষয় হইলে আর একটি কথা কহিতেও সাহস করিতেন না, কিন্তু ভ্রাতার জন্য স্নেহময়ী ভগ্নী কি না করিতে পারে? চন্দ্ররাওয়ের পদে লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিয়া বলিলেন ' দাসীর নিকট প্রতিজ্ঞা করুন রঘুনাথের আপনি কোন অনিষ্ট করিবেন না।'

চন্দ্ররাওয়ের নয়ন আরক্ত হইল, তিনি লক্ষ্মীকে সজোরে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তাহার পর চন্দ্ররাও অদ্যই প্রথম বাটি আসিয়াছেন, রঘুনাথের যাহা ঘটিয়াছে লক্ষ্মী তাহা জানেন না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় চিন্তাকুল, মুখ ফুটিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, রজনীতে স্বামী নিদ্রিত হইলে ভৃত্যদিগের নিকট ভ্রাতার সংবাদ লইবেন মনে স্থির করিয়াছিলেন।

চন্দ্ররাওয়ের আহার সমাপন হইল, তিনি শয়নাগারে যাইলেন, লক্ষ্মী তাম্বুল হস্তে তথায় যাইলেন। চন্দ্ররাও তাম্বুল লইয়া বলিলেন—

'এখন যাও,আমার বিশেষ কার্য্য আছে, যখন ডাকিব, তখন আসিও।' লক্ষ্মীর সহিত এই তাঁহার প্রথম সম্ভাষণ। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে যাইলেন, চন্দ্ররাও সতর্ক ভাবে দ্বারকদ্ধ করিলেন।

ধীরে ধীরে একটি গুপ্তস্থান হইতে একটি বাক্স বাহির করিলেন, সেটি খুলিলেন, একখানি পুস্তক বাহির করিলেন। দেখিতে হিসাবের পুস্তক। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে গজপতি কর্ত্তৃক যে দিন সভায় অবমানিত হইয়াছিলেন, সে দিন সেই পুস্তকে একটি ঋণের কথা লিখিয়াছিলেন, সেই পাত খুলিলেন, সুন্দর স্পষ্ট হস্তাক্ষর সেইরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছেঃ—

'মহাজন····গজপতি ;

ঋণ······ অবমাননা ;

পরিশোধ হইবে তাঁহার হৃদয়ের শোণিতে

তাঁহার সম্পত্তি নাশে, তাঁহার বংশের অবমাননায়।

একবার, দুইবার, এই অক্ষরগুলি পড়িলেন ; ঈষৎহাস্য সেই বিকট মুখমণ্ডলে দেখা দিল, সেই স্থানে লিখিলেন।

'অদ্য পরিশোধ হইল।'

তারিখ দিয়া পুস্তক বন্ধ করিলেন।

দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, লক্ষ্মী ভক্তি ভাবে স্বামীর নিকটে আসিলেন ; চন্দ্ররাও লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "অনেক দিনের একটি ঋণ অদ্য পরিশোধ করিয়াছি।'

লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিলেন!

চন্দ্ররাওয়ের সুন্দর অনিন্দনীয় হিসাবে অদ্য একটি ভুল হইল। এ ঋণ পরিশোধকার্য্য অদ্য সমাপ্ত হয় নাই,—আ'র এক দিন হইবে।

শিক্ষা ও মানসিক পরিবর্ত্তন।

কোন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, সমাজের জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য পনের আনা শিক্ষাপ্রসাদাৎ। কৃষকসন্তানে এবং বিজ্ঞানবিৎ তনয়ে এমন কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাকে আমরা স্বভাবজাত পার্থক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। যখন উভয়েই পঞ্চমবর্ষীয় বালক মাত্র, তখন উভয়েরই স্বভাব প্রায় একরূপ। একই ধুলাখেলা, প্রায় এক প্রকার দ্রব্যেই অভিরুচি, ঈপ্সিত দ্রব্য না পাইলে উভয়েরই ক্রন্দন ইত্যাদি নানা প্রকার একতা লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু বয়োপ্রাপ্ত হইবা মাত্রই একজন গরু লইয়া মাঠে লাঙ্গল দিতে চলিল, আর অপর বিদ্যালয়ে ঢুকিয়া লেখা পড়া শিখিয়া নিউটন ও লকের আবিষ্কার সকল পরীক্ষা করিতে লাগিল। এই সন্ধিস্থান হইতেই তাহাদিগের বিভিন্নতার সূত্রপাত। ত্রিশ বৎসর পরে দেখ একজন আকাশস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর নিয়মানুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল, আর অপরের সেই মাঠে সেই গরু লইয়া জ্বালাতন। সুতরাং ইহাদিগের স্বভাবজাত বৈলক্ষণ্য যে কিছু ছিল, ইহা কোন অংশে সপ্রমাণিত হইতেছেনা। কৃষককেও যদি পণ্ডিত সন্তানের সহিত একত্রে লেখা পড়া শিখান যাইত, হয়ত তাহা হইলে সেও তাহার মত বিজ্ঞ হইতে পারিত। প্রতিভার কথা স্বতন্ত্র, কারণ কৃষককে ছাড়িয়া দিয়া সভ্যসমাজ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই যে, এক পণ্ডিতের দুই পুত্র সমান সৌভাগ্যশালী হইতে পারে না। তবে ইহা স্থির হইবে যে সকল অসভ্যজাতিরা মূর্খ হইয়া থাকিব বলিয়া জন্মিয়াছে, এটি ঠিক কথা নহে। সভ্যজাতিদের সহিত যদি তাহারাও লেখা পড়া শিখিতে পায়, সম্ভবতঃ তাহারাও সভ্যদের সহিত সমান আসন অধিকার করিতে পারে। এই জন্যই উক্ত পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, সমাজের জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য পনের আনা শিক্ষাপ্রসাদাৎ। এই মতাবলম্বীরা আরও বলিয়া থাকেন যে বিধাতার পক্ষপাতিত্ব আমরা দেখিতে চাহি না; এবং যাহাতে তাঁহাকে পক্ষপাতী প্রমাণ করে, তাহা বিশ্বাস করিতেও চাহি না। মূল কথা, শিক্ষাই আমাদিগের জ্ঞানগত বৈলক্ষণের কারণ।

এই মতটি ঠিক সত্য নহে ইহা আমরা দেখাইব। প্রথমতঃ এতৎসম্বন্ধে দুই একটি আনুষঙ্গিক কথার অবতারণা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে।

সকলেই জানেন যে, আমাদিগের মানসিক ভাবের সহিত কতকগুলি শারীরিক অঙ্গভঙ্গির সম্বন্ধ আছে। দুঃখ হইলে আমরা ক্রন্দন করি। ক্রন্দন না করিলেও মুখের অনেকটা বিকৃতি হয়—চক্ষু ছোট হইয়া যায়; চক্ষের তারা প্রায় অদৃশ্য হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবলবেগে বহিতে থাকে; কপোল কুঞ্চিত হয়; মস্তকে ভার বোধ হয় এবং সাধারণতঃ হস্তোপরি মস্তক রাখিয়া থাকি। আহ্লাদ হইলে চক্ষু দীর্ঘ হয়; হনুদ্বয় উচ্চ হইয়া উঠে এবং অল্প অল্প দন্ত বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ মানসিক ভাবের সহিত বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রক্রিয়ার সম্বন্ধ। * অভ্যাসবশে এই সম্বন্ধ ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়া যায়। কখন কখন আবার কোন কোন অঙ্গচালনা কোন কোন ভাবের সহিত আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক সংলগ্ন করিয়া থাকি। এবং এই অঙ্গচালনাগুলি তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট মানসিক ভাবের সহিত সময়ে এরূপ জড়িত হইয়া যায় যে, যখনি মনে কোন ভাব উদয় হয়, তখনিই যেন তদানুষঙ্গিক অঙ্গচালনাটি আপনি আসিয়া পড়ে। পূর্ব্বে যেটি চেষ্টাসাধ্য ছিল এখন সেটি স্বভাবজাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকের অঙ্গভঙ্গী সম্বন্ধে কতকগুলি কু অভ্যাস আছে, সেগুলি এরূপ স্বাভাবিকমত বোধ হয়, যে কর্ত্তার অজ্ঞাতে এবং কখন কখন অনিচ্ছায় তাহারা সম্পাদিত হইয়া থাকে ইহা বোধ করি সকলেই দেখিয়াছেন বোধ।

আবশ্যক কথা। পাঠক মাত্রেই জানেন, যে আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আমরা বহির্জগতের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। তাহার উপায় এইরূপ। মস্তিষ্ক হইতে আমাদিগের শরীরের চারিদিকে ধমনী সকল (Nerves) প্রবাহিত হইয়াছে। মস্তকটি যেন কেন্দ্র স্বরূপ। পৃষ্ঠ দণ্ড হইতে কতকগুলি ধমনী বাহির হইয়াছে, সে গুলিরও কার্য্য প্রায় মস্তিষ্ক নিঃসারিত ধমনীর মত। ইহারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বহির্জগতের সংবাদ মস্তিষ্কে লইয়া যায়। এবং মস্তিষ্ক হইতে সংবাদ লইয়া আসিতে হইলে অপর গুলির প্রয়োজন। হস্তে কোন আঘাত লাগিলে প্রথম শ্রেণীর ধমনী মস্তিষ্কে সংবাদ লইয়া গেল যে, কষ্ট হইতেছে; মন বলিল হস্তকে সরাইয়া লও, এই আজ্ঞা দ্বিতীয় শ্রেণীর ধমনী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পেশী সকলকে কুঞ্চিত করিল—ফল হস্ত নড়িল।

আমরা ধমনী বা অন্য কোন শারীরযন্ত্রের কার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান

* সুবিজ্ঞ ডার্বিন সাহেব তাঁহার কৃত "Expressions of the Emotions" নামক পুস্তকে মানসিক ভাবের সহিত শরীরের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

করিতে আয়োজন করিয়া বসি নাই। * আমাদিগের মোট কথা এই যে আমাদিগের প্রত্যেক কার্য্যে ধমনী, পেশী প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রের সহায়তা আবশ্যক করে। এক্ষণে হয়ত পাঠক বুঝিয়াছেন যে, মনে কোন ভাব উদয় হইলে আমাদিগের শরীরের যে বিকৃতি জন্মে, তাহাদের কারণ এই যে, শরীরাভ্যন্তরে পেশীর কুঞ্চন প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য হইতে থাকে।

সেই কুঞ্চন প্রভৃতি কার্য্যগুলি সময়ে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, ভবিষ্যতে সেই পূর্ব্বের ভাব উদয় হইতে না হইতেই সেই কার্য্যগুলি দেখা দেয়। পূর্ব্বে যেখানে চেষ্টার প্রয়োজন হইত, এখন তাহা স্বতঃই হইয়া পড়ে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে শারীরিক যন্ত্র সকল এক কর্ম্ম করিতে করিতে কালক্রমে কিছু 'পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বহু বহু বৎসরের পরে এই পরিবর্ত্তন স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

পেশী, ধমনী প্রভৃতি হইতে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন হইলেই প্রকৃত মানসিক পরিবর্ত্তন হইল। ইহাতে কেহ যেন না বুঝেন, যে আমরা মন এক মস্তিষ্ক এক পদার্থ বলিতেছি। হইতে পারে, মন মস্তিষ্কের বিকার বা কার্য্যকারিতা মাত্র, কিন্তু সে মত সমর্থন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। তবে কথা এই যে, মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন হইলে আমরা অনুমান ও চাক্ষুষ প্রমাণের দ্বারা স্থির করিতে পারি যে পরিবর্ত্তনটি সম্পূর্ণ হইয়াছে।

এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেকে অনেকরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, এরূপ পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমরা যেরূপ ছিলাম, এখনও ত তাহাই আছি—পরিবর্ত্তিত দেখি না। বৃক্ষ লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এখন যেরূপ দেখিতেছি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও তাহারা সেইরূপ ছিল, তাহার কি সন্দেহ আছে? আমরা এই আপত্তি নিরাকরণের জন্য দুই একটি কথা বলিব; এবং ভরসা করি তাহাতেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে। বৃক্ষ লতার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমরা অধিক বাক্য ব্যয় করিয়া প্রস্তাবটিকে পল্লবিত করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ ইহাদিগকে সজীব বলিয়া স্বীকার করিতে অনেকে কুণ্ঠিত। এবং সজীবের পরিবর্ত্তন প্রমাণ করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে যাঁহাদের অভিরুচি হয়, তাঁহারা পণ্ডিতবর ডার্বিন সাহেবকৃত এতৎসম্বন্ধীয় পুস্তক * পাঠ করিবেন। পশুদিগের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। পৃথিবীর গভীরতম গহ্বরে এরূপ অনেক অস্থি

* বহির্জগতের জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য-বিষয় সকল শীঘ্রই স্বতন্ত্র প্রস্তাবে প্রকাশ করা যাইবে।

*The Variation of Animals and Plants under Domestication.

পাওয়া গিয়াছে, যাহা আধুনিক কোন প্রাণীর অস্থি বলিয়া বোধ হয় না। ইহা হইতে কি এই অনুমান যুক্তিসিদ্ধ নহে, যে, কতকগুলি প্রাণী কতকগুলি নূতন জীবের জন্ম দিয়া এ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে? অনেকে জানেন বন্যপশুকে গৃহপালিত করিতে পারিলে তাহাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। 'কোন ব্যক্তি একটা ব্যাঘ্রশাবক ধৃত করিয়া কিয়ৎকাল শস্য ভক্ষণ করাইয়া রাখিয়াছিল। তাহাতে সেই ব্যাঘ্রের জীঘাংসা প্রবৃত্তি এপ্রকার দমন হইল যে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলে, সে গৃহের পার্শ্বে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিত, এবং হস্তে করিয়া খাদ্য দ্রব্য দিলে আহার করিত, তাহাতে কাহাকেও হিংসা করিত না।†' এইরূপ ব্যাঘ্রের বংশাবলী লক্ষ বৎসরের পরে যে বন্য ব্যাঘ্র হইতে ভিন্ন মূর্ত্তিধারণ করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? মনুষ্য সম্বন্ধেই যে পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? অনেকেই জানেন উত্তাপের আদান প্রদানেই এই সংসার চলিতেছে। একখণ্ড উত্তপ্ত লৌহ কিয়ৎক্ষণ বাতাসে রাখিয়া দিলেই উহা শীতল হইয়া যায়। বায়ু লৌহকে উত্তাপ দিতেছে, লৌহ ও বায়ুকে উত্তাপ দিতেছে। কিন্তু লৌহ যে পরিমাণে উত্তাপ দিতেছে সে পরিমাণে পাইতেছে না—এই জন্যই উহা শীতল হইয়া যায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নিয়ম—উত্তাপের আদান প্রদান। সূর্য্য পৃথিবীকে উত্তাপ দিতেছে, পৃথিবীও সূর্য্যকে উত্তাপ দিতেছে। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে এমন সময় আসিবে যখন সূর্য্য অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীও অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হইবে। সূর্য্যের ও পৃথিবীর তখন সমান উত্তাপ হইবে। তখন আর উত্তাপের আদান প্রদানে পৃথিবী চলিবে না। সুতরাং তখন আমাদের মত প্রাণী আর এ পৃথিবীতে লীলা খেলা করিবে না। এই সংসার তখন কোন নূতনজীবের ক্রীড়াস্থল হইবে। আমরা তাহাদিগের জন্ম দিয়া এ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িব। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যে জীব ভবিষ্যতে আমাদিগের স্থানাধিকার করিবে, তাহারা যদি আমাদিগের হইতে ভিন্ন হয় তাহা হইলে আমরা যাহাদিগের ভবিষ্যত, তাহাদিগের হইতে আমরা কেন ভিন্ন না হইব? বিজ্ঞানবিৎ টিন্‌ডল্ সাহেব বলিয়াছেন, যে যখন দেখা যাইতেছে মনুষ্যের আকার কমিতেছে, পরমায়ু কমিতেছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়িতেছে, ইহাতে কি অনুমান হয় না, যে ভবিষ্যতে শরীর শূন্য জ্ঞানময় জীব সকল (Intellectual beings) এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে?*

† বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার"। প্রথমভাগ—আমিষ ভক্ষণ।

* টিন্‌ডল্ সাহেবের অনুমানের স-

এক্ষণে হয় ত পাঠক বুঝিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। আমরা আর একটি আপত্তির উল্লেখ করিব। সেটি এই,—কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পরিশ্রমে, শিক্ষায়, বা অন্য কোন উপায়ে যেন একজনের মানসিক পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়, কিন্তু কোন্ হিসাবে সন্তানের মানসিক গঠন পিতার মত হয়? ব্যাঘ্রকে শস্য খাওয়াইয়া, গৃহপালিত করিয়া তাহার জিঘাংসা প্রবৃত্তিকে বলহীন করিলাম যেন, কিন্তু কোন হিসাবে তাহার সন্তান, স্বজাতীয় স্বাভাবিক হিংসাপ্রবৃত্তিকে লাভ না করিয়া জন্মদাতার কোমল মনবৃত্তিনিচয়কে অনুকরণ করিবে? বিবেচনা করিলে পাঠক দেখিবেন, এই আপত্তিটিতে কিছুমাত্র সার নাই। সন্তান পিতার মানসিক বৃত্তিনিচয়ের উত্তরাধিকারী হইবে, ইহা কিছু নূতন কথা নহে। সন্তানের আন্তরিক গঠন জন্মদাতার আন্তরিক গঠনের মতই হইয়া থাকে, ইহাই সংসারের নিয়ম। আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কোন ভদ্রলোকের এইরূপ অভ্যাস ছিল যে, যখন সে গভীর নিদ্রা যাইত, সেই সময়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধীরে ধীরে উঠিত; এবং অত্যন্ত উচ্চ হইলে প্রবলবেগে তাঁহার নাসিকার উপরে পড়িত। মাঝে মাঝে এইরূপ ঘটিত, এমন কি, ইহাতে প্রায়ই নাসিকাতে আঘাতজনিত বেদনা হইত, তাহা বেদনা বৃদ্ধির ভয়ে সময়ে সময়ে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার হস্ত বাঁধিয়া দিতে বাধ্য হইতেন। এই ভদ্রলোকের একপুত্র

ত্যাসভ্যতা সম্বন্ধে পাঠক স্বয়ং বিচার করিবেন। মনুষ্যের আকার ও পরমায়ু সম্বন্ধে আমাদিগের দেশীয় দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিলাম। সত্যযুগে "মজ্জাগতাঃ প্রাণাঃ ইচ্ছামৃত্যুঃ একবিংশতি হস্তপরিমিতো মানবদেহঃ লক্ষবর্ষং পরমায়ুঃ।" ত্রেতায় "অস্থিগতাঃ প্রাণাঃ চতুর্দ্দশহস্তপরিমিতো মানবদেহঃ। দশম সহস্রবর্ষং পরমায়ুঃ" দ্বাপরে রক্তগতাপ্রাণাঃ সপ্তহস্ত পরিমিতো মানবদেহঃ সহস্রাব্দ পরমায়ু।" কলিযুগে "অন্নগতাঃ প্রাণাঃ সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিতো মানবদেহঃ বিংশত্যধিকশতবর্ষ পরমায়ু।" ভাগবতে লিখিত আছে, কলিতে "ধর্ম্ম একপাদঃ। অধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ। আয়ুঃ শতবর্ষাণি। রাজানশ্চ প্রজাভক্ষ্যাঃ।" শেষ কথাটি বড় মিথ্যা নয়। কলির শেষে মনুষ্য "হ্রস্বকায়" হইবে ইহাও লিখিত আছে। পুনশ্চ "ত্রিংশবিংশতবর্ষাণি পরমায়ুঃ কলৌ নৃণাং।" আমাদিগের দেশে "এর পরে বেগুণ গাছে আঁকশী (কোটা) দিতে হবে" বলিয়া একটি পৌরাণিকী কথা (কাহার কাহার মতে প্রবাদ) যে প্রচলিত আছে, তাহা বোধ করি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নহে। টিনডল্ সাহেবের মত তাঁহার উত্তাপ সম্বন্ধীয় বক্তৃতাচয়ে বিশিষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; যাহার ইচ্ছা হয় খুলিয়া দেখিবেন।

পি　র এই কুঅভ্যাসের উত্তরাধিকারী হয়। এই পুত্রের আবার এক কন্যা জন্মে, সেও গভীর নিদ্রাকালে ঐরূপ অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইত (১)। এইরূপ আরও অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং দ্বিতীয়　পক্ষের মূলচ্ছেদ হইল।

অতএব ইহা সপ্রমাণিত হইতেছে যে, সময়ে মনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তন একবারে বা একপুরুষে ঘটিতে পারে না। একজন সভ্য ব্যক্তির পরিবর্ত্তন তাঁহার পূর্ব্বতন শত শত পুরুষ কর্ত্তৃক সময়ানুসারে স ঘটিত হইয়া আসিয়াছে, আর আমেরিকার একজন অসভ্যের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, কারণ তাহার পূর্ব্বতন শত শত পুরুষ লেখা পড়া করিয়া বা অন্য কোন প্রকারে মানসিক পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করে নাই। সুতরাং এক্ষণে সেই সভ্য ও সেই অসভ্য মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা কোনরূপেই একপুরুষে লোপ পাইবার নহে। অসভ্য যতই কেন চেষ্টা করুক না, সভ্যের মত তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন কখনই হইবে না। কারণ যাহার জন্য কত শত বংশের প্রয়োজন, তাহা কি একজনের চেষ্টায়

সুতরাং সভ্য ও অসভ্য (
প্রভেদ আমরা দেখিলাম শিক্ষা
ভেদ। কিন্তু সে শিক্ষা ব্যক্তিগত
পুরুষগত।

এই জন্যই আমরা পূর্ব্বে যে পণ্ডিতের মত উল্লেখ　রিয়াছি, সেটিকে ঠিক সত্য নহে　াছি। সে মতটিকে আমরা মি　লি নাই; কারণ আমাদিগেরও　। সমাজের বৈলক্ষণ্য শিক্ষাপ্রসা—কিন্তু সে শিক্ষা ব্যক্তিগত নহে, বংশগত।

আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য আমরা কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করিয়া এপ্রস্তাবের উপসংহার করিব।

(১) সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী লেপ্টেনাণ্ট ওয়ালপোল সাহেব লিখিয়াছেন যে, স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপবাসী ছাত্রদিগের সম্বন্ধে তাহাদিগের শিক্ষকেরা এইরূপ বলেন;—প্রথম প্রথম তাহাদিগকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। যতদিন সাধারণ এবং সহজ বিষয় সকল শিক্ষিত হইতে থাকে, ততদিন সকল কথাই তাহাদিগের কণ্ঠস্থ হয়। কিন্তু যেমন শিক্ষিত বিষয়গুলি গভীরতর হইতে থাকে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের বুদ্ধির এবং চিন্তার লঘুতা সপ্রমাণিত হয় *।

(১) এই গল্পটি ডারউইন কৃত "Expressions of the Emitions" নামক পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে। গল্পটিও তাঁহার নিজের নহে। পুস্তকখানি আমাদিগের নিকট এক্ষণে নাই; থাকিলে অবিকল অনুবাদ করিয়া দিতাম।

* সকল দৃষ্টান্তগুলি স্পেন্সার কৃত "Principles of Psychology" দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ, প্রথমখণ্ড হইতে গৃহীত হইয়াছে।

মন্ধেও এই বিষয় লিখিত

।মেরিকায় নিগ্রোবালক এবং ।রাজসন্তানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, প্রথম প্রথম নিগ্রোর। ইংরাজতনয়ের সঙ্গে শিক্ষাসম্বন্ধে অগ্রসর ত সমর্থ হইলেও কিয়দ্দূর গিয়া তাহা দ্ধির আর বিকাশ পায় না। এমন স

সিয়া দাঁড়ায় যে, সেই স্থল হইতে উ জ-সন্তানের সহিত একত্রে আর পদক্ষেপ তাহাদের পক্ষে সুকঠিন হয়।

আণ্ডামান ও নবজ্রিলাণ্ড সম্বন্ধেও এইরূপ কথিত আছে।

অস্মদ্দেশীয় হিন্দুদিগের বিদ্যা স-ম্বন্ধেও এইরূপ একটি অপবাদ আছে।

শ্রীঃ—

বিষকন্যা ও বিধবা রমণী।

আমরা 'মুদ্রারাক্ষস' পড়িবার সময় একটি আশ্চর্য্য কথা পাইয়াছিলাম।

'রাক্ষসমন্ত্রী, চন্দ্রগুপ্তের বধার্থ একটি পরম সুন্দরী কন্যা প্রেরণ করিলেন, চাণক্য তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিলেন। রাক্ষসের অভিসন্ধি যে, রাজা সেই কন্যার রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাতে আসক্ত হইবেন, সুতরাং শীঘ্র শীঘ্রই তাঁহার দেহ জীর্ণশীর্ণ হইয়া ধ্বস্ত হইবে। এদিকে চাণক্য পণ্ডিতও তেমনি;—সেই যুবতি-শরীরের ঘর্ম্ম পান করিয়া একটি স্বেদভুক্ মক্ষিকা প্রাণত্যাগ করিল, তাহা দেখিয়া তিনি তাহাকে 'বিষকন্যা' স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ দূরীভূত করিয়া দিলেন।'

এই অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব অসম্ভবপ্রায় অংশটুকু পাঠ করিয়া মন চমকিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলাম, এ কি অসম্ভব কথা!—নাটকের মধ্যেও এত অসম্ভব বস্তু বিন্যাস!—অপার ভাবনা-সমুদ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল, অনবরত চিন্তা-স্রোত বহিতে লাগিল, আর কত রকমের কল্পনা ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কতক পরিত্যাগ করিলাম, কতক সঞ্চয় করিলাম, কতক আরও বা ধরিতে পারিলামনা, ভাসিয়া গেল। যেগুলি সঞ্চয় করিয়াছিলাম, কোন আত্মীয়ের অনুরোধে আজ তাহা প্রকাশ করিলাম। 'বিষকন্যা ও বিধবা রমণী' এই মুকুট পরাইয়া বাহির করিলাম। ইহাতে যদি কাহারও অন্ত্রে আঘাত লাগে, কি করিব? উদ্বৃত্ত যৌবন-রস যাহাদের শরীরে ধরিতেছে না; যেন ওষ্ঠ, গণ্ড ফাটিয়া বাহির হইতে আসিতেছে, তাঁহাদের কিছুতেই বেদনা লাগে না। সুতরাং আমার এই প্রলাপতুল্য প্র-

বস্তুটি তাঁহাদিগের নিকট নিরপরাধী।

১ম।—যখন ধমনীতে যৌবনরসের স্রোত বহিতে থাকে, তখন নহে; একটুকু বেগ হ্রাস হইয়া আসিলে অনেকেরই অনুভব হয় যে শরীরটা কেবল মলময়। কতকটা খাদ্য দ্রব্যের বিকার মাত্র; স্বেদ, ক্লেদ, দৌর্গন্ধ্য, শিঙ্ঘাণ প্রভৃতি বিবিধ বিকৃত মলে পরিপূর্ণ। সেই জন্যই বৌদ্ধ দার্শনিকেরা ইহাকে 'পুদ্গল' সংজ্ঞা দিয়াছেন। কখন পুড়িতেছে কখন বা গলিতেছে।

২য়।—শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, যে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার মলেই ক্ষতিকারক পদার্থ আছে। অভ্যন্তরের দূষিত বা বিষাক্ত পদার্থ সকল ঘর্ম্ম দ্বারা, নিশ্বাস দ্বারা ও বিষ্ঠা মূত্রের দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। দৈহিক উষ্ণতাও অন্যের শরীরে ক্ষতিকারক বা ধাতু দূষক হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবেশ করিলে তাহাও ক্রমে ক্রমে শরীরের হানি আনয়ন করে! অধিক কি—'দেহাচ্চৈব চ্যুতা মলাঃ' যাহা যাহা দেহ হইতে প্রচ্যুত হয়, তাহা তাহাই মল এবং তাহা তাহাই ক্ষতিকারক। তবে যে আপনার মল আপনার অনিষ্টকারক হয় না, আত্মদেহের পূতিত্ব আত্মার হানি আনয়ন করেনা তাহার কারণ আছে। কি কারণ? স্বাত্ম্য প্রাপ্তি। বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে, 'বিষমপি স্বাত্ম্যগতংন হন্ত্যাৎ' বিষও স্বাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে নাশক হয় না। স্বাত্ম্য শব্দের অর্থ কি? দৃঢ় অভ্যাস। যাহাকে ভাষায় সহ্য হওয়া বলে তাহারই সংস্কৃত নাম স্বাত্ম্য। এই স্বাত্ম্যের মহিমা বুঝা ভার।

স্থাবর বিষে (কাঠ বিষে) কীট জন্মে। কিন্তু সে বিষ তাহার হানি করেনা। কেননা তাহা তাহার স্বাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই বিষ যদি অন্য কীটের শরীর স্পর্শ করিতে পায় তবে সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আত্ম প্রভাব দেখাইবে সন্দেহ নাই। অতএব বিষ যখন স্বাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে ক্ষতিকারক হয় না, তখন আর স্বাত্ম্য প্রাপ্ত স্বেদ, দৌর্গন্ধ্য, উষ্ণনিশ্বাস প্রভৃতি ক্ষতিকারক হইবে কেন? অন্যেরই বা না হইবে কেন?

৩য়।—পলাণ্ডুভুকদিগের শরীরে এক প্রকার গন্ধ, মাংসাদ মনুষ্যদিগের গাত্রে এক প্রকার গন্ধ, উদ্ভিজ্জভোজীদিগের শরীরে আর এক প্রকার গন্ধ, তাহা স্বেদজ গন্ধ—সকলকারই স্ব স্ব স্বেদ গন্ধাদি সহ্য হইয়া গিয়াছে। এই নিমিত্ত তাহা তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। বিষ্মূত্রের গন্ধ মৈত্রহর (মেথর) দিগের স্বাত্ম্য হইয়া গিয়াছে। সেই কারণে উহা তাহাদিগকে ক্লেশ দিতে পারে না। কিন্তু যাহা যাহার স্বাত্ম্যগত হয় নাই, অবশ্যই তাহা তাহার হানিকারক হইবে।

৪র্থ।—মনুষ্যদেহের রস রক্তাদি ও অন্ন মলাদির পরিণামে দোষ জন্মে। তাহা ঘর্ম্মাদি দ্বারা বাহির হইয়া যায়,

ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু মনু ও সুশ্রুত বলেন যে, কোন কোন মনুষ্যের মূলে অর্থাৎ শুক্র শোণিতের সংযোগ কালে এমন কোন দোষ ঘটনা হইতে পারে যে তাহার প্রভাবে মনুষ্যের আমরণ দেহের বিষাক্ততা থাকিতে পারে। এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, উদ্ভিজ্জ মাত্র ভোজন করে, অনুলেপন সেবা করে, তথাপি তাহার দেহের বিকট গন্ধ দূর হয় না। কাহার কাহার গাত্র হইতে ক্ষার গন্ধ বহির্গত হয়। কাহার গাত্রে পাখীর গন্ধ, কাহার ও বা মুখে, নিশ্বাসে, কক্ষ প্রভৃতি ঘর্ম্মস্রাব অঙ্গে পুতি গন্ধ থাকে। তাহা কিছুতেই যায় না। কেন ? তাহা তাহাদের বর্ত্তমান অন্ন-পানাদি পরিণামের ফল নহে। বৈজিক, গার্ভিক পরিণামের ফল। এইরূপ দোষ না ঘটে এই অভিপ্রায়ে হিন্দুদিগের মধ্যে শরীরের উপর দশবিধ সংস্কার করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

৫ম।—স্বেদ, ক্লেদ, তাপ, নিশ্বাস, জৃম্ভণ, নেত্রতেজ * প্রভৃতিতে যদি শরীরের ক্ষতিকারক পদার্থ থাকিল—তবেইত সর্ব্বনাশ! কেমন করিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করা যায়।

৬ষ্ঠ।—'একজনের গাত্রে আর একজনে নিশ্বাস ফেলিলে দোষ হয়।' 'হাঁই তুলিয়া দিলে দোষ হয়।' 'নিদ্রিত ব্যক্তি গাত্রে অশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলে দোষ হয়।' 'অন্যের গাত্রে ঘাম পুঁছিয়া দিলে তাহার পীড়া হয়' এই সকল জনপ্রবাদ কি সত্য ? হইতে পারে।

৭ম।—একদা দেখা গিয়াছে যে, একজনের গাত্রমার্জ্জনী ব্যবহার করিয়া অন্য জনের কণ্ডু দদ্রু বা বিচর্চ্চিকা রোগ জন্মিয়াছে। একজনের সহিত নিত্য সহবাস করিয়া অন্যজন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। একজনের সহিত সর্ব্বদা চোকো চোকি থাকিয়া আরএকজন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রেও দেখা যায় 'যানংবস্ত্র মলঙ্কারং জায়াংপত্যং কমণ্ডলুম্। আত্মনঃ শুচিরে তানি ন পরেষাং কদাচন।' 'দর্শনান্নিত্যসংবাসাদ্দোষমাক্রম্য তিষ্ঠতি' 'সংসর্গজা দোষ গুণা ভবন্তি' 'শরীরজৈঃকর্ম্মদোষৈরণ্যোঽপি ক্লিশ্যতে ক্বচিৎ' ইত্যাদি।

৮ম। এক শরীরের সহিত অন্য শরীরের এরূপ কঠোর সম্বন্ধ যদি সত্য সত্যই হয়, তবে ত অন্যের শরীর লইয়া আশ্লেষ ক্রীড়া করা বড় সাবধানের কার্য্য। আমরা যে নারী দেহ লইয়া, পুত্র দেহ লইয়া সর্ব্বদাই আশ্লেষ ক্রীড়া করি, তাহাতে কি আমাদের কোন ক্ষতি হইতেছে

* নেত্র তেজ ও প্রাণনাশক আছে। আশীবিষ আর দৃষ্টিবিষ এই দ্বিবিধ জীব তির্য্যক-যোনি মধ্যেই দৃষ্ট হয়। দৃষ্টিবিষ জীবের নেত্রতেজ অসহ্য। ইহার সংযোগমাত্র ভয়, কম্প, জড়তা প্রভৃতি সমস্তই ঘটিয়া থাকে।

না? জগদীশ্বর কি রোগ, তাপ, জ্বরা, জীর্ণতা প্রবেশ করাইবার জন্যই নারীদেহ-সমাশ্লেষরূপ অলক্ষ্য দ্বার প্রস্তুত রাখিয়াছেন? এসকল যদি অংশতঃও সত্য হয়, তাহা হইলে মুদ্রারাক্ষসের বিষকন্যাও সত্য হইতে পারে। মুদ্রারাক্ষসের কথা সত্য হইলেই বিভ্রাট!

৯ম। আমি বাল্যকালে বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যবিবাহের একদিকে দোষ একদিকে গুণ। দোষ এই যে,—

'ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্‌গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরঞ্জীবেৎ জীয়েদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥'

ষোড়শ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা নারীর অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশবর্ষ বয়স্ক পুরুষের বীজে গর্ভ হইলে সে সন্তান বাঁচে না। যদি বাঁচে দীর্ঘজীবী হয় না। যদিও দীর্ঘজীবী হয়, তথাপি তাহার ইন্দ্রিয় সকল অতি দুর্ব্বল অবস্থার হইবে। এই ত বাল্যবিবাহের দোষ। কিন্তু গুণ কি? না স্বাস্থ্যলাভ। আমি ১৬ বৎসর বয়সে অষ্টম বর্ষীয়া কুমারী বিবাহ করিয়াছিলাম। তাহার বস্ত্র, শয্যা, নিশ্বাস, গাত্রতাপ, নেত্রতেজ, ঘর্ম্ম প্রভৃতি আমার ক্রমে ক্রমে স্বাত্ম্য হইয়া গিয়াছিল। আমার শরীরের দোষগুণও তাঁহার স্বাত্ম্য হইয়াছিল। তাঁহার দোষ তীব্র হইলে হয়ত তাহা আমার সহ্য হইত না এবং আমার দোষ তীব্র হইলেও হয় ত তাঁহার সহ্য হইত না। এরূপ পরস্পর সামঞ্জস্য না হইলে হয়ত তাঁহাকে পতিঘাতিনী বিধবা হইতে হইত, নতুবা আমাকে 'মাগ খেকো দোজ্‌বর' বলিয়া গালি খাইতে হইত। অন্ততঃ মলিন, কৃশ, জীর্ণ শীর্ণ হইয়া থাকিতে হইত। এমন দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বে ভাল ছিল, পরে দোষবহুল নারীর নিশ্বাসে শুকাইয়া গিয়াছে। না হয়, বিবর্ণ, বিশীর্ণ, কগ্নস্বভাব, মস্তিষ্কচ্ছন্ন, হইয়া গিয়াছে। আবার ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, পূর্ব্বে রুগ্ন ভগ্ন ছিল, বিবাহের পরে সে দিব্য নৈরুজ্য লাভ করিয়াছে এবং বুদ্ধিমানও হইয়াছে। শরীরের দোষের ন্যায় গুণও আছে। বিষকন্যা এবং অমৃতকন্যাও আছে। বিষপুরুষ ও অমৃতপুরুষও আছে। যাহা হউক, আমাদিগের এক প্রকার সহ্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহারা বিধবা বিবাহ করিবেক, তাহাদের কি এই বিষয় একটুকু সাবধান হওয়া উচিত নয়? স্বামী, নিজের দোষেও মরিতে পারে, ভার্য্যার দোষেও মরিতে পারে। যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী তাহার ভার্য্যার বিষাক্ততায় প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, তবেই ত শঙ্কার বিষয়। অতএব বিবাহের পূর্ব্বে অন্ততঃ ইহা দেখা উচিত যে বিধবার স্বামী কিরূপ অবস্থায় কত দিন ভোগ করিয়া মরিয়াছে। অনুপভুক্তা যুবতী বিধ-

যাকে বিবাহ করিতে ভয় হয়,যেহেতু তাদৃশ দম্পতির দোষ গুণের স্বাস্থ্যসম্পাদন করিবার সময় নাই। নিষ্প্রতিবন্ধক বিশেষতঃ সে অবস্থাটি অধৈর্য্যের অবস্থা। যদি কাহারও তীব্রদোষ থাকে, তাহা হইলে হয় ত Honeymoon এর মধ্যেই অন্যতরের অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে।

১০ম। যদি বিধবা বিবাহ করিতে হয়, একটুকু সাবধান হইয়া করাই উচিত। বিধবা রমণী দেখিতে অপ্সরার মত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার অঙ্গে বিষ [illegible] মিশ্রিত থাকিতে পারে। শাস্ত্রকারেরা বলেন, 'তাসামমৃতভোজিত্বাৎ স্বেদ-ক্লেদ-সৌন্দর্য্য-বিষ-শ্বাসাদিরাহিত্যম্।' অপ্সরারা অমৃতভোজিনী বলিয়া তাঁহাদের স্বেদ ক্লেদাদি নাই, তাঁহাদের নিশ্বাসেও বিষ নাই। কিন্তু মনুষ্যরমণীদিগের তাহা আছে। অতএব সাবধান—যেন বিধবাভ্রমে পতিঘাতিনী বিবাহ না কর। পতিপুত্রঘাতিনীকে শাস্ত্রকারেরা 'অবীরা' সংজ্ঞায় আহ্বান করিয়া থাকেন।

যে রমণীর বাতাসে স্বামী শুকাইয়া যায়, জীর্ণশীর্ণ হইয়া দেহত্যাগ করে, যাহার ক্রোড়ের শিশু মুর্দ্ধশুষ্ক হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করে,ভুবনমোহিনী হইলেও তিনি অবীরা, পতিঘাতিনী, পুত্রঘাতিনী। শাস্ত্রকারেরা ইহার হস্তের অন্ন খাইতেও নিষেধ করিয়াছেন।

যে নারীর দেহে বিষাক্ততাদোষের অল্পতা আছে, অথবা কিঞ্চিৎ অমৃতত্ব আছে, শাস্ত্রকারেরা অনুমান করিয়া তাহার কতকগুলি লক্ষণ লিখিয়া গিয়াছেন। বিষ থাকিলেও তাহা কেমন পুরুষে সহ্য করিতে পারিবে তাহাও লিখিয়া গিয়াছেন।

"নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং [illegible]
নাধিকাঙ্গীং ন রোমিনীম্।" ইত্যাদি।

বড় দুঃখিত হইলাম যে, শ্লোকগুলি সংগ্রহ করি নাই। যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, আবার সংগ্রহ করিয়া উপহার দিব। এক্ষণে নিবেদন এই যে, যদি কেহ গর্ব্বিতা অবীরা পাঠিকা থাকেন, তাঁহারা যেন প্রবন্ধলেখকের উপর ক্রোধ না করেন। দুঃখিনী পাঠিকা থাকেন, আমি তাঁহাকে বেদনা দিলাম এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। সকলই স্বভাবের কার্য্য। পতিপ্রণয়িনী পাঠিকাদিগকেও বলিতেছি, বিষ নাই বলিয়া অহঙ্কারে ফুৎকারে মটমটে হইবেন না!

শ্রীকা—

হিন্দুভূগোল।

প্রথম প্রস্তাব—পৌরাণিক।

বকল বিলক্ষণরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, দেশের নৈসর্গিক অবস্থা, অর্থাৎ জল বায়ুর উষ্ণত্ব ও শীতলত্ব, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, প্রভৃতির দ্বারা দেশস্থ লোকের চরিত্র গঠিত হয়। ভারতে সর্ব্বকালে প্রকৃতি অতি উদার—প্রকৃতি যেন কল্পতরু হইয়া শত হস্তে ভারতকে স্বীয় সম্পত্তি বিতরণ করিয়াছেন। এদেশস্থ ভূমি এত উর্ব্বরা যে অল্পমাত্র পরিশ্রমেই প্রত্যেক পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এইক্ষণ নানা কারণে এদেশ নিরন্ন ও দরিদ্র হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে এদেশ প্রভূত ধনের আধার ছিল; এমনকি ঐশ্বর্য্য প্রভাবে এদেশ ‘স্বর্ণভূমি’ ও ‘রত্ন গর্ভা’ প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়াছিল।

যখন দেশে প্রভূত ধন সঞ্চিত হয়, তখন সর্ব্ব শ্রেণীস্থ সকল লোকের পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা থাকেনা। তখন স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর লোক হন, তাঁহারা জীবনের অধিকতর সময়ই আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করেন; তন্মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি জ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। ভারতবর্ষস্থ প্রাচীন ঋষিগণ এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা [illegible]র উন্নতি বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া, বাহ্যজগত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্জগতেই মানসিক শক্তির পরিচালনা করিতেন। এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল। কারণ যেদেশে অল্প পরিশ্রম বা বিনা পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, সেদেশে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সম্পাদনে লোকের তত প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইলেই বৈজ্ঞানিক সম্বলের প্রয়োজন, যেদেশে প্রকৃতি বিনা যুদ্ধে পরাজিতা দাসীর ন্যায় আজ্ঞাবহ, সেদেশে তদ্রূপ সম্বলের আবশ্যকতা কি? আর একটি কারণ আছে। বকল স্পেন দেশের অবস্থা বিচার করিতে যাইয়া তথায় ধর্ম্মভাবের এত প্রাধান্য ও যাজক সম্প্রদায়ের এত আধিপত্যের কারণ এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সেখানে প্রকৃতির মূর্ত্তি এত ভয়াবহ যে লোকে স্বভাবতঃই ভীত হয়, এবং সেই সকল মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ দেবমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যে কারণে স্পেনে অবৈধ ধর্ম্ম বিশ্বাসের এত প্রাবল্য, তাদৃশ কারণ এখানে বহুল পরিমাণেই পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান,

সুতরাং প্রাচীন মহর্ষিগণ বিজ্ঞানের চর্চ্চা না করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র ও মনস্তত্ত্বেরই উন্নতি সাধনে জীবন যাপন করিয়াছেন। শুদ্ধ বিজ্ঞান নহে, বিজ্ঞানের সহিত নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতির প্রতিও তাঁহারা বিছুমাত্র মনোযোগ করেন নাই। পুরাণাদিতে এই দুই বিষয়ের যে কিঞ্চিৎ চেষ্টা দেখা যায়, তাহু এত কুসংস্কার ও কল্পিতভাবে পরিপূর্ণ যে তাহা হইতে সত্য উপলব্ধি করা যায় না।

এস্থলে একটি কথা বলা প্রয়োজন। আজি কালি এদেশে অনেক স্বদেশহিতৈষী জন্মিয়াছেন, যাঁহারা ন্যায় হৌক বা অন্যায় হৌক, সঙ্গত হৌক, বা অসঙ্গত হৌক, সর্ব্ববিষয়ে এদেশের গৌরব বাড়াইতে ত্রুটি করেন না। যে কোন নূতন তত্ত্বের কথা হৌক না কেন, তাঁহারা অম্লানবদনে কহিবেন, ইহা ভারতে অনেক পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। অধিক কি ভারতে মুদ্রাযন্ত্র ও কামানের ব্যবহার পর্য্যন্ত প্রমাণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। তাঁহাদিগের চেষ্টা মহতী, মনের ভাব উৎকৃষ্ট, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন না হওয়াতে তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণে সাহসী হইতে পারি না। আমরা অদ্য যে প্রস্তাবটির অবতারণা করিতেছি, অনেক দিন তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু আধুনিক বাস্তববৃত্তান্তের সহিত এগুলির সামঞ্জস্য প্রদর্শনে এতদিন বৃথা চেষ্টা করিয়াছি। যাহা হৌক, প্রাচীন পণ্ডিতদিগের ভৌগোলিক মতের সারাংশ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে; যদি ভারতহিতৈষীগণ আধুনিক ভূগোলের সহিত ইহার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন, পরম আপ্যায়িত হইব।

পুরাণে সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনের * বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বলোকের অধিষ্ঠানভূতা এইযে পৃথিবী, ইহাই ভূলোক নামে খ্যাত। বিষ্ণুপুরাণে ভূলোকের এইরূপ বর্ণনা আছে;—

'পঞ্চাশৎকোটিবিস্তারা সেয়মুর্ব্বি মহামুনে।
সপ্ততিশ্চ সহস্রাণি দ্বিজোচ্ছ্রায়োপি কথ্যতে॥'

অর্থাৎ পৃথিবীর বিস্তার পঞ্চাশৎ কোটি যোজন, এবং ইহার উচ্ছ্রায় (উচ্চতা) সপ্ততি সহস্র যোজন। পরন্তু লিঙ্গপুরাণে—

'পঞ্চাশৎকোটিবিস্তীর্ণা সসমুদ্রাধরা স্মৃতা।
দ্বীপৈশ্চ সপ্তভিযুক্তা লোকালোকাবৃতা শুভা।'

অর্থাৎ এই পঞ্চাশৎ কোটি যোজনের †

* ভূর্লোকোথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ। মহর্জনস্তপশ্চৈব সত্যলোকশ্চ সপ্তমঃ। ইতি শিব পুরাণে॥ অতলং বিতলং তলাতলং মহাতলং রসাতলং পাতালমিতি॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে।

† চতুর্হস্তোধনুস্তস্য সহস্রং ক্রোশ উচ্যতে। ক্রোশদ্বয়ন্তু গব্যুতির্দ্বয়ং যোজনং বিদুঃ॥ ইতি যোগিনীতন্ত্রে।

মধ্যেই সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র আছে। পুনশ্চ বৈষ্ণব পুরাণে—

'পাদগম্যন্তু যৎকিঞ্চিদ্বস্ত্বস্তি ধরণীময়ং।
সভূর্লোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোস্য ময়োদিতঃ॥'

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আয়তনের মধ্যে যে যে বস্তু পদচালনের যোগ্য ও পৃথিবীময় আছে, তাহারই নাম ভূলোক। অতঃপর পৌরাণিকেরা প্রাগুক্ত সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার বিবরণ করা যাইতেছে। তৎপূর্ব্বে একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। পৌরাণিক ভূবৃত্তান্তের সহিত আধুনিক ভূবৃত্তান্তের তুলনা করা যে বিড়ম্বনা মাত্র, একটি মাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারাই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। আধুনিক গণনানুসারে পৃথিবীর ব্যাস ৭৯১২ মাইল, বা ৩৯৫৬ ক্রোশ, সুতরাং উহার বিস্তার প্রায় ১১৭১৯ ক্রোশ, কিন্তু পৌরাণিক গণনানুসারে ২,০০০,০০০,০০০ ক্রোশ। এরূপ স্থলে তুলনা করিতে যাওয়াই বাতুলতা মাত্র।

কল্পনা-নিমগ্ন ধ্যানরত মহর্ষিগণ নয়ন মুদ্রিত করিয়া, নিবিড় নিভৃত বনমধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক, পৃথিবীর জল ও স্থলভাগের যে বিবরণ প্রকটন করিয়াছেন, তাহা ড্রেক কুক, প্রভৃতির জানিবার সম্ভাবনা কি? ফলকথা, তাহা আকাশকুসুমবৎ অলীক পদার্থ, যথার্থ ভূগোলের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। যদি কেহ বলিতে চাহেন যে এসিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, পলিনেসিয়া ও ওসনিকা, এই সপ্তভূভাগের সহিত পৌরাণিকদিগের সপ্তদ্বীপের মিল আছে; তাঁহাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া আমরা অন্যস্থানে চলিয়া যাইব। কারণ উঁহাদের নিকটস্থ হওয়া অবিধেয়। আমরা কেন যে এরূপ কথা বলিতেছি, পাঠক একবার সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের বিবরণ পাঠ করুন, তবেই বুঝিতে পারিবেন।

সপ্তদ্বীপের নাম যথা,—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর। আর লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্তসমুদ্র। *

'জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেষাং মধ্যসংস্থিতঃ।†'

জম্বুদ্বীপ সপ্তসমুদ্র ও ছয় দ্বীপের মধ্যভাগে সংস্থাপিত। এই দ্বীপে একটি জম্বুবৃক্ষ আছে, তাহার ফলের নামানুসারে এই দ্বীপের নাম হইয়াছে—

'জম্বুদ্বীপস্য সাজম্বুর্নামহেতুর্মহামুনে।'

অপর ছয়টি দ্বীপের নামও তত্তৎদ্বীপস্থিত বৃক্ষবিশেষের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শৈবপুরাণে যথা—

* জম্বুপ্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরোদ্বিজ। কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ॥ এতেদ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ। লবণেক্ষু সুরাসর্পি দধ্যোদানাম নামতঃ। দুগ্ধোদশ্চ প্রসংখ্যাত স্তুতঃ স্বাদূদ উত্তরঃ॥

† ইতি বৈষ্ণবে।

'প্লক্ষদ্বীপে প্লক্ষবৃক্ষঃ শাল্মলৌ শাল্মলিঃ স্মৃতঃ।
কুশদ্বীপে কুশস্তম্বঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহাগিরিঃ॥
শাকদ্বীপে শাকবৃক্ষঃ পুষ্করে পুষ্করঃ স্মৃতঃ॥'

অতঃপর বিষ্ণুপুরাণে সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

'জম্বুদ্বীপং সমাবৃত্য লক্ষযোজনবিস্তরঃ।
সমুদ্রো বলয়াকারঃ স্থিতঃ ক্ষারোদধির্বহিঃ॥'

লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ লবণসমুদ্র বলয়াকারে জম্বুদ্বীপের বহির্ভাগ বেষ্টন করিয়া আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত আছে যে, জম্বুদ্বীপ বৃত্তাকার ও তাহার ব্যাস লক্ষযোজন *। লবণসমুদ্রের পর পারে দ্বিলক্ষ যোজন প্লক্ষদ্বীপ, তাহা লবণ সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া আছে।

'ক্ষারদেন যথা দ্বীপো জম্বু সংজ্ঞোভিবেষ্টিতঃ। সংবেষ্ট্য ক্ষারমুদধিং প্লক্ষদ্বীপস্তথা স্থিতঃ॥ জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারঃ শত সাহস্রসম্মিতঃ। সএব দ্বিগুণো ব্রহ্মণ্ প্লক্ষদ্বীপেহ্ প্যাদাহৃতঃ॥'

প্লক্ষদ্বীপের তুল্যায়তন অর্থাৎ দ্বিলক্ষ যোজন ইক্ষুসমুদ্র উক্ত দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে। আবার চতুর্লক্ষ যোজন বিস্তৃত শাল্মলি দ্বীপ ঐ ইক্ষু সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়াছে।

'প্লক্ষদ্বীপপ্রমাণেন প্লক্ষদ্বীপঃ সমাবৃতঃ।
তথৈবেক্ষুরসোদেন পরিবেশানুকারিণা॥
শাল্মলেন সমুদ্রোঽসৌ দ্বীপেনেক্ষুরসোদকঃ।
বিস্তার দ্বিগুণেনায়ং সর্ব্বতঃ সংবৃতঃ স্থিতঃ॥'

এইরূপে শাল্মলি দ্বীপ চতুর্লক্ষযোজন বিস্তৃত সুরা সমুদ্রের দ্বারা; সুরা সমুদ্র অষ্টলক্ষ যোজন বিস্তৃত কুশদ্বীপ দ্বারা; কুশদ্বীপ অষ্টলক্ষ যোজন বিস্তৃত সর্পিস্মুদ্রের দ্বারা; ঘৃতসমুদ্র ষোললক্ষ যোজন বিস্তৃত ক্রৌঞ্চদ্বীপ দ্বারা; ক্রৌঞ্চদ্বীপ ষোললক্ষ যোজন বিস্তৃত দধিসমুদ্রের দ্বারা; দধিসমুদ্র বত্রিশলক্ষ যোজন বিস্তৃত শাকদ্বীপ দ্বারা; শাকদ্বীপ বত্রিশ লক্ষ যোজন বিস্তৃত ক্ষীরসমুদ্র দ্বারা; ক্ষীরসমুদ্র চৌষট্টিলক্ষ যোজন বিস্তৃত পুষ্কর দ্বীপ দ্বারা; পরিশেষে পুষ্করদ্বীপ স্বাদু জলসমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আছে। ঐ জলসমুদ্রের বিস্তারও চৌষট্টিলক্ষ যোজন। *

* লক্ষমেকং যোজনানাং বৃত্তোবিস্তারদৈর্ঘ্যয়োঃ॥

* সুরোদকঃ পরিবৃতঃ কুশদ্বীপেনসর্ব্বতঃ।
শাল্মলস্যতু বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন প্রমাণতঃ॥
তৎপ্রমাণেন সদ্বীপো ঘৃতোদেন সমাবৃতঃ।
ঘৃতোদশ্চসমুদ্রোঽসৌক্রৌঞ্চদ্বীপেনসংবৃতঃ॥
কুশদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণোযস্যবিস্তরঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপসমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেনচঃ॥
আবৃতঃ সর্ব্বতঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপ তুল্যেন মানতঃ
দধিমণ্ডোদক শ্চাপি শাকদ্বীপেন সংবৃতঃ॥
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণেনপ্রমাণতঃ।